রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ

শিক্ষা চিন্তা

রবীন্দ্ররচনা সংকলন

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ

শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্ররচনা-সংকলন

সম্পাদনা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

Rabindranather Chintajagat
Sikshachinta :
Rabindrararachana-sankalan
Edition : Satyendranath Roy
Price : **100.00**
First Edition : 20 / 7 / 1982
Second Edition : 20 / 7 / 1988
Third Edition : 28 / 3 / 2002

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ'-
প্রকল্পের প্রথম গবেষণা-গ্রন্থ।
রবীন্দ্রভবনের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত।

গবেষণা-সহায়তা ঃ
ডঃ সান্ত্বনা মজুমদার

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩রা শ্রাবণ, ১৩৮৯
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ৩রা শ্রাবণ, ১৩৯৫
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ১৫ই চৈত্র, ১৪০৮

প্রকাশক ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

মুদ্রণ ঃ
নিউ রেনবো লেমিনেশন
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
রূপায়ণ
ISBN 81-86473-40-8

মূল্য ঃ একশত টাকা

মুখবন্ধ

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ'-প্রকল্পের প্রথম বই 'শিক্ষাচিন্তা : রবীন্দ্ররচনা-সংকলন' প্রকাশিত হল।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিচয় তুলে ধরা : রবীন্দ্রনাথের চিন্তামূলক রচনা সংকলিত করে' তার সাহায্যে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার সংগে পাঠকের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া।

প্রকল্পের কাজ হল রবীন্দ্রনাথের রচনার (গ্রন্থভুক্ত, পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু অদ্যাবধি কোনো গ্রন্থভুক্ত নয়, এবং অপ্রকাশিত—তিন রকম রচনাই) অনুসন্ধান ও সংগ্রহ, সেগুলিকে বিষয়-অনুসারে ভাগ করা এবং প্রত্যেক ভাগের রচনাগুলিকে কালানুক্রমে বিন্যস্ত করা, এবং অতঃপর প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে সংহত করে' খণ্ডে খণ্ডে নির্বাচিত রবীন্দ্ররচনা-সংকলন প্রকাশ করা।

প্রত্যেক খণ্ডের বিষয় স্বতন্ত্র এবং সেই দিক থেকে প্রতি খণ্ডই—প্রতিটি সংকলনই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সংকলনের প্রতিটি রচনার শেষে প্রয়োজনীয় টীকা, ক্রস-রেফারেন্স (তুলনীয় রচনার নির্দেশিকা), বিষয়-নির্দেশ ইত্যাদি থাকবে। গ্রন্থারম্ভের সম্পাদকীয় ভূমিকায় ১. বিষয়-পরিচয়, ২. রচনাগুলির ঐতিহাসিক-প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক পরিচয় এবং ৩. ওই বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার তত্ত্বগত পরিচয় দেবার চেষ্টা থাকবে।

সংকলনের কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে ক্ষেত্র অনুযায়ী নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে :—

১. শিক্ষাচিন্তা
২. সাহিত্যচিন্তা
৩. সমাজচিন্তা
৪ স্বদেশভাবনা, পল্লীচিন্তা, রাজনীতিচিন্তা, ইতিহাসভাবনা ইত্যাদি
৫. শিল্পচিন্তা : নন্দনতত্ত্ব, সংগীতচিন্তা, চিত্রকলা বিষয়ক চিন্তা ইত্যাদি
৬ দর্শনচিন্তা
৭. ধর্মচিন্তা
৮. ভাষাচিন্তা ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে চিন্তা।

যদিও এখানে আটটি বিষয়ের কথা বলা হল, তাহলেও কাজের বর্তমান অবস্থায় নিশ্চিত করে' বলা সম্ভব নয় যে সিরিজের বইয়ের সংখ্যা আটটিই হবে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিষয় নির্দিষ্ট আটটি কুঠুরিতেই আটকে রাখবার মতো নয় এ কথা কে না বোঝে? সংখ্যাকে বাড়তে দিলে সিরিজটি পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য হয়ে পড়ার আশঙ্কাও আছে। প্রতি বিষয়ের ক্ষেত্রেই আয়তন-সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্যদিকে প্রতি বিষয়ের আয়তন বা রচনার সংখ্যাও সমান নয়। ক্ষেত্রবিশেষে এক বিষয়ের সীমানায় অপর বিষয়কে স্থান দেবার দরকার হয়ে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে

গ্রন্থসংখ্যা আগে-ভাগে সুনির্ধারিত করে দেওয়া যায় না। আট সংখ্যাটি আনুমানিক, পরে সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

বিষয়ের অর্থাৎ প্রকাশিতব্য বইয়ের ক্রমেরও অদল-বদল ঘটতে পারে। প্রথম বইটি শিক্ষাবিষয়ক। সেটি প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় বইটি সাহিত্যবিষয়ক। সেটির কাজ সমাপ্তপ্রায়। তার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয়টির কাজ চলছে। এটি সমাজবিষয়ক। এর পর ক্রমভঙ্গ হবে কি না তা এখন বলা কঠিন।

'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্পকে অনুমোদন করার জন্য এবং উক্ত প্রকল্পের বই প্রকাশে আনুকূল্য করার জন্য রবীন্দ্র-অনুরাগী মাত্রেই বিশ্বভারতীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। শুধু রবীন্দ্র-অনুরাগী কেন, বাংলা সংস্কৃতির সম্পর্কে, ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহশীল—মানব-চিন্তার ঐতিহাসিক প্রবাহ সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহশীল, এই কাজের জন্য তাঁরা সকলেই বিশ্বভারতীর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে আলাদা করে প্রকল্পের কর্মী হিসেবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্যের মতো মনে হবে।

প্রকল্পের কাজে রবীন্দ্রভবন-কর্তৃপক্ষের কাছে সব সময় সব রকম আনুকূল্য পেয়েছি। সেজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভবনের কর্মীদের কাছেও অনেক ব্যক্তিগত সাহায্য পেয়েছি। এই সূত্রে তাঁদের সকলকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পর্যাপ্ত সহযোগিতা পেয়েছি প্রকল্পের গবেষণা-কর্মী ডঃ সান্ত্বনা মজুমদারের কাছ থেকে। কিন্তু প্রকল্পের কাজের সঙ্গে তিনি যেভাবে যুক্ত তাতে তাঁকে ধন্যবাদ দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

প্রকাশনা-সংস্থার (গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ) শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তীর কথা আলাদা করে বলতে চাই। তাঁর বিদ্যানুরাগ এবং রবীন্দ্রানুরাগের কারণে কাজটিকে তিনি যে রকম গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাতে বোঝা যায়, কাজটিকে তিনি রবীন্দ্রকৃত্য বলেই মনে করেন। সেক্ষেত্রে কে যে কাকে ধন্যবাদ দেবে জানি না। তবু আমাদের তরফ থেকে তাঁকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেই এই গ্রন্থপ্রকাশের কাজে আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে সংকলন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা পাঠকদের কাছে আলাদা করে নিবেদন করছি—

১ সংকলনের সর্বত্র স্বীকৃত আধুনিক বানান রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে। সমতারক্ষার জন্য পুরানো রচনার পুরানো বানানকে বদলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সর্বপ্রকার সমতারক্ষা সর্বত্র সম্ভব হয় নি।

২. সাধুভাষা চলিতভাষার ক্ষেত্রে এরকম সমতারক্ষা সম্ভব হয় নি। কিছু কিছু সাধুভাষায় রচিত প্রবন্ধ উত্তরকালে চলিতভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব প্রবন্ধের ক্ষেত্রে চলিত রূপটিই এখানে রাখা হয়েছে।

৩. প্রতি রচনার শেষে তুলনীয় প্রসঙ্গের (ক্রস-রেফারেন্সের) যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় কেবল বর্তমান সংকলনে-গৃহীত রচনারই নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। সে তালিকাতে সংকলনের সমস্ত প্রাসঙ্গিক রচনাই যে সর্বত্র স্থান পেয়েছে তাও নয়। তালিকা সম্পূর্ণ করতে গেলে তা অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ত। তাতে কাজের পক্ষে সুবিধার থেকে অসুবিধাই বেশি হবার সম্ভাবনা।

৪. ভূমিকার ঐতিহাসিক পরিচয় অংশে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামূলক রচনার ধারাকে তিনটি পৃথক কালপর্বে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে : এক, প্রাক্ শান্তিনিকেতন পর্ব ; দুই, শান্তিনিকেতন প্রাক্-বিশ্বভারতী পর্ব এবং তিন, বিশ্বভারতী পর্ব। সূচিপত্রও এই ভাগের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু এই ভাগ সর্বসম্মত না-ও হতে পারে। নানা কারণে মূল পাঠে—অর্থাৎ সংকলন-অংশে কোনো পর্বভাগের চিহ্ন রাখা হয় নি।

৫. দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে সাধারণত একই বিষয়ের টীকা একাধিকবার দেওয়া হয় নি। নির্দেশিকা থেকে প্রয়োজনীয় টীকার সন্ধান পাওয়া যাবে।

৬ ভূমিকায় প্রকাশিত কোনো মতামতেরই দায়িত্ব বিশ্বভারতীর নয়, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণই সম্পাদকের, আর কারো নয়।

ভুলভ্রান্তির দায়িত্বও সম্পাদকেরই।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

শান্তিনিকেতন
২০ জুলাই, ১৯৮২
৩রা শ্রাবণ, ১৩৮৯

সূচিপত্র

বিশ্বভারতী পর্ব

সংকেত

র=রবীন্দ্ররচনাবলী; পরবর্তী সংখ্যাটি খণ্ড-নির্দেশক; তারপরের সংখ্যা পৃষ্ঠা-নির্দেশক। দৃষ্টান্ত—র।১।১=রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠা। কোনো স্বতন্ত্র নির্দেশ না থাকলে বুঝতে হবে, রচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (১৩৬৮)।

রচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণ হলে তার নির্দেশ দেওয়া থাকবে। যেমন—
র।১২শ, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃ-৫০৩

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ :
প্রতিকৃতি রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ

শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্ররচনা-সংকলন

"ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ-ভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে, তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়।"

সমাধান (১৯২৩, অগ্রহায়ণ ১৩৩০), কালান্তর, র।১৩।৩২১

"…দেশকে মুক্তি দিতে হলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে……।"

তদেব, র।১৩।৩২৩

"… শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।"

অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, ১৫ নভেম্বর ১৯৩৪ (চিঠিপত্র—১১, পৃ. ১২২)

"পৃথিবীতে আজ যে-সব জাতি যে-কোনো রকম লড়াই চালাচ্ছে, তাদের সকলেরই জোর সর্বজনীন জনশিক্ষায়।"

তদেব, ২০ মে ১৯৩৯ (চিঠিপত্র—১১, পৃ. ২৮৯)

ভূমিকা

১। সংকলন-পরিচয়
২। ঐতিহাসিক পরিচয়
৩। তত্ত্বগত পরিচয়

"সুদীর্ঘকাল ধরে অনেক লেখা লিখে এসেছি,—ভুলেছি তার অধিকাংশ। নিঃসন্দেহ তারা বার বার পরস্পরকে প্রতিবাদ করেছে। মতের ধারা চিন্তার ধারা পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদীর মতো—এক পর্বত থেকে নামে কিন্তু চিত্তক্ষেত্রের অবস্থা অনুসারে ভিন্ন দিক নেয়।...জীবনে সত্যের প্রবাহ বাঁক ফেরে, প্রত্যেক বাঁকেই তার সত্যতা আছে।—সত্যই বাদী সত্যই প্রতিবাদী, উপর থেকে খটকা লাগে, তলিয়ে দেখলে মিল পাওয়া যায়।"

[রবীন্দ্রনাথের পত্র, বৃন্দাবন ভট্টাচার্যকে লেখা, শান্তিনিকেতন, ১০।৩।১৯৩৭]

১। সংকলন-পরিচয়

ক। সূচনা
খ। বিন্যাস **প্রসঙ্গে**
গ। উপস্থাপনা প্রসঙ্গে
ঘ। সীমানা **প্রসঙ্গে**

ক. সূচনা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' ১২৯৯ সালের পৌষের সাধনায় প্রকাশিত হয়। রচনাটি এর অল্প আগে রাজশাহীতে ভাষণ রূপে পঠিত হয় (নভেম্বর ১৮৯২)। রবীন্দ্রনাথের তখন শিলাইদহ বা 'সোনার তরী' পর্ব চলছে। বয়স একত্রিশ পূর্ণ হবার মুখে। তখনো রবীন্দ্রনাথ কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত হন নি। শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আরো নয় বৎসর পরের ঘটনা। শিক্ষাব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংগে যুক্ত না হলেও, 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের কোথাও অনভিজ্ঞতার বা মনোযোগের অভাবের কোনো ছাপ নেই, কোথাও চিন্তার দুর্বলতার বা মননের অগভীরতার কোনো চিহ্ন নেই। প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে দেশের শিক্ষাব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার প্রমাণ আছে।

আরম্ভের আগেও অবশ্য অলক্ষ্য আরম্ভের পালা থাকে। প্রবন্ধ প্রথম হলেও, চিন্তারও যে এইখানেই সূত্রপাত এমন বলা যায় না। শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যে এর অনেক আগেই জাগ্রত হয়েছে, তার প্রমাণ আছে ষোলো বছর বয়সে রচিত 'মেঘনাদবধ' প্রবন্ধে (১৮৭৭ শ্রাবণ ১২৮৪), কিংবা বাইশ বছর বয়সে রচিত 'ন্যাশনল ফণ্ড' প্রবন্ধে (১৮৮৩, কার্তিক ১২৯০)। আরো কিছু প্রমাণ তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে খণ্ড-ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য একটি নিদর্শন পাই 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রী'-তে (১২৯৮, ইং ১৮৯২)। অবশ্য বলা দরকার যে এর কোনোটিই সরাসরি শিক্ষাবিষয়ক রচনা নয়।

'শিক্ষার হেরফের' সরাসরি শিক্ষা বিষয়ক রচনা।

'শিক্ষার হেরফের' রচনার কাল (১২৯৯, ইং ১৮৯২) থেকে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ রচনা করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, পত্র-প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, নানা আলাপ-আলোচনায় এই বিষয়ে নিজের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রক্রিয়া প্রায় ছেদহীন।

কিন্তু কোনো প্রবন্ধই কেবল প্রবন্ধরচনার জন্য রচিত নয়, কোনো ভাষণই কেবল ভাষণের জন্য রচিত নয়। সমস্তেরই লক্ষ্য কর্ম, সমস্তেরই লক্ষ্য উদ্দেশ্যসাধন। এই উদ্দেশ্যসাধনেরই প্রধান ও প্রত্যক্ষ সোপান আশ্রম-বিদ্যালয়স্থাপন, পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা, শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

দেশের প্রচলিত শিক্ষাবিধির বিরুদ্ধে নিতান্ত বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করেছিলেন। এই নেতিবাচক ক্রিয়াটি পরে ইতিবাচক কর্মের মধ্যে সম্পূর্ণতা পেল

যখন তিনি শান্তিনিকেতনে ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় স্থাপন করলেন, আরো সতেরো বছর পরে ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলেন (আইনসম্মত উদ্বোধন হয় ১৯২১ সালে), শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯২১ সালে এবং তার ৩ বছর পরে ১৯২৪ সালে শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। অনমনীয় এক বালকের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ হয়তো আদৌ গণনীয়ই হত না, যদি এই ব্যক্তিগত বিদ্রোহের সূত্র ধরে, এরই ফলপরিণামে আমরা একদিকে এইসব ঐতিহাসিক কর্ম-প্রয়াসকে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন প্রবন্ধ-ভাষণাদির মধ্যে দিয়ে একটি অত্যন্ত মহার্ঘ শিক্ষাতত্ত্বকে না পেতাম।

* * *

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামূলক রচনার মোট সংখ্যা নির্দিষ্ট করা কঠিন। তার কারণ এ বিষয়ে তার রচনা নানা জাতের। যেমন, বাংলা প্রবন্ধ, ইংরেজি প্রবন্ধ, বাংলা-ভাষণ, ইংরেজি ভাষণ, পত্রপ্রবন্ধ (পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ) ইত্যাদি। এ ছাড়া ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। ভ্রমণকথা, ডায়েরি আত্মচরিতের অংশবিশেষ, বিষয়ান্তরের প্রবন্ধে শিক্ষাবিষয়ক অংশ, এগুলোও ধরা দরকার। এ রকম অবস্থায় সঠিক সংখ্যানিরূপণ সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভ্রমণকথা ডায়েরি বা বিষয়ান্তরের প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনা, এ সব যদি বাদও দিই, নিছক ব্যক্তিগত চিঠির মধ্যে লভ্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্যকে যদি গণনা না-ও করি, অর্থাৎ কেবল বাংলা-ইংরেজি মূল প্রবন্ধভাষণ-পত্রপ্রবন্ধই যদি ধরি, তাহলে তার সংখ্যা একশর বেশ কিছু উপরে।

এই শতাধিক প্রবন্ধ-ভাষণাদির অধিকাংশই এখন পর্যন্ত কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক সংকলনগ্রন্থ এ পর্যন্ত একটিই প্রকাশিত হয়েছে—'শিক্ষা'। 'শিক্ষা'র প্রথম প্রকাশ ১৩১৫ সালের গদ্যগ্রন্থাবলীর ১৪শ ভাগ রূপে। তাতে মাত্র ৭টি প্রবন্ধ ছিল। পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালে। পরিশিষ্ট নিয়ে তাতে প্রবন্ধ ছিল ২২টি। কিছু নতুন গ্রহণ-বর্জন করে বর্তমান সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ১৩৫১ সালে। বর্তমানে তার ১৩৬০ সালের মুদ্রণ প্রচলিত। এতে প্রবন্ধ আছে ২৩টি। 'শিক্ষা'-র ২য় খণ্ড বর্তমানে যন্ত্রস্থ। তাতে জোর দেওয়া হয়েছে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপর।

কিছু কিছু বড়ো প্রবন্ধ বা ভাষণ, বা ভাষণধারা স্বতন্ত্র বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', 'প্রাক্তনী', 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', 'শিক্ষার আন্দোলন', 'শিক্ষার ধারা', 'বিশ্বভারতী' ইত্যাদি। মৌলিক ইংরেজি রচনা বা বাংলা রচনার অনুবাদপুস্তিকা, যেমন, 'A Poet's School', 'Centre of Indian Culture', 'The Parrot's Training'—এইগুলো ধরলে আরো অন্তত সাতটি বইয়ের নাম এই তালিকায় যুক্ত হবে। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', 'ইতিহাস', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি'—এই সব বইয়ের কোনো কোনোটির প্রাসঙ্গিক আলোচনার অংশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বর্তমান প্রয়াসের লক্ষ্য হল রবীন্দ্রনাথের রচনা সংকলিত করে

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথাসম্ভব যথাযথ পরিচয় দেওয়া। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক রচনাসমূহ থেকে—প্রবন্ধভাষণপত্র ইত্যাদি থেকে, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে—একটি যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য সংকলনগ্রন্থ প্রস্তুত করা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক বিপুল রচনাসম্ভার থেকে যে-কোনো ছোট বা মাঝারি বা অনতিবৃহৎ 'নির্বাচিত সংকলন', বিশেষত সেই সংকলনের অবলম্বন যেখানে কোথাও-বা সমগ্র রচনা আবার কোথাও বা নির্বাচিত রচনাংশ, তা যে অনেকখানি পরিমাণে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ এবং অতৃপ্তিদায়ক হতে বাধ্য, একথা অস্বীকার করার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, এই সংকলন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক সমগ্র রচনার বিকল্প নয়। এই আংশিক ও খণ্ডিত সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাই যেখানে মূল্যহীন বা বর্জনযোগ্য নয়, সেখানে অনেক রচনার বর্জন, যেখানে কোনো রচনাংশই বাদ দেবার মতো নয়, সেখানে অনেক রচনাংশের বাদ দেওয়া, এরকম সংকলন যে সমগ্রের সন্ধানীর কাছে কখনোই আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না, কখনোই সন্তোষজনক হতে পারে না, এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যথার্থই যাঁরা রবীন্দ্ররচনার সমগ্রের সন্ধানী এবং কেবল সমগ্রেরই সন্ধানী, তাঁদের জন্য রবীন্দ্ররচনাবলীই থাকবে, এবং রচনাবলীতে ধরা নেই কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেই সব দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধাদি থাকবে, অপ্রকাশিত পত্রাদিও থাকবে,—এ সংকলন-গ্রন্থ প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের জন্য নয়। লুপ্ত বা দুষ্প্রাপ্য আকর থেকে খুঁজে খুঁজে প্রবন্ধ সংগ্রহ করা যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, এ গ্রন্থ প্রধানত তাঁদের জন্য।

একটা কথা এইখানে বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকাশ বিশাল রবীন্দ্ররচনার নানা এলাকায় নানা কক্ষে ছড়িয়ে আছে। তার সমগ্রতা এমন কি বিশেষজ্ঞের পক্ষেও খুব সুগম নয়। অনেক রচনা, গ্রন্থভুক্ত হওয়া তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত রবীন্দ্ররচনাবলীতেও গৃহীত হয় নি—না বিশ্বভারতী সংস্করণে, না পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণে। আজো তারা বিভিন্ন অধুনালুপ্ত দুষ্প্রাপ্য জীর্ণ পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে আছে। তাদের অধিকাংশই এখানে গৃহীত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞের কথা যাই হোক না কেন, দেশের সাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী মানুষের পক্ষে একটি অনতিবৃহৎ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া কম লাভের কথা নয়।

খ বিন্যাস প্রসঙ্গে

বর্তমান সংকলনের রচনাগুলি ঐতিহাসিক পরম্পরায় পরিবেশিত হয়েছে।

নিজের চিন্তা ও নিজের রচনা সম্পর্কে এক সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা

করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সেই সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।" (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-নৈতিক মত, কালান্তর, র।১৩।৩৭০)।

কথাটা রাষ্ট্রনৈতিক মত প্রসঙ্গে বললেও মোটামুটি সমস্ত বিষয়ের চিন্তা সম্পর্কেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য। এ কথার পিঠাপিঠই তিনি বলেছেন, "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত।" (তদেব)

ওই একই প্রবন্ধে চিন্তাকে সমগ্র করে দেখার প্রয়োজনের কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। পরম্পরা যদি তাৎপর্যসূত্রে গ্রথিত না হয়, তাহলে তা ইতিহাস হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, " কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটেকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ **গৌণ**, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই।" (তদেব)

সংকলয়িতার কাজ সেই ঐক্যসূত্রটি লক্ষ করা, গৌণকে নেপথ্যে রেখে মুখ্যকে তুলে ধরা, যা তৎসাময়িক তাকে বাদ দিয়ে যা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান তাকে সামনে নিয়ে আসা। এইখানেই নির্বাচিত সংকলনের প্রধান সার্থকতা।

বর্তমান সংকলনে রবীন্দ্রনাথের মোট একশ'টি রচনা বা রচনাংশ নির্বাচন করে নেওয়া হয়েছে। এই একশ'টি রচনার কোনো-কোনোটি সমগ্র প্রবন্ধ, কোনো-কোনোটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ। তেমনি কোনো-কোনোটি সমগ্র পত্র, কোনো-কোনোটি অংশ-বিশেষ। আবার কোনো কোনো রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থের শিক্ষা বিষয়ক প্রাসঙ্গিক অংশ। যেমন, 'জীবনস্মৃতি' বা 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' অথবা 'যাত্রী' কিংবা 'পল্লীপ্রকৃতি' কি 'প্রাক্তনী' কিংবা 'বিশ্বভারতী' থেকে নির্বাচিত রচনাংশ। শিক্ষা বিষয়ের সম্পূর্ণ একই দিক নিয়ে, একই সিদ্ধান্ত উপস্থিত করে রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সব কটিকেই এখানে নেওয়া হয় নি, এরই মধ্যে যেটি বক্তব্য বাচন ইত্যাদির কারণে মুখ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, সেইটিকেই নির্বাচন করে নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ বা পত্রের সেই অংশই বর্জিত হয়েছে যাকে আপেক্ষিক অর্থে গৌণ বা তৎসাময়িক বলে গণ্য করা যায়। নির্বাচনে সেই সব রচনা বা রচনাংশের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে যাদের আজকের দিনে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, যারা বিশেষ কালের সীমানাকে অতিক্রম করে প্রবহমান।

কাজের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার ধারাকে এখানে আমরা তিনটি পৃথক কালপর্বে ভাগ করে নিয়েছি। ভাগটা চিন্তার ছেদকে অবলম্বন করে নয়। বস্তুত চিন্তা ছেদহীন। ভাগ শিক্ষাবিষয়ক তাঁর কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত—সংশ্লিষ্ট কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।

চিন্তা ছেদহীন হলেও তার ক্রমবিবর্তন আছে, তার মধ্যে পর্বে পর্বে অভিনবত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, পর্বে পর্বে নতুন মূল্যের, নতুন তাৎপর্যের সঞ্চার ঘটেছে। এই অভিনবত্বের দিক থেকে দেখলে—অর্থাৎ ভাবের দিক থেকে **দেখলে** একে সম্পূর্ণ ছেদহীন বলা যায় না। এইখানেই পর্বভাগের উপযোগিতা।

ভাবের মোড়-ফেরার সঙ্গে ঘটনার সংযোগ সব সময় আপাতিক নয়। কোন্‌টা কার্য কোন্‌টা কারণ, সব সময় জোর করে বলা না গেলেও, যেহেতু ঘটনাই বাইরের থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্য, পর্বভাগ ঘটনা দিয়েই সুবিধাজনক। যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় পর্বভাগের ছেদবিন্দু বলে ধরে নিয়েছি, তার একটি হল ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর (৭ই পৌষ ১৩০৮) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় (নামান্তরে আশ্রম-বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়টি সতেরো বছর পরের ঘটনা। সেটি হল ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে (৮ পৌষ ১৩২৫) শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা। সকলেই জানেন, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কয়েকটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপ প্রতিষ্ঠা—১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে—প্রশাসনিকভাবে কার্যারম্ভ ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮ (৮ পৌষ ১৩২৫)। দ্বিতীয় ধাপ—অধ্যয়ন-অধ্যাপনার আরম্ভ—জুলাই ১৯১৯ (আষাঢ় ১৩২৬)। তৃতীয় বা শেষ ধাপ—আইনসম্মত উদ্বোধন—ডিসেম্বর ১৯২১ (৮ পৌষ ১৩২৮)। এখানে—আমাদের পর্বারম্ভের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম ধাপটিকে যথার্থ আরম্ভ বলে গণ্য করেছি।

আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বভারতী **প্রতিষ্ঠা**, এই দুটি ঘটনাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজীবনে এবং কর্মজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার গুরুত্ব কম নয়।

সে যা-ই হোক, এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে চোখের সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় আমরা নিম্নলিখিত রকমের পর্বভাগ করে নিতে পারি :—

এক : প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্ব ;

দুই : শান্তিনিকেতন প্রাক্-বিশ্বভারতী পর্ব ;

তিন : বিশ্বভারতী পর্ব।

১. প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্ব

পর্বটি প্রথম থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ থেকে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপন পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

এই পর্বের সঙ্গে কোনো উল্লেখযোগ্য শিক্ষাবিষয়ক কর্মপ্রয়াস যুক্ত ছিল না। এই পর্বের শেষের দিকে শিলাইদহ কুঠিতে নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে ঘরোয়া শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, সেই গৃহবিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। তাহলেও সেই ক্ষুদ্র ব্যবস্থাকে যথার্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলা সংগত হবে না।

পর্বের আরম্ভের দিকটা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। ১৮৭৭ সালে ষোল বছর

বয়সে রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (১২৮৪) 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন, তার মধ্যে এদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আছে। তাকেই আমরা কার্যক্ষেত্রে শিক্ষাবিষয়েক চিন্তার আত্মপ্রকাশের প্রথম ধাপ বলে ধরে নিতে পারি।

এই পর্বের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রচনা—শিক্ষা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ হল 'শিক্ষার হেরফের'।

বর্তমান সংকলনে এই পর্ব থেকে মোট ৭টি রচনা বা রচনাংশ সংকলিত হয়েছে।

২. **শান্তিনিকেতন প্রাক্-বিশ্বভারতী পর্ব**

এই দ্বিতীয় পর্বটিকে বলা যেতে পারে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পর্ব।

যাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যেতে পারে—বিশুদ্ধ ঐতিহ্য-অনুযায়ী শিক্ষা, তারই প্রয়াস দিয়ে এই পর্বের শুরু। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় (নামান্তরে আশ্রম-বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয় **পৌষ** ১৩০৮ (ডিসেম্বর ১৯০১) সালে। এইখানেই এ পর্বের আরম্ভ। এর ব্যাপ্তি ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ পর্যন্ত।

বর্তমান সংকলনে এই পর্ব থেকে মোট ২৮টি রচনা বা রচনাংশ সংকলিত হয়েছে।

৩. **বিশ্বভারতী পর্ব**

তৃতীয় পর্বের সূচনা শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার (ভিত্তিস্থাপন ডিসেম্বর ১৯১৮, বাং ৮ পৌষ ১৩২৫) সময় থেকে। এর ব্যাপ্তিকাল রবীন্দ্রজীবনের শেষ প্রান্ত অবধি (১৯৪১)।

যেহেতু এটি বিশ্বভারতী পর্ব, সেই হেতু—অর্থাৎ বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংযোগের কারণে—এই পর্বে ইংরেজি প্রবন্ধ ও ভাষণের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। তার ফলে বাংলা রচনার বা বাংলা ভাষণের সংখ্যা যে কমে গিয়েছে, এমন নয়।

অধিকাংশ ইংরেজি প্রবন্ধ বা ভাষণের মূল বক্তব্য পূর্বেই কোনো-না-কোনো বাংলা রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। তা হলেও ইংরেজি রচনার মধ্যে কয়েকটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—'The Centre of Indian Culture' (১৯১৯), 'An Eastern University' (১৯২১), The Visva-Bharati Ideal' (১৯২৩), 'The School Master' (১৯২৪), 'A Poet's School' (১৯২৬), 'Ideal of Education' (১৯২৯), 'My Educational Mission' (১৯৩১), 'Ideal of Indian University' (১৯৩৪) ইত্যাদি। বর্তমান সংকলনে এর তিনটি থেকে—'School Master', 'A Poet's School' এবং 'My Educational Mission'—রচনাংশ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এলমহার্স্টকে লিখিত একটি চিঠির (ইংরেজি) অংশবিশেষও এখানে সংকলিত হয়েছে।

বর্তমান সংকলনে এই পর্ব থেকে ৬১টি বাংলা ও পরিশিষ্টে ৪টি ইংরেজি রচনা বা রচনাংশ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ পর্বে মোট ৬৫টি রচনা সংকলিত হয়েছে।

তিন পর্ব মিলিয়ে বর্তমান গ্রন্থে ৯৬টি বাংলা ও ৪টি ইংরেজি. মোট ১০০টি রচনা বা রচনাংশ নেওয়া হয়েছে।

গ. উপস্থাপনা প্রসঙ্গে

এই সংকলনের একশ'টি রচনা বা রচনাংশকে তিন পর্বে, একাদিক্রমে সংখ্যায় চিহ্নিত করে, কালানুক্রমে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যেখানে সমগ্র রচনাটি গৃহীত হয় নি, সেখানে বর্জিত অংশের স্থান চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেকটি রচনার সঙ্গে সেই রচনাসম্পর্কিত আনুষঙ্গিক তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। রচনাকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, নীচে তার নির্দেশ দেওয়া গেল :—

এক। শিরোনাম ;

দুই। প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যাদি : পত্রিকার ক্ষেত্রে তার তারিখ, ভাষণের ক্ষেত্রে স্থানকাল, পুস্তিকার ক্ষেত্রে তার প্রথম প্রকাশের কাল ইত্যাদি ;

তিন। মূল রচনা বা রচনাংশ ;

চার। টীকা ;

পাঁচ। উল্লেখযোগ্য বিষয় বা বক্তব্য ;

ছয়। তুলনীয় প্রসঙ্গ সম্পর্কে নির্দেশ—ক্রস্-রেফারেন্স।

যষ্ঠ বিষয়টি—তুলনীয় প্রসঙ্গের নির্দেশ বা ক্রস্-রেফারেন্স যে প্রত্যেকটি রচনার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রয়োজনীয় এমন নয়। এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র করতে হলে প্রত্যেকটি রচনাতেই অপর প্রত্যেকটি রচনার নির্দেশ দিতে হয়। এখানে তার প্রয়োজন নেই। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই মাত্র এই তুলনা-নির্দেশক সংকেতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চতুর্থ বিষয়টি—অর্থাৎ টীকা—তা-ও কেবল বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রের জন্যই সীমিত করে রাখা হয়েছে।

ভূমিকার প্রথম ভাগে, অর্থাৎ সংকলন-পরিচয়ে বর্তমান সংকলনগ্রন্থটির সেই সব তথ্যেরই পরিচয় বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে যা সংকলনকাজের সঙ্গে অল্প বিস্তর সম্পর্কিত। ভূমিকার এই অংশটি প্রধানত আকর, সংগ্রহ ও বিন্যাস সম্পর্কিত নির্দেশ।

ভূমিকার দ্বিতীয় ভাগটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার ঐতিহাসিক পরিচয়ের খসড়া জাতীয় বস্তু। বর্তমান সংকলনগ্রন্থটি কালানুক্রমে ঐতিহাসিকভাবে বিন্যস্ত। এখানে সেই ধারাকে রক্ষা করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাকে রবীন্দ্রনাথের দেশকালের এবং রবীন্দ্রজীবনের প্রেক্ষাপটে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি জটিল এবং সুবিস্তৃত। ভূমিকা যাতে অশোভন রকমের দীর্ঘায়ত হয়ে না পড়ে সেইজন্য বক্তব্যকে যথাসম্ভব ইঙ্গিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস করা হয়েছে।

ভূমিকার তৃতীয় ভাগটি—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের রূপরেখা—মোটামুটি বিষয়-ভিত্তিক। এখানে রবীন্দ্রনাথের **শিক্ষাচিন্তাকে** তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন করে, তার তত্ত্বগত রূপটিকে বিষয়ভিত্তিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয় অর্থ এখানে মূলত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের এক-একটি দিক। যেমন, শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা আদর্শ ; অথবা যেমন, শিক্ষার বাহন, বা শিক্ষা ও ভাষা, বলতে পারি—শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান, কিংবা যা একই সঙ্গে গাঁথা—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ ;

কিংবা যেমন, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা, বা শিক্ষা ও জীবন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, বিষয়গুলির সবই সমান তত্ত্বভিত্তিক বা সমান দার্শনিক গোত্রের নয়, অনেকগুলো শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যেমন, শিক্ষা ও শিক্ষায়তন, শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষাবিস্তার বা জনশিক্ষা, কারুশিক্ষা, কিংবা যেমন, শিক্ষা ও জীবিকা, স্ত্রীশিক্ষা। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ব্যবহারিক হলেও এদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই তত্ত্বগত প্রশ্ন জড়িত।

ভূমিকার তৃতীয় ভাগে যে-সব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির সঙ্গে ওই বিষয়ে সংকলনে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, সংকলনের রচনাগুলির শেষে যে ক্রস-রেফারেন্স বা তুলনীয় প্রসঙ্গের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও পাঠক বিষয়ানুগভাবে রচনার নামোল্লেখ পাবেন।

ঘ. সীমানা প্রসঙ্গে

বর্তমান সংকলনের নির্দিষ্ট সীমানার সম্পর্কে, ঠিক কী এই সংকলনের অভিপ্রেত এবং কী নয়, তার সম্পর্কে পাঠকদের আর একবার সচেতন করে দিতে চাই। অন্যথায় কোনো পাঠক হয়তো ভুল প্রত্যাশা নিয়ে এই সংকলনের কাছে উপস্থিত হয়ে হতাশ হতে পারেন, হয়তো এমন কিছু চাইতে পারেন যা এই সংকলনের সম্পূর্ণ অভিপ্রায়-বহির্ভূত।

এই জন্যই স্পষ্ট করে বলা দরকার যে এই সংকলনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্য হল—যথাসম্ভব বাহুল্যবর্জিতভাবে, বিষয়ান্তর-সংযোগজনিত জটিলতা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার যথাসম্ভব যথাযথ পরিচয় দেওয়া। এখানে জোর রয়েছে চিন্তা কথাটার উপর। অর্থাৎ এই পরিচয় বিশেষভাবে চিন্তারই পরিচয়, মননের পরিচয়, শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বসিদ্ধান্তের পরিচয়, কিন্তু শিক্ষাবিষয়ক কর্মপ্রয়াসের পরিচয় নয়, শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগের পরিচয় নয়। এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের—philosophy of education বা theory of education-এর পরিচয় পাওয়া যাবে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক ভাবনাচিন্তা পরিণতি-পর্বে পৌঁছুবার পথে যেভাবে ডাইনে ও বাঁয়ে পদক্ষেপ করে' করে' এগিয়েছে সেই পরিক্রমার পরিচয় পাওয়া যাবে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারার পরিচয় পাওয়া যাবে। এর সবই চিন্তাধর্মী, দেশকালের সঙ্গে সংযুক্তভাবে চিন্তার চলৎ-রূপ এবং যথাসম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে—ঘটনাপ্রবাহ থেকে আপেক্ষিক অর্থে বিযুক্তভাবে চিন্তার তত্ত্বরূপ। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এই শিক্ষাতত্ত্বের যে প্রয়োগ ঘটেছে, তাকে নিয়ে বিভিন্ন পর্বে দেশের এক প্রান্তে যে বৃহৎ কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে—এবং আজো হয়ে চলেছে, যদি এক্সপেরিমেণ্ট বলি তাহলে সেই কঠিন এক্সপেরিমেণ্টের, যদি এ্যাড্‌ভেঞ্চার বলি তাহলে সেই দুঃসাহসী এ্যাড্‌ভেঞ্চারের, যদি সাধনা বলি তাহলে সেই মহৎ সাধনার সাফল্য বা অসাফল্যের ইতিহাস এখানে মিলবে না।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগের ইতিহাস, তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রিক বহু-শাখায়িত

এবং বহু-স্তরান্বিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিচিত্র কর্মপ্রয়াসের ইতিবৃত্ত যে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ এবং মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে রচিত হচ্ছে। অনুমান করি অনতিবিলম্বেই তা বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হবে।

বর্তমান সংকলনের সীমানা সম্পর্কে আরো একটা কথা বলা দরকার। স্মরণ রাখতে হবে যে এটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক নির্বাচিত রচনা বা রচনাংশের সংকলন, শিক্ষা-বিষয়ক তাবৎ রচনার অমূনিবাস নয়। এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা, এতাবৎ পুস্তকে ধরা হয় নি এমন রচনা, অধুনা-বিস্মৃত দুষ্প্রাপ্য রচনা অনেক সংগৃহীত ও পরিবেশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সংগ্রহ শ্রমসাধ্য ও অনুসন্ধানসাপেক্ষ। কিন্তু এই অনুসন্ধান বা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা—তার তাৎপর্য, গুরুত্ব, বিশেষত্ব এবং অ-পূর্বতাই সংগ্রহের নিয়ামক, নিছক দুষ্প্রাপ্যতা নয়, রচনার সমগ্রতা নয়, আহরণের বিপুলতা নয়, সংগ্রহের জন্য সংগ্রহ নয়। অর্থাৎ কোনো রচনা অপ্রকাশিত বা দুষ্প্রাপ্য বলেই যে তা সংগৃহীত হবে, তা বর্তমান সংকলনের অভিপ্রায় নয়।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত, দুষ্প্রাপ্য এবং লুপ্তপ্রায় রচনার অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং প্রকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি কাজ। কিন্তু সে কাজের জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস এবং স্বতন্ত্র প্রকল্পের প্রয়োজন। অপ্রকাশিত বা দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহের কালেও আমরা আমাদের বর্তমান সংকলনের মূল অভিপ্রায়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছি।

২। ঐতিহাসিক পরিচয়

ক। সূচনা
খ। ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিধি
গ। প্রথম বা প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্ব [১৯০১ সালের পূর্বে]
ঘ। দ্বিতীয় বা শান্তিনিকেতন প্রাক্-বিশ্বভারতী পর্ব [১৯০১ থেকে ১৯১৮ সাল]
ঙ। তৃতীয় বা বিশ্বভারতী পর্ব [১৯১৮ সালের পরে]

ক. সূচনা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সমস্ত পটভূমিকে ব্যাপ্ত করে, আমাদের গোটা শিক্ষা-জগৎকে ব্যাপ্ত করে যে ব্যাপারটি সব সময় ক্রিয়াশীল, তাঁর কালেও এবং আজও, সে হল এদেশে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা, যাকে বলা যেতে পারে ভারতের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একটি নেতিধর্মী অর্থাৎ প্রতিকূল অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূল তত্ত্বটি অবশ্য তাঁর মানবতত্ত্বের উপরে—যাকে তিনি চিরকালীন মানবসত্য বলে মনে করেন—তার উপরে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাঁর শিক্ষাচিন্তার ঐতিহাসিক রূপটি সুস্পষ্ট সীমারেখা পেয়েছে ইংরেজ-প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই।

এর সঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া অভিজ্ঞতাও যুক্ত হয়েছে, যাকে উক্ত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া রূপে গণ্য করা যায়। প্রথমেই দুটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা দরকার।

প্রথমটি হল রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের স্বল্পস্থায়ী স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা। জীবনস্মৃতির পাঠকমাত্রেই রবীন্দ্রনাথের এই দুঃখকর শৈশব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত। এদেশের প্রচলিত যান্ত্রিক শিক্ষাবিধি এবং যন্ত্রবদ্ধ স্কুলজীবন তরুণ শিক্ষার্থীর কচি মনের উপর যে কতো বড়ো জগদ্দল ভার, তা যে কতো প্রাণহীন আনন্দহীন বিড়ম্বনা, তা সেই অত্যন্ত বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আনন্দ এবং মুক্তি যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বে এমন কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়েছে তার মূল অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মানবতত্ত্ব, কিন্তু এর মধ্যে তাঁর বাল্যের স্কুল-জীবনের সেই দুঃখজনক স্মৃতিরও কিছু দান থাকা বিচিত্র নয়।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি অনেক কাল পরের, শিলাইদহ পর্বের শেষের দিকের—রবীন্দ্রনাথের পরিণত-যৌবনের ঘটনা। কোনো কোনো দিক থেকে এই পরবর্তী অভিজ্ঞতাটি তাঁর বাল্যকালের অভিজ্ঞতারই পরিপূরক। এ হল শিলাইদহে তাঁর ঘরোয়া গৃহবিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার বিশেষ গুরুত্ব এর কর্মপ্রবর্তনায়। কেননা, দেখতে পাই, এই অভিজ্ঞতার অল্পকাল পরেই গৃহবিদ্যালয় তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুনভাবে কাজে নেমেছেন। অর্থাৎ এর অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মনোমতো পরিবেশে, নতুন শিক্ষা-আদর্শ সামনে নিয়ে নিজের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

শিলাইদহ গৃহবিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে – তাঁর পুত্রকন্যার, পরোক্ষভাবে —সমবেদনার সূত্রে তাঁর নিজের। বিদ্যালয় যেহেতু কেবল ছাত্রছাত্রী নিয়েই নয়, তা শিক্ষকদের নিয়েও, পরিচালককে নিয়েও, সেই হেতু বলা যায় যে, উক্ত গৃহবিদ্যালয়ের সাফল্য-অসাফল্যের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই অভিজ্ঞতা। আমরা জানি, ওই গৃহবিদ্যালয়ের ইংরেজি শেখানোর জন্য তিনি ইংরেজ লরেন্সকে নিযুক্ত করেছেন, গণিত ও বিজ্ঞান শেখানোর জন্য তিনি জমিদারির কাজ থেকে সরিয়ে এনে জগদানন্দ রায়কে নিযুক্ত করেছেন, সংস্কৃত শিক্ষার কাজে তিনি পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণবকে নিযুক্ত করেছেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়ে তিনি বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনাও করেছেন। বোঝা যায়, শিক্ষা ও বিদ্যালয় ব্যাপারে এই গৃহ-বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাটি তাঁর শিক্ষানবিশীর সঙ্গে যুক্ত।

শিক্ষানবিশীর অবশ্য এইটেই প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। এর আগে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও তিনি একটি গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দুই দিক সম্পর্কেই তিনি তখন থেকে সজাগ। ইংরেজ-প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার সম্বন্ধেও তিনি তখন থেকেই সচেতন।এই সচেতনতার সব থেকে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ (১৮৯২)।

সে যা-ই হোক, এই শিক্ষানবিশীর ইতিবাচক ফল **শান্তিনিকেতনে** ব্রহ্মচর্য-

বিদ্যালয়ের কর্মপ্রচেষ্টায় রূপ নিয়েছে। কিন্তু এর একটা মূল্যবান নেতিবাচক দিকও আছে। শিক্ষার পক্ষে কী কী বিশেষভাবে পরিহারযোগ্য তাও তিনি খানিকটা এইখান থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিখেছেন। এইখানে তাঁর তত্ত্ব তাঁর অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। বাল্য-অভিজ্ঞতায় যেমন জেনেছিলেন শিক্ষা যান্ত্রিক হবে না, আনন্দহীন হবে না, একঘেয়ে হবে না, শিলাইদহের শিক্ষানবিশীতেও তিনি খানিকটা তা-ই জানলেন।

শিলাইদহের অভিজ্ঞতার কথাটা একটু খুলে বলা দরকার। অনেক পরবর্তী কালে একেবারে বৃদ্ধ বয়সে ওই গৃহবিদ্যালয়ের ছাত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে (১৯৬৬) উক্ত বিদ্যালয়ের অনেক প্রশংসনীয় দিকের কথা বলেছেন। নেতিবাচক দিক কিছু বলেন নি। হয় তিনি অনুভব করার বয়সে পৌঁছন নি, না হয় তাঁর স্মরণে নেই, আর না হয় কালের দুস্তর ব্যবধানে স্মৃতি সবটার রঙ পাল্টিয়ে দিয়েছে। ঠিক ছবিটি পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (বেলা) বাবাকে লেখা চিঠির সমকালীন সাক্ষ্য থেকে।

শিলাইদহের নির্জনতা, নগরজীবন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে আনার পর শিলাইদহের বিরলবর্ণ প্রশান্তি, ধ্যানের অবসর, কাজের সূত্রে পল্লীজীবনের সঙ্গে সংযোগ, দেশকে যথার্থভাবে দেখার ও চেনার অবকাশ—শিলাইদহবাসে রবীন্দ্রনাথের এই সব প্রাপ্তি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের পক্ষে এ সব যে মহামূল্যবান সম্পদ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-ও সহজেই অনুমান করা যায় যে, শিক্ষাহীন আনন্দহীন দরিদ্র অন্ধকার একটি গ্রামের সংকীর্ণ নিস্তরঙ্গ জীবন রবীন্দ্রনাথের গৃহবিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের কাছে সর্বাংশে সুখকর ছিল না। ১৮৯৯ সালে, অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৎসরাধিক কাল পূর্বে পিতার কাছে মাধুরীলতা যে সব চিঠি লিখেছিল, তার দু-একটি থেকে তাদের গৃহবিদ্যালয়ের একঘেয়ে পরিবেশ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়। তখন মাধুরীলতার বয়স ১৩, রথীন্দ্রনাথের বয়স ১১, রেণুকার বয়স ৯, আর কনিষ্ঠ কন্যা মীরার বয়স ৬ বছর। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তখন শিশু, বয়স ৩ বছরের নিচে। একটি চিঠিতে মাধুরীলতা লিখেছে, "···সারাদিন গল্পের বই পড়ে, আর ৪টি ঘণ্টা Mr. Lawrence-এর কাছে পড়ে দিন কাটান শক্ত হয়ে ওঠে।" [বৃহস্পতিবার, ১৮৯৯ (?)

এ চিঠিতে ক্লান্তির কথা আছে, দৈনিক দীর্ঘ চার ঘণ্টা সাহেবের কাছে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কথা আছে, এর বেশি কিছু বলা নেই। কিন্তু না-বলা কথা অনেকটাই অনুমান করে নেওয়া যায়। অপর একটি চিঠিতে বলা এবং না-বলা দুই-ই অনেকখানি।—

"শিলাইদা, ভায়া কুমারখালি

সোমবার, ২৯।৫।৯৯

··এখানে আর ভাল লাগে না। সব বড় এক ঘেঁয়ে মনে হয়। আজ যেমন যাচ্ছে, কালও তেমনি যাবে, তারপরদিনও সেইরকম যাবে; একদিনের monotony ভাঙবে না। বরং কলকাতায় এ, ও, সে, দু-একজন আসছে; যাচ্ছে। একরকম মনে

হয়। যদি নিতান্তই কোথাও যেতে হয়, তবে শিলাইদায় না এসে কেন বোলপুরে যাও না? তোমার একলা মনে হয় না কেননা তুমি ঢের বড় বড় বিষয় ভাবতে, আলোচনা করতে, সেগুলকে নিয়ে একরকম বেশ কাটাও। আমরা সামান্য মানুষ আমাদের একটু গল্পগুজব মানুষজন নিয়ে থাকতে এক এক সময় একটু একটু ইচ্ছে করে। আর তুমি যদি এখানে এসে আর নড়তে না চাও তবে তুমি যে যে মহৎ বিষয় নিয়ে থাকো তাই সব আমাদের একটু একটু দাও।"

শিলাইদহের অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধিতে পৌঁছুলেন যে, গ্রামীণতা অনেক দিক থেকে মূল্যবান হলেও, রিক্ত সংকীর্ণ স্থবির গ্রাম্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু: গ্রামীণতা আর গ্রাম্যতা এক নয়। আরো জানলেন যে, সাহেব শিক্ষকের কাছে চার ঘণ্টা করে ইংরেজি পড়লে ভাষাজ্ঞান বাড়ুক আর না বাড়ুক, বিদ্যা সেই হারে বাড়ে না! আরো জানলেন, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ প্রয়োজন, কিন্তু সে সংযোগ সক্রিয় স্বাধীন এবং আনন্দময় হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে জেনেছেন, গ্রামকে পেতে হলে—এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাকে পেতে হলেও—গ্রামের অন্ধকার দূর করতে হবে, তার জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করতে হবে, তাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। যথার্থ শিক্ষার জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ ভাবপরিমণ্ডল, চিন্তাপরিমণ্ডল এবং কর্মপরিমণ্ডল অত্যাবশ্যক, এমন পরিমণ্ডল যেখানে আনন্দ মুক্তি এবং সৃজনশীলতার অবকাশ অবাধ। যেখানে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযোগ ঘনিষ্ঠ। যেখানে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার সুযোগ অবাধ, চিত্তবিনোদনের সুযোগও অপর্যাপ্ত। এ সব সুযোগ থেকে শিলাইদহ গৃহবিদ্যালয় স্বভাবতই বঞ্চিত ছিল। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (ডিসেম্বর, ১৯০১) সঙ্গে এই বোধের প্রত্যক্ষ যোগ আছে এমন মনে করা কষ্টকল্পনা নয়।

এই প্রস্তুতি-পর্বের পরে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে দ্বিতীয় পর্ব বা শান্তিনিকেতন পর্বের সূত্রপাত।

খ. ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিধি

প্রত্যেক দেশের শিক্ষাবিধিকে যথার্থ শিক্ষাবিধি হতে হলে তাকে কয়েকটি মৌল শর্ত পূরণ করতে হয়। তার মধ্যে তিনটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই তিনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য যেটি, তাকে বলতে পারি তত্ত্বগত বা মানবতত্ত্বগত শর্ত। এই শর্ত শিক্ষার চরম লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত। কী শিখব, কেন শিখব, কী হতে চাই যে শিখব; কী হওয়াতে চাই যে শেখাব? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।' ('লক্ষ্য ও শিক্ষা', শিক্ষা, র/১১/৬২৮)। মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়, কোন্ শিক্ষা মানুষকে তার সার্থকতায় পৌঁছে দেয়, শিক্ষাতত্ত্বের এইটেই হল সব থেকে মৌল প্রশ্ন। যে শিক্ষাবিধিতে এই তত্ত্বগত প্রশ্নের সদুত্তর নেই, তা যথার্থ শিক্ষাবিধিই নয়।

অপর দুটি শর্তও এই মৌল তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে তাদের আলাদা করে দেখাই সঙ্গত বলে মনে হয়।

এর একটি হল স্ব-দেশের সঙ্গে, জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার শর্ত। আর

দ্বিতীয়টি হল স্ব-কালের সঙ্গে, ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত থাকার শর্ত। প্রথমটির যোগ জাতীয় অতীতের সঙ্গে, দ্বিতীয়টির যোগ সর্বজনীন ভবিষ্যতের সঙ্গে। অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থাকে একই সঙ্গে দুটি অনমনীয় দাবির মুখোমুখি হতে হয়। তাকে নিজের দেশের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়, জাতীয় জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিলে থাকতে হয়—তা না হলে তার জীবনীশক্তি থাকে না, আত্মতা থাকে না, সত্যতাও থাকে না। অন্যদিকে, সেই সঙ্গে তাকে কালের যুগসত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়, সমগ্র মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়, মানবসভ্যতার অগ্রগতির অভিযানের শরিক হতে হয়—তা না হলে সে নিজের অর্থ হারিয়ে ফেলে, নিজের ভূমিকা হারিয়ে ফেলে, ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাকে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কর্মপ্রয়াসকে বুঝতে হলে তিনটি শর্তের কথাই আমাদের মনে রাখতে হবে। সঠিক লক্ষ্যের শর্ত বা, বলতে পারি, মনুষ্যত্বের শর্ত সর্বপ্রথম। তার পরে একসঙ্গে যুগ্মশর্ত বা যুগ্মদাবি : জাতীয় ঐতিহ্যের দাবি এবং স্ব-কাল ও ভাবীকালের দাবি।

রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের মনের মতো শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন ১৯০১ সালে, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাক্‌কালে, তখন তাঁর সামনে ছিল দুটি বিকল্প আদর্শ বা ছাঁদ—বলতে পারি, দুটি বিকল্প মডেল। এক হল দেশজ পুরানো মডেল, আর দুই হল ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাবিধির মডেল। রবীন্দ্রনাথ এ দুটির কোনোটিকেই গ্রহণ করলেন না, তিনি তাঁর বিদ্যালয়কে গড়ে তুললেন সম্পূর্ণ অভিনব এক তৃতীয় মডেলে।

যে দেশজ ও পুরানো মডেলকে রবীন্দ্রনাথ পরিহার করলেন সেটি কী চরিত্রের? মনে রাখতে হবে, সেটি কিন্তু প্রাচীন ভারতের তপোবনের মডেল নয়, সে হল প্রচলিত সাবেক শিক্ষাবিধির মডেল, অর্থাৎ এক দিকে টোল-চতুষ্পাঠী এবং অন্য দিকে মক্তব-মাদ্রাসার মডেল। এইটেই আমাদের পরিচিত-অতীতের শিক্ষাবিধির মডেল, তপোবন কোন্ সুদূর অতীতে ছিল, কোথায় ছিল, কেমন ছিল তার প্রায় কিছুই আমরা জানি না। কোনো এক সময়ে এই টোল-চতুষ্পাঠী বা মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাবিধি হয়তো দেশোপযোগী এবং কালোপযোগী ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কালে তা যে দেশের জীবনপ্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—না দেশোপযোগী, না কালোপযোগী, এই সত্য রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন যে, তা এখন বন্ধ্যা, তার মুখ ইতিহাসের উল্টো দিকে।

ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার ছিল না, ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশজ সাবেকী ব্যবস্থার ভাঙন ত্বরান্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে সাবেকী ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাবেকী বিদ্যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপের **টোল-চতুষ্পাঠীর** সংখ্যার ক্রমিক হ্রাসের হিসেব থেকে এই ভাঙনের চেহারাটা স্পষ্ট হবে। হিসেবটা ১৮১৮ থেকে ১৮৮৩, এই ৬৫ বছরের। এর ভিত্তি ওয়ার্ড, উইলসন, অ্যাডাম, কাউয়েল ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এঁদের রিপোর্ট। এই সব রিপোর্ট থেকে আমরা

জানতে পারি যে, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ৬৫ বছরের মধ্যে নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা কমে ৩১ থেকে ১৩-তে এবং ছাত্রের সংখ্যা কমে সাড়ে সাত শ' থেকে কিঞ্চিদধিক একশ'-তে এসে দাঁড়িয়েছিল—তাও ভাটপাড়ার টোল ও ছাত্র ধরে। সন্দেহ নেই, বিংশ শতকের মুখে, রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবছেন, ততদিনে এ সংখ্যা আরো অনেক হ্রাস পেয়েছে। টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা তখন আর ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণনীয় নয়। সাবেকী ব্যবস্থায় শিক্ষার বিকিরণ অবহেলিত ছিল না—এই একটি প্রশংসাবাক্য ছাড়া এর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ আর একটিও বলার মতো কথা খুঁজে পান নি।

রবীন্দ্রনাথের সুপরিকল্পিত শিক্ষব্যবস্থার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী হল ইংরেজ-প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রায় এক শ' বছর ধরে যে স্কুল-কলেজীয় শিক্ষা দেশে প্রচলিত আছে, সেই ব্যবস্থা।

এই প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কী? এর বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ একটি বা দুটি নয়, অনেক। এখানে তার প্রধান কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রধান আপত্তি তিনটি, বা তিন গোত্রের। এক, ঔপনিবেশিক শিক্ষার পেছনে কোনো সুচিন্তিত কেন. কোনোরকম শিক্ষাতত্ত্বই নেই। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই, তদনুযায়ী কোনো পরিকল্পনা নেই। বরং বলা যায়, কুপরিকল্পনা আছে—সে হল শিক্ষা দিয়ে মানুষকে কেরানিতে পরিণত করা, ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির ক্রীতদাসে পরিণত করা। ফলে, সৃজনশীলতা, মুক্তি ও আনন্দ, শিক্ষার যা অপরিহার্য ভিত্তি, এ শিক্ষায় তা সম্পূর্ণ অবহেলিত। এক কথায়, এ শিক্ষা শিক্ষাই নয়, এ হল এক ধরনের বিষক্রিয়া।

দুই, এ শিক্ষার দাঁড়াবার কোনো ভূমি নেই। ঐতিহ্যের সঙ্গে, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে—দেশের চিত্তের সঙ্গে এ শিক্ষার কোনো যোগ নেই। অর্থাৎ এ শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে সত্য নয়।

তিন, আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক হলেও, আধুনিকতার বাইরের খোলসটাই এর লক্ষ্য, আধুনিকতার মর্মসত্যের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কালের প্রবাহের সঙ্গে, ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে এই ঔপনিবেশিক কেরানি-তৈরির শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরের কোনো যোগ থাকা সম্ভব নয়।

এই তিনটি তত্ত্বগত আপত্তি ছাড়া আরো কয়েকটি বাস্তব এবং ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের মারাত্মক বিপদের কথা এই শিক্ষাবিধির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন।

এক, শিক্ষার বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, শিক্ষা মাতৃভাষায় না হওয়ার ফলে, একটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষার মাধ্যমে হওয়ার ফলে, সাধারণভাবে এ শিক্ষা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ—অনেকটা খোলসের মতো, জীবিকার ক্ষেত্রে অ আমাদের অঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ জীবনে তার কোনো ক্রিয়া থাকে না। বিজ্ঞানশিক্ষাতেও তাই, বিজ্ঞান আমাদের জীবনে প্রবেশ করে না। ফলে বিজ্ঞানে যাঁরা সুশিক্ষিত বলে গণ্য, তাঁদেরও জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক

থেকে যায়। সোজা কথায়, এ শিক্ষা আমাদের বাইরের চাকচিক্য দিলেও প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিতই রেখে দেয়।

দুই, এ শিক্ষা দেশের মানুষকে তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই ভাগে, বস্তুত দুই স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করে। এতে তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিজেদের শ্রেণীর বাইরে তাদের দৃষ্টি যায় না। এতে দেশের মধ্যে শাসক ও শাসিত এই দুই জাতির জন্ম হয়।

তিন, এ শিক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে জনশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার বিকিরণের কোনো পথ নেই। এর মাধ্যম ইংরেজি বলে, অল্প-সংখ্যক শহুরে সঙ্গতিপন্ন লোকই এই শিক্ষা পেতে পারে।

শিক্ষার বিস্তার বা বিকিরণের ব্যাপারে—শিক্ষাকে খানিকটা জনমুখী করে তোলার ব্যাপারে—ইংরেজ-পূর্ব ভারতে সাবেকী ধারার যে ব্যবস্থা চালু ছিল, ঔপনিবেশিক শিক্ষার জনসাধারণ-বিমুখ ব্যবস্থার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাছে তা অনেক প্রশংসনীয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় তার যে কী গতি হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের অজানা নয়।

গ. প্রথম বা প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্ব [১৯০১ সালের পূর্বে]

নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ সাবেকী টোল-জাতীয় শিক্ষাবিধি এবং ইংরেজ-প্রবর্তিত স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাবিধি, এ দুইয়েরই ঘোর বিরোধী। তত্ত্বগত কারণ এবং ব্যবহারিক কারণ, দু দিক থেকেই এ বিরোধ আপোসহীন। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, আমাদের জাতীয় জীবনে সংকটের সব থেকে গোড়ার কারণ হল অশিক্ষা এবং তজ্জনিত অবুদ্ধি, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন শিক্ষাই আমাদের দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধানের প্রথম এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, সেই হেতু ব্যাপারটাকে রবীন্দ্রনাথ কেবল চিন্তার স্তরে রেখেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। অথচ কর্মে প্রবৃত্ত হবার সুযোগ তখনো বহুদূরবর্তী। শিক্ষা নিয়ে তিনি যে আদৌ কোনোদিন কর্মক্ষেত্রে নামতে পারবেন, নিজস্ব শিক্ষাতত্ত্ব নিজস্ব শিক্ষাবিধি নিয়ে, নিজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করে বৃহৎ একটি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে তিনি যে অগ্রসর হতে পারবেন, এ সম্ভাবনা সেদিন মোটেই স্পষ্ট ছিল না। এই পর্বের শেষের দিকে শিলাইদহ কুঠিতে যে ঘরোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল, সেই অতি ক্ষুদ্র গৃহ-বিদ্যালয়টিকে সাধারণ অর্থে মোটেই বিদ্যালয় বলা চলে না।

বৃহৎ কোনো কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত নয় বলেই এ পর্বে শিক্ষাবিষয়ক রচনার সংখ্যা অত্যন্ত কম।

এই পর্বের সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, গোটা পর্বের কেন্দ্রগত প্রবন্ধ হল 'শিক্ষার হেরফের' (পৌষ ১২৯৯, ইং ১৮৯২, রাজসাহী এ্যাসোসিয়েশনে পঠিত ; পরে ঈষৎ সংক্ষেপিতভাবে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত, পৌষ ১২৯৯)। সময়টা হল শিলাইদহ পর্বের গোড়ার দিক, 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র কবিতা রচনার কাল।

প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্বকে যদি রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতির কাল বলে গণ্য করি,

তাহলে এই প্রস্তুতির পরিমাপের—এর গভীরতা ও ব্যাপ্তির পরিচয় পাওয়া যাবে এ পর্বের সব থেকে উল্লেখযোগ্য রচনা 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটিতে (১৮৯২)। প্রবন্ধটির বক্তব্য দুটি। দুটিই ইংরেজি শিক্ষা বা ঔপনিবেশিক শিক্ষা নিয়ে। সূত্রাকারে বললে—এক, জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংগতি-রক্ষা; আর দুই, শিক্ষায় মাতৃভাষার অপরিহার্যতা।

ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাকে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানসিকশক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষা'। প্রবন্ধের মূল কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কথা, তাই সংক্ষেপে এখানে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।—

১। ইংরেজি আমাদের কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। প্রচলিত শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার চর্চায় ভাবের চর্চা হয় না, ভাবের সঙ্গে ভাষার মিল হয় না।

২। এই ব্যবস্থায় আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় কেটে যায়।

৩। এই শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ হয় না। এ শিক্ষা চিরকাল পোষাকী অর্থাৎ বাইরের ব্যাপার হয়ে থাকে।

৪। এ শিক্ষা কেরানি-তৈরির শিক্ষা, মানুষ-তৈরির শিক্ষা নয়।

৫। এ শিক্ষা-বিধিতে আনন্দের স্থান নেই। এতে গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বললাভ ঘটে না।

৬। এ শিক্ষায় কল্পনাবৃত্তির স্ফূর্তি হয় না, শুধু স্মরণশক্তিরই চর্চা হয়।

তখনকার কালের যে সব মনীষী রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরো উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানিয়েছিলেন, 'প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।'

ঘ দ্বিতীয় বা শান্তিনিকেতন প্রাক্-বিশ্বভারতী পর্ব ১৯০১ থেকে ১৯১৮ সাল]

এই দ্বিতীয় পর্বটি হল শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের পর্ব, বিশ্বভারতী তখন কল্পনাতেও নেই। যে শিক্ষাবিধি সামনে রেখে আশ্রম বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হল, তাকে বলতে পারি জাতীয় শিক্ষাবিধি বা ঐতিহ্য-অনুসারী শিক্ষাবিধি।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ডিসেম্বর ১৯০১ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথের মনের সামনে ছিল ভারতের তপোবনের আদর্শ। সে তপোবন কতোটা আদর্শনিষ্ঠ অনুমানের পুনর্গঠন, কতোটা-বা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ কল্পনা, তা বলা কঠিন। তবে সেই তপোবন-আদর্শের ভাবরূপের ছবি পাওয়া যাবে নৈবেদ্যের (১৯০১) কবিতাগুচ্ছের মধ্যে। আইডিয়া-প্রধান এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল এক বছর আগে শিলাইদহতে। কবিতাগুলির প্রায় সবই ঔপনিষদিক আদর্শের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ। নৈবেদ্যের কবিতার 'হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন'—এই আত্মিক ধন অর্জনের কামনায় ভারতে সেই শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

নৈবেদ্য প্রকাশিত হবার পর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় Twentieth Century পত্রিকায় নৈবেদ্যের কবিতাগুলির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ব্রহ্মবান্ধব তখন প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ, তপোবনের স্বপ্নে বিভোর হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট। তিনি এসে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে যোগ দিলেন। "ব্রহ্মবান্ধবের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপ গ্রহণ করিল। শিষ্যরা গুরুগৃহে যেন বাস করিতেছে ইহাই হইল আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ হইলেন, 'গুরুদেব'। এই নাম উপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্তিত। উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের জুতা-ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক ; তবে আহারস্থানে বর্ণভেদ মানাই আবশ্যিক। এই মধ্যযুগীয় ব্যাপার উপাধ্যায়ের তৎকালীন মতবাদের অনুরূপ বলিয়াই এখানে প্রবর্তিত হইয়াছিল।"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী,
২য় খণ্ড, পৃ ৫১, ৪র্থ সংস্করণ)

মধ্যযুগীয় ব্যাপার যে কেবল উপাধ্যায়ের মতবাদেরই **অনুরূপ** ছিল তা নয়, রবীন্দ্রনাথের নিজের মতামতও তখন কম রক্ষণশীল ছিল না। সংহিতাসম্মত হিন্দু আচার-আচরণকে তখন তিনি তাঁর কল্পিত তপোবনের, অতএব আশ্রম-পরিবেশের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছিলেন। একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি।—

শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নিয়ম হয়েছিল যে ছাত্ররা অধ্যাপকদের পদধূলি নিয়ে প্রণাম করবে। সমস্যা উঠল, ছাত্র যদি ব্রাহ্মণ হয় আর অধ্যাপক যদি অব্রাহ্মণ হয়, তাহলে কী করা হবে। অধ্যাপক কুঞ্জলাল ঘোষ একদিকে ব্রাহ্ম অন্যদিকে কায়স্থ। তাঁর ক্ষেত্রে কী করা হবে ? সমস্যাটি রবীন্দ্রনাথের গোচরে আনা হলে অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৯, বাং ১৯০২) রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

"প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যে রূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শ পূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে, এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে না।"

(স্মৃতি, সং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৪-১৫)

* * *

এই পর্বের একেবারে গোড়ার দিকে শিক্ষাবিষয়ক রচনার সংখ্যা কম। রচনার পালা শুরু হয়েছে চার বছর পরে ১৯০৫ সালে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামক ভাষণের (বঙ্গদর্শন ১৯০৫, বৈশাখ ১৩১২) সময় থেকে। তখন খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে অনেকগুলি রচনা পাই। অকস্মাৎ শিক্ষাবিষয়ে প্রবন্ধ ও ভাষণের এই রকম বেগ-

বৃদ্ধির কারণ সেদিনকার ইতিহাসের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে। শুধু এইটুকু স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে যে সেটা হল বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের কাল। অল্পদিন আগে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' ভাষণটি পঠিত (১৯০৪) হয়েছে। এ হল 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের প্রকাশকাল। দেশের সর্বত্র তখন বিদেশীবর্জন ও স্বদেশী-বরণের সংকল্প। শিক্ষার ক্ষেত্রেও।

ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কার্যত বাতিল করে দিয়ে তার স্থানে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলন, এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬), এই হল রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের শিক্ষা-চিন্তার পটভূমি। 'শিক্ষাসমস্যা', 'শিক্ষাসংস্কার', 'জাতীয় বিদ্যালয়', 'আবরণ', এই প্রবন্ধগুলি (চারটিই ১৯০৬ সালে রচিত) জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ও বাদানুবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

যে ধ্যান-ধারণাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এই সময়ের প্রবন্ধগুলিতে সেই সকল ধ্যান-ধারণাই রূপ পেয়েছে। এর সব থেকে পরিচ্ছন্ন এবং বিস্তারিত প্রকাশ ঘটেছে 'তপোবন' ভাষণটিতে (১৩১৬ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর ১৯০৯)। ভাষণটি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৬ পৌষের প্রবাসীতে।

'তপোবন' প্রবন্ধটি তত্ত্বগত দিক থেকে এই পর্বের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। পর্বের শেষের দিকে রচিত 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিও ১৩২২ পৌষ, ১৯১৫) নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার সঙ্গে পর্ব-বিশেষের কোনো নাড়ীর সম্পর্ক নেই। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে 'তপোবন' এই পর্বের কেন্দ্রস্থ ও প্রতিনিধি স্থানীয় প্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশিষ্টতার উপর জোর দিয়েছেন। বলেছেন, জাতীয় শিক্ষা বলতে পাশ্চাত্য দেশ যা বুঝবে আমরা তা বুঝব না। বলেছেন, এক-একটি বিশেষ দেশের মানুষের শক্তি সেই দেশের বিশিষ্ট পরিবেশ এবং বাস্তব অবস্থার কারণে এক-একটি বিশেষ পথ ধরে নিজের নিজের সত্যকে খুঁজে পায়। এই কারণে সমুদ্রচারী মানুষের পথ আর মরুচারী মানুষের পথ পৃথক, তাদের সত্যও পৃথক। ভারতবর্ষের বিশেষ পথটি তপোবনের পথ, তার বিশেষ সত্যটি তপোবনের সত্য। পাশ্চাত্য দেশের পথ স্বতন্ত্র, তার সত্য স্বতন্ত্র, সেই কারণে তার শিক্ষার আদর্শও স্বতন্ত্র। ভারতের শিক্ষার আদর্শকে তার নিজের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। "তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী ?··· ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।"

(রা।১১।৬০৫)

রবীন্দ্রনাথের তপোবন বিষয়ক ধারণার মধ্যে যেটুকু নির্যাসিত তত্ত্ব, তা এসেছে উপনিষদ্ থেকে, আর যা সেই তত্ত্বর শরীরী বিগ্রহ, তার রূপ ও চরিত্র, সে সবই এসেছে সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি থেকে, প্রধানত কালিদাস থেকে। এ তপোবন কতটা ঐতিহাসিক সত্য, পরে এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ নিজেই তুলেছিলেন। ঐতিহাসিক সত্য

হোক আর না-ই হোক, এই তপোবন-কল্পনা রবীন্দ্রনাথের তখনকার ভারত-ভাবনার সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে। এই ভারত-ভাবনা যে বিশেষ করে হিন্দু মনের ভারত-ভাবনা, অহিন্দু অনেক ভারতবাসীই যে এই ভাবনার শরিক হতে পারেন না, এই ভাবনা যে যথেষ্ট উদার নয়, কঠিন ভাব-সংকট পার হয়ে কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই উপলব্ধির সেই ঘাটে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। মনে রাখতে হবে, 'গোরা' উপন্যাসে গোরার যে উত্তরণ, তা রবীন্দ্রনাথের নিজের উত্তরণ বলেই গোরার পক্ষে সে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল।

চিন্তার অন্য ক্ষেত্রে যে উত্তরণ ঘটে গিয়েছে, শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে তা সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। উঠলে 'গোরা' উপন্যাসের প্রায় সমকালে—কার্যত একটু পরে রচিত 'তপোবন' প্রবন্ধে সে উত্তরণের ছাপ পড়ত। আরো দু'বছর পরে রচিত 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধেও (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৮ মাঘ, ১৯১২) একই চিন্তার অনুবৃত্তি দেখতে পাই। সেখানে বলেছেন, "এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল ; সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্রে মিলিত হইয়াছিল…তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে।" (র।১১।৬১৮)

কিন্তু কয়েকমাস পরের 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধেই (প্রবাসী, ১৩১৯ আশ্বিন, ১৯১২) রবীন্দ্রনাথের মনের হাওয়াবদলের আভাস পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের জোরটা তপোবন বা প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর নয়, জোরটা নতুন কালের উপযোগী শিক্ষার উপর। এখানে তিনি লিখেছেন, "যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালার বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা।…আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ।" (র।১১।৬২৩-৪)

অল্প পরে রচিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে (১৩১৯ অগ্রহায়ণ, ১৯১২) স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের কথা এসেছে, কিন্তু হাওয়াবদলের আভাস—নির্মোহ দৃষ্টির সাক্ষাৎ এখানেও মিলবে। যেমন, "এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্ব-সংসারের সকল সমাজের সেরা ; এত বড়ো একটা অদ্ভুত অত্যুক্তি যাহা মানুষের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে তাহাকে আড়ম্বর সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়ের-জোরি কৈফিয়ত…। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই।" (র।১১।৬২৯)

এই পর্বের প্রথম দিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ যেমন 'তপোবন', শেষের দিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ তেমনি 'শিক্ষার বাহন' (সবুজপত্র, ১৩২২ পৌষ ; ডিসেম্বর ১৯১৫-তে রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত)।

'শিক্ষার বাহন' বলাকা-পর্বের রচনা। হাওয়াবদল এই প্রবন্ধে স্পষ্টতর। কালের

দিক থেকে প্রবন্ধটিকে দ্বিতীয় পর্বে স্থান দেওয়া হলেও, ভাবের দিক থেকে এটি তৃতীয় পর্বে স্থান পেতে পারত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকে (১৯১৮) আমরা একটি ছেদবিন্দু হিসেবে ধরেছি, তৃতীয় পর্বের সেইখান থেকেই শুরু। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের একটা বুড়ো পালাবদল—চিন্তায় অনুভবে জীবনদর্শনে—গীতাঞ্জলি-পর্বের শেষেই বা বলাকা-পর্বের শুরুতেই ঘটে গিয়েছে।

এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান, জনশিক্ষা এবং প্রসঙ্গক্রমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাতত্ত্ব। কয়েকটি সূত্র উদ্ধার করে দিলে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনের গতি কোন্ দিকে তা সহজেই বোঝা যাবে।—

১। "আমাদের বিলাতি **বিদ্যাটা,** আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না।...আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। একথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই।" (র।১১।৬৩৭)

২। "এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে।" (তদেব)

৩। "শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার **মানে,** শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর-কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সে দিকে খেয়ালই নাই।" (তদেব, ৬৪০)

৪। "বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি।" (তদেব, ৬৪১

৫। "আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।" (তদেব)

৬. তৃতীয় বা বিশ্বভারতী পর্ব [১৯১৮ সালের পরে]

এই তৃতীয় পর্বের সূচনা শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। বলা দরকার, ১৯১৮ সালের ৮ পৌষ বিশ্বভারতীর পত্তন হয় এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ শুরু হয় জুলাই, ১৯১৯ (আষাঢ়, ১৩২৬) থেকে। স্কুল অংশ পূর্ববিভাগ এবং এই নতুন অংশ উত্তর-বিভাগ নামে পরিচিত হয়। ডিসেম্বর ১৯২১ (৮ পৌষ ১৩২৮) সালে বিশ্বভারতীর আইনসম্মত উদ্বোধন হয় এবং বিশ্বভারতীর কন্‌স্টিটিউশন গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অর্থাৎ শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের পর্বের কেন্দ্রগত প্রেরণা ছিল জাতীয় শিক্ষা, ভারতের জন্য খাঁটি ভারতীয় শিক্ষা। এর ভিত্তিস্থানীয় প্রত্যয় হল এই যে প্রত্যেক জাতি একান্তভাবে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, সুতরাং তার শিক্ষাবিধিকেও স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট হতে হবে। তৃতীয় অর্থাৎ বিশ্বভারতী-পর্বের কেন্দ্রগত প্রেরণা হল বিদ্যার সার্বভৌমত্ব, শিক্ষার সর্বজনীনতা, শিক্ষায় আন্তর্জাতিকতা। এর তত্ত্বগত ভিত্তি হল এই কথা যে, মানুষে মানুষে ভেদটা সাময়িক ও আপাতিক, মিলটাই আসল, যাকে বলা যেতে পারে মানবসভ্যতার মৌল ঐক্যের প্রত্যয়।

শিক্ষাকে যখন আন্তর্জাতিক বলা হচ্ছে, তখন সে-কথার অর্থ মোটেই এ নয় যে, শিক্ষা জাতীয় হবে না। রবীন্দ্রনাথের কাছে তার অর্থ এই যে, শিক্ষা জাতীয় হয়েই আন্তর্জাতিক হবে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মনে জাতীয় আর আন্তর্জাতিতে কোনো বিরোধ নেই। তিনি বিরোধী—উত্তরোত্তর প্রবলভাবে বিরোধী হয়ে উঠেছেন—সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের, সেই জাতীয়তাবাদ যার ভিত্তি জাতিবৈর ও আত্মস্বার্থ। বিরোধী হয়ে উঠেছেন সেই জাতীয়তাবাদের পাশ্চাত্য দেশে যাকে বলে ন্যাশানালিজ্‌ম।

স্মরণ রাখতে হবে, তৃতীয় পর্বের সূচনার কাছাকাছি সময়ে—বিশ্বভারতী পত্তনের (ডিসেম্বর, ১৯১৮) প্রাক্‌কালে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্যায় চলছে (১১ ডিসেম্বর, ১৯১৮ যুদ্ধবিরতি, তার দেড় মাস পরেই বিশ্বভারতীর পত্তন)। মহাযুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যে দিয়ে নেশান ব্যাপারটির স্বরূপ তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তখন তিনি জাপানে এবং আমেরিকায় সংকীর্ণ ন্যাশানালিজ্‌মের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিয়ে দেশে ফিরেছেন এবং অল্প দিন হল তাঁর 'ন্যাশানালিজ্‌ম' বইটি প্রকাশিত হয়েছে (১৯১৭)।

কিন্তু জাতীয় কথাটার একটা গভীর অর্থও আছে। সেই গভীর অর্থে তাকে জাতীয়চেতনা বলে ধরতে পারি; যে চেতনা আমাদের আত্মতার উৎস, আমাদের আত্মতার ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ তাকে কখনোই অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করেন নি। তাঁর কাছে যথার্থ জাতীয় শিক্ষা আন্তর্জাতিক শিক্ষার খণ্ডন নয়, এরা পরস্পরের পরিপূরক, আদর্শ শিক্ষা এই দুয়ের সমন্বয়।

বিশ্বভারতী পত্তনের কালটা উত্তেজনাপূর্ণ। অল্প পরেই জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (এপ্রিল ১৯১৯)। মে ১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড পরিত্যাগ। সামনে জাতীয় আন্দোলনের প্রস্তুতি। এই প্রখর জাতীয়তাবাদী ভাবাবহের মধ্যেই বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হচ্ছে। এই সময় খুব অল্পকালের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়: 'অসন্তোষের কারণ' (১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৯১৯ , 'বিদ্যার যাচাই' (১৩২৬ আষাঢ়, ১৯১৯) এবং 'বিদ্যাসমবায়' (১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক, ১৯১৯)। প্রথম দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য হল এই যে, এ দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা জন্মায় না। তৃতীয় প্রবন্ধ অর্থাৎ 'বিদ্যাসমবায়ে'র লক্ষ্য বিশ্বভারতীর আদর্শ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়।

অধ্যাত্ম-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার মিলন, জাতীয় শিক্ষা ও সর্বজাতিক শিক্ষার সমন্বয়, এই হল বিশ্বভারতীর লক্ষ্য। এখানে বিশ্ব একনীড় হবে, বিশ্বভারতী উদার মানবিকতার কেন্দ্র হবে, এই হল প্রতিষ্ঠাতার প্রত্যাশা।

বিশ্বভারতী-আদর্শের স্পষ্টতম প্রকাশ ঘটেছে 'শিক্ষার মিলন' (সবুজ পত্র ১৩২৮ ভাদ্র, ১৯২১) প্রবন্ধটিতে। সেই দিক থেকে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটিকে তৃতীয় পর্বের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং কেন্দ্রস্থ প্রবন্ধ বলা যায়। 'বিদ্যাসমবায়' তারই পূর্বগামী উপক্রমণিকা। 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধ থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

১। "সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না।" (রা।১১।৬৬৩)

২। "…আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি-বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।" (তদেব)

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে হলে তাকে দেখতে হবে সমকালের অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে। ১৯২০ সালের মে থেকে ১৯২১ সালের জুলাই, এই দীর্ঘ ১৪ মাস কাল রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ এবং আমেরিকায় সফরে আছেন, দেশে তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা তীব্র হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিকালে গান্ধিজীর শান্তিনিকেতন আগমন (সেপ্টেম্বর ১৯২০) ঘটে গিয়েছে। ডিসেম্বর ১৯২০-তে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনে সেই আন্দোলনের তরঙ্গবেগ এসে লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সমস্ত রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটল না। এই প্রসঙ্গে বিদেশ থেকে শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়কে তিনি যে চিঠি (৮ মার্চ ১৯২১) লেখেন, তার কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"…Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত ; সেই ভূত ঝাড়বার দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তার আয়োজন করছি। দেবতার নাম করলে তবেই অপদেবতা ভাগে। আমাদের শান্তিনিকেতনের দরজায় সেই দেবতার নাম লেখা ; আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথছি। দেশের নাম করে এখানে যদি কোনো বাধা দেবার বেড়া তুলি তাহলে আমাদের দেবতার প্রবেশপথে বাধা দেওয়া হবে।…সেদিন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেই দিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তি বলে মনে করছি—আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি।… এর পরে কোন দিন কথা উঠবে এণ্ড্রুজ পিয়ার্সনকে ত্যাগ করতে হবে, কেননা তারা ইংরেজ।…"(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, পৃ. ১৬৮-৯)।

ইউরোপ-আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে (জুলাই ১৯২১) সঙ্গে-সঙ্গেই নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন যে, গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও অসহযোগের আহ্বান এসেছে—ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা গোলামীর শিক্ষা, তা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা তখন সেই আহ্বানে সাড়া দিতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তখন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলার দরকার। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি সেই স্পষ্ট বক্তব্য।

ভারতবাসীর শিক্ষায় ভারতীয়ত্ব থাকবে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ একবারও অস্বীকার করেন না। কিন্তু সেইটেই সব নয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, শিক্ষার একটি সর্বমানবিক দিকও আছে, সকল শিক্ষাতেই সেই সর্বমানবিক সত্যকে থাকতে হবে,

ভারতবাসীর শিক্ষাতেও। বিজ্ঞান তেমনি একটি সর্বমানবিক সত্য, বিজ্ঞানের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নেই, তার জাতিবর্ণ নেই। যেহেতু পাশ্চাত্যদেশেই এখন তার চর্চা, তাই আপাতদৃষ্টিতে তা পাশ্চাত্য শিক্ষা। বিশেষ করে সেই হেতুই ভারতবাসীর শিক্ষাব্যবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষাকে স্বাঙ্গীকৃত করে নিতে হবে। বিচ্ছেদ নয়, জাতিতে জাতিতে মিলনই আগামী দিনের সত্য। সেই সত্য প্রথম প্রতিষ্ঠা পাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই হল 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের মূল কথা।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের মূল সূত্রগুলিকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি :

১। "…বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে।" এই নিয়মকে নিজে হাতে গ্রহণ করার শিক্ষাই বিজ্ঞান। ভারতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নেই, তাই সে আজ বন্ধ, দুর্বল, রিক্ত। বিজ্ঞান শিক্ষার জোরেই পাশ্চাত্য দেশ আজ শক্তিশালী।

২। "…পশ্চিমের লোক যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য।"

৩। শিক্ষায় প্রথম ধাপ বিজ্ঞানশিক্ষা। অধ্যাত্মশিক্ষা তার পরের ধাপ। প্রথমটি না হলে কেবলই রিক্ততা, কেবলই দৈন্য। "…আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে।"

৪। "এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি।" উল্টো দিকে এক-ঝোঁকা বিজ্ঞানচর্চায় পাশ্চাত্য দেশ মনুষ্যত্বের সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৫। যথার্থ শিক্ষায় এ দুই-কে মিলিয়ে নিতে হবে। "এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত ; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।"

৬। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ ভুগোলের বেড়া ভেঙে গিয়েছে, জাতিরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। "জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত।" যাঁরা নবযুগের সাধক তাঁদের সাধনা আজ ঐক্যের সাধনা।

৭। ন্যাশানালিজ্‌ম এই ঐক্যের বাধা।

৮। "মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা করে…। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে ; কিন্তু ন্যাশানালিজ্‌ম সত্য নয়।" এ হল রিপু।

৯। "স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।"

১০। "এই জন্যেই আমাদের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে।"

(সমস্ত উদ্ধৃতি : র৷১১৷৬৬৪-৭৮)

অসহযোগ আন্দোলনের সেই জাতীয়তাবাদী উত্তেজনার সময় রবীন্দ্রনাথের এই মিলনতত্ত্ব প্রচুর বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের সঙ্গে মিলনের

কথা বলেছেন, গান্ধিজীর বিরোধিতা করেছেন এবং ন্যাশানালিজমের নিন্দা করেছেন, সুতরাং তিনি যে বহু আক্রমণের লক্ষ্য হবেন এতে আর আশ্চর্য কী? মনে রাখতে হবে, দেশভাবনার যে স্তরটিকে রবীন্দ্রনাথ দশ-বারো বছর আগে পার হয়ে এসেছেন, তাঁর দেশবাসীর সকলেরই মন তখন সেই স্তরে—অর্থাৎ 'গোরা' রচনার পূর্ববর্তী স্তরে আবদ্ধ।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র 'শিক্ষার বিরোধ' নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করেন (১৩২৮ সালে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে পঠিত), সেটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের অনেক বক্তব্যের মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—

১। এদেশের ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা বিজিত জাতির জন্য বিজয়ী জাতি কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কোনো শিক্ষাই সার্থক হতে পারে না, বিজ্ঞানশিক্ষাও নয়। যাতে ইংরেজের বিন্দুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা এমন কোনো বিদ্যাই ইংরেজ আমাদের দেবে না। ইংরেজ যা দিচ্ছে, তাতে আমাদের সর্ববিষয়ে নিজেদের প্রতি অবজ্ঞা আর ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাই বেড়ে যাচ্ছে।

২। পশ্চিমের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতা বণিকতন্ত্রের সভ্যতা। তার শিক্ষাদর্শও তাই। তা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না।

৩। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে নেব বিজ্ঞান আর পশ্চিম আমাদের কাছ থেকে নেবে অধ্যাত্মবিদ্যা, ত্যাগের মন্ত্র। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে, ওদের বিজ্ঞান—যথার্থ বিজ্ঞান ওরা আমাদের দেবে না, আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যা ও ত্যাগের মন্ত্রও ওরা নেবে না। ওদের মন্ত্র ধনলাভের মন্ত্র, তার সঙ্গে আমাদের ত্যাগের মন্ত্রের সঙ্গতি নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আসল বিরোধ এইখানে।

(দ্রষ্টব্য, শিক্ষার বিরোধ, স্বদেশ ও সাহিত্য, শরৎ রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫১৯-২৭)।

শরৎচন্দ্রের বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিহীন এমন বলা যায় না। শরৎচন্দ্রের বক্তব্য আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রকৃতি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মৌল স্বভাব, এই হল শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের ভিত্তি। একে এক-কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমাদের মনে হয়, নিজের নিজের প্রসঙ্গক্ষেত্রের মধ্যে দুজনের বক্তব্যেই সত্য আছে। শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী, তাঁর বক্তব্য কাছের-দিনের পক্ষে সত্য। রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী এবং দ্রষ্টা, তাঁর বক্তব্য দূরের-দিনের পক্ষে—ভাবীকালের পক্ষে সত্য।

শুধু শরৎচন্দ্র কেন, আমাদের দেশের অনেক বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের মতভেদ বার বার ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে গান্ধিজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতান্তরের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।—

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের অল্প পরেই শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের প্রতিষ্ঠা (ফেব্রুয়ারি ১৯২২) হয়। এর অল্পকাল পরেই শিক্ষাব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি কাজে হাত দিলেন, যার গুরুত্ব তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেকখানি। কাজটি হল

১৯২৪ সালে শ্রীনিকেতনে একটি গ্রামীণ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রথম প্রতিষ্ঠা শান্তিনিকেতনে, অল্প পরেই বিদ্যালয়টি শ্রীনিকেতনে—অর্থাৎ যথাস্থানে স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয়টিই পরে 'শিক্ষাসত্র' নামে পরিচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মন এই সময় বা এর কিছুকাল পূর্ব থেকে বিশেষভাবে পল্লী-অভিমুখী ও জনসাধারণ-অভিমুখী হয়েছে। শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠনবিভাগের প্রতিষ্ঠা তাঁর এই পল্লীভাবনার সংগেই যুক্ত। শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠাও তাই। স্মরণ করতে পারি যে, দু বছর আগে 'মুক্তধারা' (১৯২২) প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রকাশিত হয়েছে শ্রীনিকেতনের সেই বিখ্যাত উদ্বোধনী-সংগীত, 'ফিরে চল্ মাটির টানে'। আরো স্মরণ করতে পারি যে এইটে হল 'রক্তকরবী' রচনার কাল, 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের কবিতারচনার কাল। সবের সংগেই শ্রীনিকেতন ও শিক্ষাসত্রের একটা গভীর ভাবগত আত্মীয়তা আছে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তেইশ বছর পরে শ্রীনিকেতনে এই পল্লীবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। কেউ কেউ একে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় শিক্ষা-এক্স্পেরিমেণ্ট। রবীন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষা-এক্স্পেরিমেণ্ট শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে সন্তোষজনক মনে হয় নি বলে তেইশ বছর পরে তিনি এই দ্বিতীয় শিক্ষা-এক্স্পেরিমেণ্টটিতে হাত দেন। শ্রীনিকেতনের পল্লী-বিদ্যালয় যেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সংশোধন বা পরিপূরণ।

কথাটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেকটা এই রকমই বলেছেন। তিনি অনুভব করেছেন যে, শিক্ষার যেটা নিম্নতর লক্ষ্য, অর্থাৎ চাকুরি বা জীবিকা এবং তদুদ্দেশ্যে পরীক্ষা-পাশ ও ডিগ্রি লাভ, একটু একটু করে ক্রমেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এও তিনি অনুভব করেছেন যে, ভদ্রসম্প্রদায়ের পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা ডিগ্রিমুখী হবেই, পরীক্ষামুখী হবেই। যেখানে ছাত্রছাত্রী তথাকথিত ভদ্রপরিবারের সেখানে এই ডিগ্রিমুখিতাকে ঠেকানো যাবে না। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে এর সংগে খানিকটা রফা করতেই হবে। এই রফা তাঁর মেনে নিতে হয়েছে। সেই কারণে নতুন পরিবেশে দরিদ্র পল্লীবাসী ছাত্রদের নিয়ে এই তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াস।

শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠার ছ' বছর পরে রাশিয়াভ্রমণে গিয়ে জনশিক্ষায় রাশিয়ার **অসামান্য** সাফল্য দেখে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছিলেন। তখন এই চিন্তাই রবীন্দ্রনাথের মনে খুব বড়ো করে দেখা দিয়েছিল। মস্কোতে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সংগে আলাপে এ কথা তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০)। কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক্।—

"...অপেক্ষাকৃত ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকানির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রি নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।...তারা চায় পড়া মুখস্থ করে কোনো রকমে পাশ করে বেরিয়ে যেতে। আমাকে এ ব্যাপার কিছুটা মেনে নিতে হয়েছে, তা না হলে আমার ইস্কুলে একটি ছাত্রও থাকত না। এর একটি কারণ হল, আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, তাই স্বভাবতই ছেলেরা

বড়ো হয়ে জীবিকা অর্জন করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে চাইবে। তাদের পরীক্ষা পাশের সুযোগ দিতেই হবে। সেই কারণেই আমি আরেকটি ইস্কুল খুলি। সেটি গ্রামের, যাদের সরকারী বা সওদাগরী আপিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই তাঁদের জন্য। এই অপর ইস্কুলটিতে [শিক্ষাসত্রে] পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। অনতিকাল পরেই এই গ্রামের ইস্কুলটিই সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে, অন্যটি তখন পাবে অবহেলা।"

('সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, নথিপত্রের সংকলন,'—
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, পৃ. ৪১)

রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন তার পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। উদ্ধৃতির শেষের বাক্যটিতে 'অনতিকাল পরেই' যা ঘটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, আজো তা ঘটে নি।

আগেই বলেছি, সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাবিস্তার রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও অভিভূত করে। ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের এক সম্বর্ধনা সভায় (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) তিনি বলেন—

"আমাদের দারিদ্র্য, মহামারী, সাম্প্রদায়িক বিরোধ আর যন্ত্রশিল্পে আমাদের পশ্চাৎপরতা, অর্থাৎ যা কিছু আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, সে সবই শুধু শিক্ষার অভাবের ফল।…আপনারা শিক্ষার বিরাট সমস্যাকে কী ভাবে দূর করেছেন তা দেখার আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি।…আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার এই প্রাচীন ভূমির সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন, যুগ যুগ ধরে শৃংখলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তবরূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

(তদেব, পৃ. ৬৮-৯)

ভক্সের সভাপতি পেত্রভের সঙ্গে এক আলোচনায় (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"আমার জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য হল—শিক্ষার আলোক বিস্তার।…আমি বিশ্বাস করি, সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটলে, জনগণের মনে চেতনার বিকাশ ঘটলে, আজকের অনেক দুঃখকষ্টই আপনা থেকে দূর হবে। ··শিক্ষা তাকে নতুন শক্তি দেবে। ·· আমাদের চাষী সাধারণকে অজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া—এই হল আমার মূল লক্ষ্য।"

(তদেব, পৃঃ ২৮)

এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন—

"আমার জীবনের মূল লক্ষ্য হল—প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। শুধু মনীষা নয়, ব্যক্তিত্বের সর্বতোমুখী বিকাশ, মানুষের সক্রিয়তার বিকাশ।" (তদেব)

'রাশিয়ার চিঠি'র (১৯৩১) পত্রগুলির মধ্যেও এই একই সুর, একই কথা। সব কথার মূল কথা হল শিক্ষা এবং সে শিক্ষা সব সময়ই জনশিক্ষা।

রাশিয়া থেকে ফেরার পর যে দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, একটি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (ভাষণ, ডিসেম্বর ১৯৩২, পুস্তিকা ১৯৩৩) এবং অন্যটি

'শিক্ষার বিকিরণ' (ভাষণ ও পুস্তিকা ১৯৩৩)। দুটিতেই রাশিয়াভ্রমণের অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়েছে। দুইটিরই মূল বক্তব্য শিক্ষাবিস্তার—জনশিক্ষা। দুটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার—যাকে তিনি বলেছেন 'ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা'—সেই কৃত্রিম ও যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দুটিরই অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হল শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান, শিক্ষাবিস্তারে মাতৃভাষার অপরিহার্যতা।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশের নালন্দা তক্ষশিলা প্রমুখ প্রাচীন কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে দেশের চিত্তের যোগ ছিল। আমাদের বর্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই যোগ নেই। তাই তার বিদ্যা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় না। এর প্রধান বাধা ভাষা – ইংরেজি ভাষা। বলেছেন, "যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে।" (র। ১১। ৬৮০)

'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে শিক্ষার সংগে দেশের বিচ্ছেদের কথাটাই বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।—

"এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। **কারখানার** গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

"শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ।...দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।" (র।১১।৬৯৩-১)

'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি আকাঙ্ক্ষার কথা, কয়েকটি আশু-করণীয় কাজের কথা বলেছেন। তাদের এই ভাবে সূত্রাকারে সাজিয়ে নিতে পারি :—

১। জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি—ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা যাকে নষ্ট করে দিয়েছে—সেই পথগুলির পুনরুদ্ধার করা। লক্ষ্য হবে, শিক্ষার স্বতঃসঞ্চার যেন সমাজের সর্বত্র ঘটতে পারে, যেন তার সেচন চলে সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে।

২। এর জন্য প্রয়োজন মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন করা।

৩। আরো প্রয়োজন বাংলাসাহিত্যকে সর্বাংগীণরূপে শিক্ষার আধার করে তোলা।

এর বছর দুয়েক পরে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে (বিচিত্রা ১৩৪২ শ্রাবণ, ১৯৩৫) শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে কথা বলেছেন। প্রবন্ধটি আসলে ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে লিখিত একটি পত্র (১৫ জুলাই, ১৯৩৫)। কেমন করে শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতির আদর্শ প্রবেশ করতে পারে এইটে হল প্রসংগ। এই সূত্রে এসেছে শিক্ষার লক্ষ্যের কথা। শিক্ষা শুধু বৈষয়িক সিদ্ধির জন্য নয়, শিক্ষা অন্তরের ঐশ্বর্য। শিক্ষার লক্ষ্য ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা; জীবনীশক্তি, মননশক্তি ও কর্মশক্তির বিকাশ। শিক্ষার

লক্ষ্য চরিত্রকে কর্মিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করে তোলা। শিক্ষার লক্ষ্য নিছক উপকরণবান হওয়া নয়, সর্বপ্রকারে সামর্থ্যবান হওয়া। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মশক্তির উদ্‌বোধন।

এর ছ-সাত মাস পরে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় 'শিক্ষা সপ্তাহ' অনুষ্ঠিত হয়। 'শিক্ষা সপ্তাহ' ও 'নবশিক্ষা ফেলোশিপে'-র এই যৌথ সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিনে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' এবং শেষ দিনে (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধ (বিশ্বভারতী বুলেটিন ২০, ১৩৪২ মাঘ, ১৯৩৬) পাঠ করেন।

বহু-খ্যাত 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধটিতে অনেক মূল্যবান কথা থাকলেও তার অধিকাংশই পূর্বে বলা হয়েছে—বিশেষ করে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', 'শিক্ষার বিকিরণ' এবং 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে। বক্তব্যের প্রধান তিনটি সূত্রকে আর-একবার স্মরণ করতে পারি।

এক, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিতের যোগ নেই, শিক্ষার একতলা ও দোতলার মধ্যে সিঁড়ি নেই। এ হল ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা।

দুই, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ' (র। ১১। ৭০৫), আমরা সেই মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত, অথচ 'শিক্ষায় সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়।' (তদেব)

তিন, মাতৃভাষার রসায়নের অভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। শুধু বিজ্ঞান কেন, কোনো শিক্ষাই আমাদের আপন হয় না। আমাদের সমস্ত শিক্ষাই আজ যান্ত্রিক, জৈব নয়।

'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে (১৩৪৩ আষাঢ়, ১৯৩৬) মূল প্রসঙ্গ যদিও শান্তিনিকেতনের বা বিশ্বভারতীর শিক্ষা-আদর্শ, তাহলেও কথাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের অনেক গোড়ার কথাই এখানে এসে পড়েছে।

প্রবন্ধের শুরুতে তপোবনের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তপোবন যে রকমই হোক না কেন, ভারতের সাহিত্যে তার যে ভাবমূর্তি সে হল বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দময় কল্যাণমূর্তি।

শিক্ষক বা গুরুর প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁরা হলেন 'মানবচিত্তের মালী'। বলেছেন, আশ্রমের শিক্ষাদান খুশির দান। "সেই খুশি সৃজনশীল।" (র। ১১। ৭১১)

প্রকৃতির প্রসঙ্গে বলেছেন, "ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের।…বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে।" (তদেব; ৭১২)

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রসঙ্গে বলেছেন ব্যাপক কর্মসহযোগিতার কথা। লক্ষ্য এই যে, প্রতিদিনের বহুমুখী কর্মপর্যায়ের দ্বারা আশ্রমের সঙ্গে যেন মিলে যায় ছাত্রদের নিত্যপ্রবাহিত কর্মধারা। ছাত্ররা যেন নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই ঘহন করতে পারে।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি জোর দিয়েছেন ছাত্রদের আত্ম-কর্তৃত্বচর্চার উপর। বলেছেন, এতে সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। বলেছেন, "আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব।" (তদেব, ৭১৩)

উপসংহারে বলেছেন, "আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা।" (তদেব. ৭৪৪)

অবশেষে আবার শিক্ষকের প্রসঙ্গ এনে বলেছেন, যাঁরা অসহিষ্ণু, স্বভাবদুর্বল বলেই কঠোর, তাঁরা শিক্ষক হবার অনুপযুক্ত। বলেছেন, "রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।" (তদেব, ৭১৪)

এর আট মাস পরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭-এর সমাবর্তনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন (১৭ ফেব্রুয়ারী, ৫ ফাল্গুন ১৩৪৩)। এই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণ বাংলায় দেওয়া হল। ভাষণটি 'ছাত্রসম্ভাষণ' নামে প্রকাশিত হয় (পুস্তিকা, ১৩৪৩ ফাল্গুন, ১৯৩৭)।

এই প্রবন্ধেও ভাষার প্রসঙ্গ, দেশে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতদের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের প্রসঙ্গ। বলেছেন, "দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।" (র৷১১৷৭১৭)

প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন থাকবেই। এতে দোষ নেই। ইংরেজি ভাষা ইউরোপীয় বিদ্যার প্রবেশপথ। "আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে একথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান।" (তদেব, ৭১৬)

সেই সঙ্গেই তিনি আরো বলেছেন, "রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক।" (তদেব)

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "…নবযুগ প্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছে, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য-সম্পদের মতো। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না।" (তদেব, ৭১৭)

আবার সেই সঙ্গেই উল্টো দিকের সত্যটাও, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক লোভের সত্যটাও স্পষ্ট করে মেলে ধরেছেন। বলেছেন, "…য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জানাবার দিন আজ এসেছে।… হিংস্রতা, লুব্ধতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যেরকম প্রচণ্ড মূর্তি ধরে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মমভাবে দলন করতে উদ্যত হয়েছে ইতিহাসে

এমন আর কোনো দিন হয় নি।…উনিশ শতকের আরম্ভ ও মাঝামাঝি কালে যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন ভক্তির সঙ্গে, আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভূত; নিশ্চিত স্থির করেছিলুম যে, সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োবুদ্ধি এর চরিত্রগত লক্ষণ…। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিত কালের মধ্যেই তার ন্যায়বুদ্ধি, তার মানবমৈত্রী এমনি ক্ষুণ্ণ হল যে, বলদর্পিতের শোষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারশালায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না।" (তদেব, ৭১৯-২০)

তৃতীয় পর্বের এইটেই প্রায় শেষ প্রান্ত। 'ছাত্রসম্ভাষণ' মৃত্যুর চার বছর আগের রচনা। এর পরে আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য এমন রচনা নেই যাতে নতুন কথার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

আগেই বলা হয়েছে, নানা কারণে এই পর্বে ইংরেজি প্রবন্ধ ও ভাষণের কিছু সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। তার ফলে বাংলা রচনায় কিছু যে ভাঁটা দেখা দিয়েছে এমন নয়। ইংরেজি রচনার প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু এদের সবগুলিকে খুব মৌলিক রচনা বলা যায় না। অধিকাংশের মধ্যেই পূর্বগামী বাংলা রচনার ছায়াপাত ঘটেছে। অপেক্ষাকৃত মৌলিক চারটি রচনা থেকে—তিনটি প্রবন্ধ ও একটি চিঠি—এই সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই পর্বের শেষে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সনে। এটি কয়েকটি পূর্বলিখিত প্রবন্ধের সমাহার। এর কথাগুলি নতুন নয়, তবে নতুন-ভাবে বলা। বিশেষ করে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের কথাটা।

'বিশ্বভারতী' (১৯৫১) বইয়ের রচনাগুলিও অনেকটা এই রকম, নানা সময়ে রচিত। আলোচনার মূল লক্ষ্য বিশ্বভারতী। শিক্ষাতত্ত্ব এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। মূল সূত্রগুলি সবই পূর্বের প্রবন্ধসমূহে মোটামুটি আলোচিত। এর শেষ প্রবন্ধটি মৃত্যুর এক বছর আগে ৮ শ্রাবণ ১৩৪৭ সনে রচিত হয়।

৩। তত্ত্বগত পরিচয় : রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের রূপরেখা

ক। সূচনা

খ। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা আদর্শ

অ। শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য :—

(১) শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ

(২) শিক্ষা ও সৃজনশীলতা

(৩) শিক্ষা ও স্বাধীনতা

আ। শিক্ষার নিম্নতর বা ব্যবহারিক লক্ষ্য :—

(১) শিক্ষা ও জীবিকা

(২) বৃত্তিমুখী শিক্ষা

(৩) টেক্‌নলজি শিক্ষা

গ। শিক্ষা ও জীবন

ঘ। শিক্ষা ও প্রকৃতি

ঙ। জাতীয় শিক্ষা ও সর্বজনীন শিক্ষা—শিক্ষায় বিরোধ ও মিলন

চ। শিক্ষার বাহন—শিক্ষায় মাতৃভাষা, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

ছ। শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষাবিস্তার—জনশিক্ষা

জ। স্ত্রীশিক্ষা

ঝ। শিক্ষা ও শিক্ষায়তন

অ। শিক্ষার্থী

আ। শিক্ষণীয় বিষয়—পাঠক্রম :
বিজ্ঞানশিক্ষা চারুশিল্প, ধর্মশিক্ষা, নৈতিক আদর্শ, গঠনমূলক আদর্শ ইত্যাদি

ই। শিক্ষক বা গুরু

ঈ। শিক্ষাপ্রণালী : অনুশীলন, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা

উ। বিদ্যালয়, পরিবেশ, প্রকৃতি

ঊ। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন

ক. সূচনা

আগের অংশে আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাকে কালানুক্রমে দেখতে চেষ্টা করেছি। বর্তমান অংশে আমাদের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার তত্ত্বমূলক দিক।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূল প্রত্যয় সমূহ একে অপরের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে যে সামগ্রিকতা রচনা করেছে, যাকে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন, তার উৎস রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনায়, রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রত্যয়ে। অথবা ইচ্ছা করলে এমন বলতে পারি যে, তার উৎস রবীন্দ্রদর্শনে—যদি দর্শন কথাটিকে আমরা খুব কেতাবী অর্থে না ধরি। আবার একথা বললেও ভুল হয় না যে, তার উৎস রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায়, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষতত্ত্বের প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়সমূহকে কেন্দ্র করে যে সব বিভিন্ন ভাবনাভূমি গড়ে উঠেছে, যাদের বলতে পারি শিক্ষাতত্ত্বের এক-একটি দিক, এক-একটি 'বিষয়', তাদের কয়েকটি নিঃসন্দেহে সাধারণ-ধর্মী অর্থাৎ দর্শনজাতীয়। সেই গুলোই মৌল বা ভিত্তিস্থানীয় প্রত্যয়। বাকিগুলি তত্ত্বে ও ব্যবহারিকে মিশ্রিত। তত্ত্বালোচনায় তাদের বাদ দেওয়া যায় না। কেননা শিক্ষা ব্যাপারটাই তত্ত্বে ও ব্যবহারিকে জড়ানো।

এই 'বিষয়'-গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া, সমগ্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্দেশ করা এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ প্রধান রচনা বিশেষ-ভাবে সম্পর্কিত তার একটি নির্দেশিকা দেওয়া, এইটেই আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

খ. শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা আদর্শ

অ. শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য :—

(১) শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ
(২) শিক্ষা ও সৃজনশীলতা
(৩) শিক্ষা ও স্বাধীনতা

আ. শিক্ষার নিম্নতর বা ব্যবহারিক লক্ষ্য :—

(১) শিক্ষা ও জীবিকা
(২) বৃত্তিমুখী শিক্ষা
(৩) টেক্‌নলজি শিক্ষা

শিক্ষা যদিও আসলে অখণ্ড ও অবিভাজ্য, তাহলেও কার্যক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্যকে আমরা দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলতে পারি শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য—উচ্চতর আদর্শ : মনুষ্যত্বলাভ, মনুষ্যত্বের বিকাশ। দ্বিতীয় হল নিম্নতর লক্ষ্য : জৈব অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষা, জীবিকার জন্য শিক্ষা। একটি ভাষণে এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করে বলেছেন।—

"…সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ-লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন।" (বিশ্বভারতী, র। ১১। ৭৫০)

জৈব-প্রয়োজনকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু মানুষের লক্ষ্য জৈবতা নয়, জৈবতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া, যার নাম মনুষ্যত্বসাধন। সেইটেই মানুষের জীবনের লক্ষ্য। শিক্ষারও মুখ্য লক্ষ্য তাই। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি—

"…পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে ; সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকম বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশ রকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

"জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে ; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে—সকল প্রয়োজনের উপরে সে।" (বিশ্বভারতী, র। ১১। ৭৪৯)

শিক্ষার লক্ষ্য আর মানবজীবনের লক্ষ্য একই। সেই জন্য, প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার, মানুষ কী, সে কী করতে চায়, কী হতে চায়, কোথায় তার জীবনের সার্থকতা। প্রত্যেক মহৎ শিক্ষাবিদেরই শিক্ষাতত্ত্ব তাঁর মানবতত্ত্ব থেকে নিঃসৃত। রবীন্দ্রনাথেরও তাই। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা এবং স্বাভাবিক প্রবণতা তাকে পুষ্টি দিয়েছে, বিশিষ্টতা দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে।

সকলেই জানেন. রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্বের একদিকে আছে ঔপনিষদিক আদর্শ—"…জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা" (তপোবন, শিক্ষা, র। ১১। ৬০৫)। অন্যদিকে আছে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী আদর্শ—ব্যক্তি মুক্তি যুক্তি। ব্যক্তিত্বের সীমাহীন বিকাশ, সর্বপ্রকারের বন্ধন থেকে মানুষের

মুক্তি, মুক্ত মনের বাধাহীন প্রকাশ এবং মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারশীলতায় সীমাহীন আস্থা, আপোষহীন যুক্তিবাদ। আরো অনেক ধারার মিশ্রণ এর মধ্যে আছে। কিন্তু এই মূল দুই ধারার তুলনায় আর সবই গৌণ।

রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হল মনুষ্যত্বলাভ, জীবনকে সব দিক থেকে উদ্বোধিত করা, প্রাণকে সম্পূর্ণ জাগানো, আপনাকে বিকশিত করা, পরিপূর্ণ হওয়া। শুধু মানুষের নয়, এটা সব-কিছুরই—বিশ্বজগতেরই গোড়াকার সত্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ থেকে উদ্ধার করে বলি—

"প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা।"

(বিশ্বভারতী, র। ১১। ৭৬৭)

—মানুষের সত্যও এইখানেই, নিজেকে বিকাশ করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এইটেই শিক্ষার লক্ষ্য। "পরিপূর্ণ মানুষ হবার অপরিমিত আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে রাখবার জন্যই শিক্ষা।"

(আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ ১৩২৬; পৃ. ৭—১০)।

মানুষের অনেক বৃত্তি, অনেক শক্তি; সীমাহীন উদ্যম, অন্তহীন সম্ভাবনা। কেউ জানে না কোথায় মানুষের সীমানা, কোথায় মানুষের শেষ। মানুষ রেডি-মেড বস্তু নয়। মানুষকে প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম ও সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তে হয়ে-হয়ে উঠতে হয় বিরামহীনভাবে। এই হয়ে-ওঠাতেই তার বিকাশ, দেহে এবং মনে—বুদ্ধিতে হৃদয়ে কর্মশক্তিতে, জ্ঞানে ভাবে ও কর্মে। এই ছেদহীন হয়ে-ওঠার সাধনাই শিক্ষা। শিক্ষা অর্থ শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়; জ্ঞানের সাধনা, অনুভূতির বা সৌন্দর্যবোধ বা শিল্পবৃত্তির সাধনা—এবং কর্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির সাধনা। একেই বলা হয়েছে পরিপূর্ণতার সাধনা—'Education for Fulness'.

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে (প্রথম ভাগ। অনুশীলন—১৮৮৮) ঠিক একই ভাবে মনুষ্যত্ব-সাধনার কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই হল মানুষের স্বধর্ম-সাধন। সেই জন্যেই একে তিনি বলেছেন ধর্ম। এই স্বধর্ম-সাধনের অতন্দ্র প্রয়াসকেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন অনুশীলন। একে শিক্ষা বললেও ভুল হয় না। অর্থাৎ, তলিয়ে দেখলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাতত্ত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব, বা আমরা যাকে বলতে পারি, শিক্ষাতত্ত্ব, তা হল মানুষের বৃত্তিনিচয়ের বিকাশের তত্ত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, শারীরিক এবং মানসিক মিলিয়ে মানুষের চার রকম বৃত্তি—"(১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিণী। এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।" (বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৫)।

এ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বে কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও অনায়াসে বলতে পারেন যে, মানুষের বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব-লাভ—মানবজীবনের চরম সার্থকতা। কিন্তু সামঞ্জস্য-সাধনের পথ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, সেইখানে

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের কোনো যোগ নেই। এটা স্বাভাবিক। সামঞ্জস্যের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন খাঁটি রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রী তা কখনোই মেনে নিতে পারেন না।

বৃত্তিনিচয়ের,—শারীরিক বৃত্তিসমূহ, জ্ঞানাত্মক বৃত্তিসমূহ, কর্ম-প্রযোজক বৃত্তিসমূহ এবং নান্দনিক বৃত্তিসমূহ, চার গোত্রের সমস্ত বৃত্তির বিকাশ, শুধু বিকাশ নয়, বিকাশ এবং সামঞ্জস্য, এইটেই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব বা শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা। সামঞ্জস্য না ঘটলে ব্যক্তিত্বে ঐক্য কেমন করে থাকবে, বিকাশের মৌল তাৎপর্য কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? কিন্তু এমন কি কোনো শক্তি আছে যা সমস্ত বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তাদের মধ্যে ঐক্য ও সমগ্রতা এনে দিতে পারে তাদের মধ্যে উচ্চতর তাৎপর্যের সঞ্চার করতে পারে, এক-কথায় তাদের সামঞ্জস্য-সাধন করতে পারে? আছে, **বঙ্কিমচন্দ্রের** মতে এই সামঞ্জস্য-বিধায়িনী শক্তি হল ভক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের পরিণামে বৃত্তিনিচয়ের ঈশ্বরমুখিতাকেই বলেছেন ভক্তি। সর্বভূতে প্রীতি এর প্রধান অংশ। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলি—

"সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।"

(তদেব, পৃ. ৬৭১)

বৃত্তির বিকাশেই যে মনুষ্যত্ব, এই পথেই যে মানুষের পুরুষার্থ, এই অভিমতে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই মোটামুটি তৎকালীন যুগধর্মের সমুচ্চ চিন্তা-ধারার সহগামী। বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা তাঁর সামঞ্জস্যের তত্ত্বে, ভক্তির ভূমিকাতে, বৃত্তিনিচয়ের ঈশ্বরমুখিতার তত্ত্বে। এইখানে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাতত্ত্ব বা অনুশীলনতত্ত্ব প্রচলিত অর্থে ধর্মতত্ত্বের রূপ নিয়েছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথে বঙ্কিমচন্দ্রে প্রধান অমিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মানবতত্ত্বে পাশ্চাত্য ইউডিমনিস্টদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁর ভাবপরিমণ্ডলটি পৌরাণিক হিন্দুধর্মের, বিশেষ করে গীতার। ভক্তি-তত্ত্বে অন্য সমস্ত প্রভাবকে ছাড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বকীয়তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্ব কিছুটা ঔপনিষদিক এবং অনেকটাই রেনেসাঁসী। কিন্তু সবকে নিয়েই এবং সব ছাপিয়েও তা বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক।

রেনেসাঁসী বলেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ধর্মনিরপেক্ষ সেক্যুলার শিক্ষাতত্ত্ব, চূড়ান্তভাবে মানবমুখী শিক্ষাতত্ত্ব। সেখানে ভক্তির কোনো বাড়তি স্থান নেই, কোনো বিশিষ্ট গুরুত্ব নেই। রেনেসাঁসী বলেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব সর্ববিধ অথরিটেরিয়ান বা গুরুবাদী শিক্ষানীতির বিরোধী; তা স্বাধীন সন্ধানের শিক্ষাতত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের আসল মৌলিকতা তাঁর মানবতত্ত্বের মধ্যেই নিহিত। সেই মৌলিকতা হল এই অভিমতে যে, মানুষের স্বধর্ম হল তার সৃজনশীলতায় এবং তার মুক্তিতে—স্বাধীনতায়, আত্মকর্তৃত্বে। রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্বে সৃষ্টি এবং মুক্তি খুব পৃথক নয়। মুক্তি ছাড়া সৃজন অসাধ্য, সৃজন ছাড়া মুক্তি বন্ধ্যা।

পশু জৈবধর্মের অধীন, জৈবতাতেই তার অস্তিত্বের সীমানা। মানুষও কিছু পরিমাণে জৈবধর্মের অধীন। সেইটুকুতে মানুষের জীবত্ব। কিন্তু সেইটেই মানুষের

অস্তিত্বের সীমানা নয়। প্রতি পদক্ষেপে সে আপন জৈবধর্মকে অতিক্রম করে। করে বলেই সে মানুষ। মানুষ 'শুধু মাত্র প্রাণ' নয়, তাই 'আহারনিদ্রার শেষ ঋণ' শোধ করাতেই তার পরিসমাপ্তি নয়। ঠিক যতোটুকু পরিমাণে সে আপন জৈবধর্মকে অতিক্রম করে, ততোটুকুতেই সে স্বাধীন, ততোটুকুতেই তার মানবত্ব। জৈব-জগতে নয়, তার মানবত্বের জগতেই তার আত্ম-কর্তৃত্ব। সেইখানেই সে স্রষ্টা।

এই সৃষ্টিধর্মে, এই মুক্তিতে মানুষে পশুতে পার্থক্য। পশু স্রষ্টা নয়। তার কোনো মুক্তির জগৎ নেই। আহার নিদ্রার ঋণ শোধ করতে-করতেই তার দিন শেষ হয়ে যায় (কঙ্কাল, পূরবী, র। ২।৭১০-১১)। মানুষের মতো পশু বলতে পারে না—

"মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি"

(২২ সংখ্যক কবিতা, শেষ সপ্তক, র। ৩। ১৮০)।

মানুষের সত্য পরিচয় তার জৈবতায় নয়, তার আত্মকর্তৃত্বে, তার স্বাধীনতায়, সৃজনশীলতায়। কবি চিত্রকর গায়ক ভাস্কর না-ও যদি হয়, তবু সব মানুষই শিল্পী। কেননা প্রত্যেক মানুষই জীবনশিল্পী। মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে, নিজের পরিবেশকে সৃষ্টি করে—মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে, সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, সভ্যতা সৃষ্টি করে। প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টা, সব মানুষ, প্রতিটি মানুষ। স্রষ্টৃত্বই মানুষের স্বধর্ম। স্বধর্ম-অর্জনেই মানুষের মনুষ্যত্বলাভ। 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন (শিক্ষা, র। ১১। ৭১৩)—

"আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট, আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে।"

এইখানেই মানুষের মূল লক্ষ্য, মানবজীবনের **সার্থকতা**। আত্মকর্তৃত্ব এবং সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিকাশের জন্য যে সাধনা, তারই নাম মনুষ্যত্বের সাধনা, তারই নাম শিক্ষা।

যদিও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় মানুষের ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব-সাধনের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন, তাহলেও মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার সমাজগত লক্ষ্যও এই ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব-সাধনের মধ্যেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ জানেন মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তিনি বার বার বলেছেন, একলা-মানুষ সত্য নয়, সমাজজীবনের মধ্যেই মানুষ যথার্থ মানুষ, সমাজজীবনের মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব-সাধন সত্য ও সার্থক হয়। মানুষের ব্যক্তিগত সাধনা এবং সমাজগত সাধনা এখানে অভিন্ন, মানুষের আত্মকল্যাণ এবং মানবকল্যাণ অভিন্ন। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতে ও সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নয়, শিক্ষার লক্ষ্য একই সঙ্গে মানুষের আত্মবিকাশ এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানববিকাশ।

আ. শিক্ষার নিম্নতর বা ব্যবহারিক লক্ষ্য—

রবীন্দ্রনাথ মানুষের জৈব-প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি, মানুষের বাঁচার সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করেন নি। তিনি জানেন, মানুষ এক সঙ্গে প্রয়োজনের জগতের—

জৈববিশ্বের এবং প্রয়োজন-ছাড়ানো জগতের—মানবিক-বিশ্বের অধিবাসী। সেই জন্যই তিনি শিক্ষার লক্ষ্যকে উচ্চতর এবং নিম্নতর এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

শিক্ষার নিম্নতর বা ব্যবহারিক লক্ষ্য হল বেঁচে-থাকার সামর্থ্য অর্জন করা, সোজা কথায় জীবিকা অর্জনের সামর্থ্য লাভ করা। একে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ব্যবহারিক সুযোগলাভ'। বৃত্তিশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা সবই এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বে প্রাধান্য উচ্চতর লক্ষ্যের। কিন্তু, আগেই বলেছি, নিম্নতরকে তিনি অস্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সমগ্রতার সাধক—মানুষের কোনো দিককেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সেই সমগ্রতার দিক থেকে ভেবে দেখলে বলা যায়, উচ্চতর ও নিম্নতর দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, তাদের সম্পূর্ণ পৃথক করাও স্বাভাবিক নয়। দুটিকে আলাদা কামরায় স্থাপন করা যুক্তি-যুক্ত নয়। তার কারণ চূড়ান্ত জৈবতার মধ্যেও মানুষের মানবধর্ম সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় না—মানুষ আসলে একটা অখণ্ড সত্তা। 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে (শিক্ষা, র। ১১। ৬৯৭) রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, শিক্ষাক্রমের মধ্যে ব্যবহারিক বা বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। "...তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে।"

উচ্চতর আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মুখ্য প্রয়োজন আর নিম্নতর আদর্শকে তিনি বলেছেন গৌণ প্রয়োজন। বলেছেন, এ দুইকে মিলিয়ে নিয়েই মানুষের সত্তা। জগদানন্দ রায়কে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড থেকে যে চিঠি লিখেছেন (১৯১৩) তাতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মানুষের প্রকৃতিকে আলাদা-আলাদা করে ভাগ করা যায় না। বলেছেন, "তার মুখ্য প্রয়োজনের সঙ্গেই তার গৌণ প্রয়োজনকে মিলিয়ে দেখতে হবে—বিচ্ছিন্ন করতে গেলেই মানুষের মর্মে আঘাত দেওয়া হবে।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬)

এ সত্ত্বেও দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ মাঝে-মধ্যেই ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। এটা ঘটেছে এই কারণে যে, আমাদের ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমস্ত শিক্ষাই জীবিকার জন্য শিক্ষা, উচ্চতর আদর্শের সেখানে কোনো স্থান নেই। এরই প্রতিক্রিয়াতে রবীন্দ্রনাথ হয়তো উচ্চতর আদর্শের উপর একটু অতিরিক্ত জোর দিয়ে নিম্নতর আদর্শের প্রতি কিছু বাড়তি অবজ্ঞা দেখিয়ে থাকবেন। এটা যে শুধু স্বাভাবিক তা-ই নয়, আমাদের হ্রস্বদৃষ্টি শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আত্মসমালোচনা এবং অত্যন্ত **মূল্যবান** দিক্-নির্দেশ।

আমাদের এই ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে (শিক্ষা, র।১১।৬৯৮) বলেছেন, "চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি।" আরো বলেছেন, "কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে।"

আমাদের দেশের প্রচলিত আদর্শহীন শিক্ষাবিধির—একপেশে কেরানি-তৈরির শিক্ষাবিধির প্রতি প্রবল বিরূপতার কারণেই রবীন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে একটু অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে গিয়েছে। নতুবা, জীবিকামুখী শিক্ষাকে, বৃত্তিমুখী শিক্ষাকে, ব্যবহারিক

সামর্থ্য-অর্জনের শিক্ষাকে তিনি কখনোই সম্পূর্ণ বাদ দেবার কথা বলেন নি। তিনি শূন্যঝুলির দারিদ্র্যের সমর্থক নন। তিনি বলেছেন (তদেব, ৬৯৭), "সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে…।"

ব্যবহারিক সামর্থ্য-অর্জনকে যে রবীন্দ্রনাথ বাদ দেন নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্র বিদ্যালয়। আরো বড়ো প্রমাণ শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে তাঁর পল্লীসংগঠন প্রয়াস। এর সবটাই ব্যবহারিক সামর্থ্য-অর্জনের অভিযান এবং সবটাই তাঁর শিক্ষা-প্রয়াসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই সূত্রেই তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন; কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, বয়নশিল্প প্রভৃতি কারুশিল্পশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। কী কৃষি, কী কারুশিল্প, সমস্ত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের প্রয়োগে উৎসাহী। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্ঞান-সাধনাকেও যেমন চেয়েছেন, বিজ্ঞানের প্রয়োগগত দিককে—টেক্‌নলজিকেও তিনি তেমনি চেয়েছেন। তিনি গ্রামে বিজ্ঞান আনতে চেয়েছেন; কৃষিতে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে চেয়েছেন; সীমিত ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিল্পায়নে তিনি আগ্রহী। তিনি বলেছেন (পল্লীপ্রকৃতি, 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থ, র/১৩/৫১৫), "বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে।…মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই।" এই প্রবন্ধেই তিনি আরো বলেছেন (তদেব, ৫১৪), "মানুষ যেমন একদিন লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ করে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেই রকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না।"

একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। এই-যে যন্ত্রকে জীবনযাত্রার অনুগত করে নেওয়া, এই-যে টেক্‌নলজিকে গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করা, এটা শিক্ষাসাপেক্ষ। এ শিক্ষা মূলত প্রয়োগভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা—যন্ত্রবিৎ হয়ে উঠবার শিক্ষা, অর্থাৎ এক অর্থে বৃত্তিমুখী শিক্ষা। এতে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। শুধু যে আপত্তি নেই তা নয়, প্রচুর আগ্রহ আছে। শুধু একটি শর্ত। ওটা যেন একপেশে হয়ে না ওঠে, শিক্ষার উচ্চতর আদর্শ যেন চাপা পড়ে না যায়।

শ্রীনিকেতন প্রয়াসের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন (অভিভাষণ, পল্লীপ্রকৃতি, র / ১৩ / ৫৩৪), "আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি।"

এই স্বীকৃতি জীবনে যেমন শিক্ষাব্যবস্থাতেও তেমনি। পল্লীসংগঠনের প্রসঙ্গে মুখ্য ও গৌণের সমন্বয়ের কথা তিনি যা বলেছেন তাই দিয়েই শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ের আলোচনা শেষ করি।—

"আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশ্যে।"

(তদেব)

শিক্ষার মূল লক্ষ্য এই আত্মলাভ। এরই অন্য নাম আত্মপ্রকাশ। সামর্থ্য-অর্জন এর বাইরে নয়।

প্রাসঙ্গিক রচনা ঃ—

১। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ; ২। শিক্ষাসংস্কার ; ৩। তপোবন ; ৪। লক্ষ্য ও শিক্ষা ; ৫। জগদানন্দ রায়কে পত্র—৩নং ; ৬। অসন্তোষের কারণ ; ৭। আকাঙ্ক্ষা ; ৮। প্রান্তনী—(৬) ; ৯। বিশ্বভারতী (২) ; ১০। বিশ্বভারতী (৪) ; ১১। পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা ; ১২। জনৈক অধ্যাপককে পত্র ; ১৩। কলাবিদ্যা ; ১৪-১৫। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ (১) ও (৪) ; ১৬। শিক্ষার সার্থকতা ; ১৭। শিক্ষার আদর্শ ; ১৮। বিশ্বভারতী (১৫) ; ১৯। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ; ২০। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ; ২১-২২। বিশ্বভারতী (১৭) ও (১৮) ; ২৩। পল্লীপ্রকৃতি ; ২৪। The School Master ইত্যাদি।

গ. শিক্ষা ও জীবন

পরবর্তী প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনাই প্রথম আলোচনার অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ক আলোচনার অনুবৃত্তি। শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যা অভিমত, অপর সমস্ত বিষয়েরই অভিমত সেই মূল অভিমতের অনুগত। সেই কারণে শিক্ষাতত্ত্বের অন্যান্য দিক বা অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এখন আমরা অনায়াসেই অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে পারি।

শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় মনুষ্যত্ব-সাধনা, তাহলে, সহজেই বোঝা যায়, শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল সারা জীবন। তা হলেও, সাধারণ ভাবে জীবনের প্রস্তুতির কালকেই, অর্থাৎ শৈশব-কৈশোর-যৌবনকেই আমরা শিক্ষার কাল বলে ধরে থাকি। গৃহশিক্ষা, পাঠশালা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তিশিক্ষাসদন ইত্যাদি দিয়ে এই পর্বটি চিহ্নিত এবং জীবনের অন্যান্য পর্ব থেকে পৃথকীকৃত। কিন্তু এই পার্থক্য নিতান্তই আপেক্ষিক। পর্বকে যদি আমরা আলাদা **বলি,** তাহলেও তা জীবনেরই অঙ্গ এবং তা সমগ্র জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যে শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুত করে না, তা শিক্ষাই নয়।

এই প্রস্তুতি দ্বিমুখী। জীবিকামুখী শক্তির বিকাশের প্রস্তুতি এবং সেই সঙ্গে মনুষ্যত্বমুখী বৃত্তির বিকাশেরও প্রস্তুতি। এই দুই প্রস্তুতি যেমন একসঙ্গে গাঁথা, তেমনি একসূত্রে গাঁথা মানুষের ব্যক্তিজীবনের বিকাশ এবং তার সমাজজীবনের বিকাশ।

ভারতের ঔপনিবেশিক শিক্ষা ভারতীয়ের জীবনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা নয়। তার উদ্ভব ততটা ভারতীয় জীবনের স্বকীয় প্রয়োজনে নয়, যতটা শোষকের নিজস্ব প্রয়োজনে—কেরানি ইত্যাদি তৈরির প্রয়োজনে, অনুগত একটি শ্রেণী তৈরি করার প্রয়োজনে। এই তথাকথিত শিক্ষা মানুষকে বিকশিত করে না, মানুষকে ঐশ্বর্য দেয় না, মানুষকে অন্তঃসারশূন্য যন্ত্রে পরিণত করে, মানুষকে দাসে পরিণত করে।

শুধু ঔপনিবেশিক শিক্ষা নয়, যে-কোনো অথরিটেরিয়ান গুরুবাদী শিক্ষাই মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে বিনষ্ট করে দেয়, মানুষকে চিরাগত প্রথার দাস করে

ফেলে। জগদানন্দ রায়কে লেখা চিঠিতে (১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই জোর দিয়ে বলেছেন।—

"আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে চিরাগত প্রথার অধীনতা স্বীকার করবার একটা মজ্জাগত অনুরাগ আছে—মুক্তির প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই, খাঁচার পাখির মতো আমরা আকাশকে ভয় করি। এই জন্য আমাদের ছেলেদের মনও জড়বৎ হয়ে যায়। তাদের উদ্ভাবনী শক্তির একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। ··" (২৯ বৈশাখ ১৩২০, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬)

জীবনের দাবি সমৃদ্ধির দাবি, ঐশ্বর্যের দাবি, বিকাশের দাবি। জীবনের দাবি অগ্রগতির দাবি। জীবনের দাবি স্বাধীনতার দাবি, সৃজনশীলতার দাবি। যে শিক্ষাবিধি এই দাবি পূরণের জন্য প্রস্তুত নয়, তা আদৌ শিক্ষাবিধি নয়।

প্রাসঙ্গিক রচনা—

১। শিক্ষার হেরফের ; ২। জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং ; ৩। আকাঙ্ক্ষা ; ৪। বিশ্বভারতী (৪) ; ৫-৬। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ (১) ও (২) ; ৭। শিক্ষার সার্থকতা ; ৮। আবরণ , ৯। লক্ষ্য ও শিক্ষা, ইত্যাদি।

ঘ. শিক্ষা ও প্রকৃতি

আমরা দেখেছি, শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতার অবকাশ থাকতে হবে, এই ব্যাপারটির উপর রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েছেন। এই কারণেই তিনি চান যে, শিক্ষা যান্ত্রিক হবে না, যন্ত্রবদ্ধ হবে না—যান্ত্রিক পরিবেশ সব সময়েই যথার্থ শিক্ষার পরিপন্থী। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ মনের মুক্তির জন্য প্রয়োজন, স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতার বিকাশের জন্যই তা অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই বলি—

"বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে।" আশ্রমের শিক্ষা, র/ ১/৭১২)

প্রকৃতি যে মানুষের বন্ধু এবং শিক্ষক, এই কথাটা শুধু রোমাণ্টিক কবিরাই নন, শিক্ষাবিদেরাও অনেকেই বলেছেন। কথাটাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি, বরং গুরুত্ব দিয়েই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আরো বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি প্রকৃতির বর্ণগন্ধরূপ-সম্ভারের উপর, প্রকৃতির মধ্যে যে সহজ মুক্তির লীলা আছে তার উপর, আনন্দের উপর।

শিক্ষার নান্দনিক দিকটির উপর, শুধু ছবি ভাস্কর্য সংগীত নৃত্য নয়, সর্ববিধ নান্দনিক বিকাশের উপর রবীন্দ্রনাথ যেমন জোর দিয়েছেন, পৃথিবীর খুব কম শিক্ষাবিদের ক্ষেত্রেই তেমন দেখতে পাওয়া যাবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে বস্তি ব্যারাক বাজারের পরিমণ্ডল, যন্ত্রবদ্ধ নগরজীবনের ধূসর নিরানন্দ পরিমণ্ডল ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে প্রকৃতির সজীবতার মধ্যেই স্থান দেবেন।

প্রাসঙ্গিক রচনা—

১। শিক্ষাসমস্যা ; ২। তপোবন ; ৩। জগদানন্দ রায়কে পত্র—১ নং ; ৪। অজিত

কুমারকে পত্র—২ নং ; ৫-৮। বিশ্বভারতী (৪), (১০), (১৪) ও (১৭) ; ৯। আশ্রমের শিক্ষা ; ১০। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ; ১১। The School-Master ; ১২। A Poet's School, ইত্যাদি।

৬. জাতীয় শিক্ষা ও সর্বজনীন শিক্ষা—শিক্ষায় বিরোধ ও মিলন

মানুষের সত্তা অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। তবু তারি মধ্যে অনেক স্তর, অনেক কক্ষ-প্রকোষ্ঠ, অনেক বৈচিত্র্য। মানুষের সত্তার একটা দিক যেমন তার ব্যক্তিজীবন, আর একটা দিক সমাজজীবন, ঠিক তেমনি মানুষের সত্তার একটা দিককে বলতে পারি তার জাতীয় সত্তা, অন্য দিককে বলতে পারি তার মানবিক সত্তা। ব্যক্তিজীবনে মানুষের এক পরিচয়, সমাজজীবনে সেই মানুষেরই ঈষৎ অন্যতর পরিচয়। এই দুই পরিচয়ে কোনো বিরোধ নেই। এরা পরস্পরসাপেক্ষ, পরস্পরের পরিপূরক, এরা অচ্ছেদ্য। এদের কোনটা বেশি কোনটা কম, মানুষের পক্ষে কোন্ পরিচয়টা সত্যতর, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অর্থহীন।

জাতীয়জীবনের ক্ষেত্র এবং মানব-ইতিহাসের ক্ষেত্রও সেই রকম। জাতীয়জীবনে, স্বদেশ ও স্ব-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মানুষের এক রকম পরিচয়—আমি ভারতীয়, আবার আন্তর্জাতিক জীবনে, মানব-সভ্যতার ও মানব-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তার অন্য রকম পরিচয়—আমি মানুষ। দুটো পরিচয়ই সমান সত্য। শুধু তাই নয়, এ দুইকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জাতীয়-পরিচয়কে বাতিল করে মানুষের মানব-পরিচয় সত্য নয়, আবার মানব-পরিচয়কে বাদ দিয়ে মানুষের জাতীয় পরিচয় সত্য নয়।

এই ক্ষেত্রটাতে অনেক সময়ই ভুল ঘটে থাকে। আদর্শনিষ্ঠ ভাবুকেরা অনেক সময় ভেবে বসেন, মানুষের মানবসত্তাটাই একমাত্র। অন্য দিকে উগ্র ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পরিমণ্ডলে শুধু সাধারণ মানুষরাই নয়—শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানবতাবাদীও অনেক সময় ভেবে বসেন, মানুষের জাতীয় সত্তাটাই একমাত্র, মানবিক সত্তাটা একটা অলস কল্পনা, একটা ভাববিলাস।

একমাত্র জৈব-সত্তাটাই অনেকখানি পরিমাণে মানুষের প্রকৃতিদত্ত, আর সবই—কী সামাজিক-সত্তা, কী জাতীয়-সত্তা, কী মানব-সত্তা, সবই মানুষকে অর্জন করে নিতে হয়, সৃষ্টিকর্তা-মানুষকে সাধনার দ্বারা সৃজন করে নিতে হয়। এ তার মনুষ্যত্ব-সাধনারই অঙ্গ। অর্থাৎ সবই তার শিক্ষার অঙ্গ।

ভারতীয়ের পক্ষে সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা এবং পূর্ণাংগ শিক্ষা যা একই সঙ্গে তাকে ভারতীয় করে এবং মানুষ করে। অর্থাৎ যা একই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা বা ভারতীয় শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা বা সর্বমানবিক শিক্ষা। বিদ্যার একটি দিক আছে যা বিশেষ দেশের, বিশেষ সংস্কৃতির, বিশেষ ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, যা জাতি বিশেষের বিশিষ্ট জীবনপরিবেশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে লগ্ন, সেই জাতির বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্গে গ্রথিত। সেই দিকটি জাতীয় শিক্ষার দিক। তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন অনেক দিকই আছে যা সার্বভৌম এবং সর্বমানবিক। সেই দিকটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার দিক।

শিক্ষার গুণে বা দোষে ভারতীয় যদি খাঁটি ভারতীয় থেকেই সর্ব-মানবের প্রতিনিধি হতে না পারে, বুঝতে হবে তার ভারতীয়ত্ব সংকীর্ণ, কৃত্রিম, অসত্য। এই সংকীর্ণ ভারতীয়ত্বকে তার অতিক্রম করতে হবে। পরাধীন জাতির পক্ষে, শোষিত জাতির পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসনাধীন উপনিবেশের পক্ষে এই অতিক্রমণ সহজ নয়। তার প্রতি মুহূর্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এর বড়ো বাধা।

সমস্ত উপনিবেশই অথবা সমস্ত সদ্য-স্বাধীন অনুন্নত দেশই আজ প্রখরভাবে জাতীয়তাবাদী। তার লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষা। এটা খুবই স্বাভাবিক। শুধু উপনিবেশ নয়, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাও আজ সমান প্রখরভাবেই জাতীয়তাবাদী। জঙ্গি জাতীয়তাবাদ আজ প্রায়/যুগচেতনারই অঙ্গ। অসংশোধনীয় রকমের মানবতাবাদী ছাড়া, অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানবতাবাদী ছাড়া কেউ-ই আজ আর মানবসভ্যতার মৌল ঐক্যের কথা ভাবতে ইচ্ছুক নন।

রবীন্দ্রনাথ সেই বিরল ব্যতিক্রম স্থানীয়দের একজন যিনি মানুষের আজকের দিনের ইতিহাসকেই চূড়ান্ত করে দেখেন না। প্রচলিত অর্থে জাতীয়তাবাদ আর সুস্থ স্বাভাবিক জাতীয় চেতনা এক নয়। জাতীয়তাবাদ অতীতের প্রয়োজনের বস্তু হতে পারে, কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ—জাতীয় অহমিকা ভাবীকালের সত্য নয়। বস্তুত আজই সে **কালাতিক্রান্ত**। জাতীয় শিক্ষা আর জাতীয়তাবাদী শিক্ষা যে মোটেই এক নয়, ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত জাতির পক্ষে এই সত্যটা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথকেও অনেক অভিজ্ঞতার ঘাট পেরিয়ে আসতে হয়েছে।

'তপোবন' প্রবন্ধ রচনার কালে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন, জাতীয়তাবাদী শিক্ষা নয়, জাতীয় শিক্ষার উপর। জাতীয় শিক্ষা দোষাবহ নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। আন্তর্জাতিক বা সার্বভৌম শিক্ষা তার পরিপূরক। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে এই সত্যটি তুলে ধরেন। জোর দিয়ে বলেন, অন্য ক্ষেত্রে যতই বিরোধ থাক, শিক্ষায় বিরোধ সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত। এইখানেই গান্ধিজীর সঙ্গে এবং তারই সূত্র ধরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে **রবীন্দ্রনাথের** প্রবল মতবিরোধ ঘটে। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে— এবং পরবর্তী অনেক রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, বিদ্যার ক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই। একমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে মিলন সম্পূর্ণ বাধাহীন। এই শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মিলনই বিশ্বভারতীর আদর্শ।

প্রাসঙ্গিক রচনা—

১। তপোবন; ২। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়; ৩। শিক্ষাবিধি; ৪। অজিত **কুমারকে পত্র**—২নং; ৫। বিদ্যাসমবায়; ৬। শিক্ষার মিলন; ৭-১২। বিশ্বভারতী (৪), (৫), (৬), (১০), (১৫) ও (১৭); ১৩। পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা; ১৪। My Educational Mission—ইত্যাদি।

চ. শিক্ষার বাহন—শিক্ষায় মাতৃভাষা, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

শিক্ষার বাহন বা শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নটি আসলে ভাষার প্রশ্ন—শিক্ষায় ভাষার স্থান

বা ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। প্রশ্নটি শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়ানো। তলিয়ে দেখলে প্রশ্নটি মানুষের মনোবিকাশের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে জড়ানো। আরো তলিয়ে দেখলে মানুষের মানবত্বের সঙ্গেই জড়ানো। কেননা মানুষই বোধকরি একমাত্র প্রাণী যাকে পুরোপুরিভাবে ভাষাব্যবহারকারী বলা যায়। মানুষ থেকে তার ভাষাকে এবং ভাষা থেকে মানুষকে আলাদা করা যায় না।

গোড়াতেই একটা আপত্তি জানিয়ে রাখা যায়। ভাষা কি শিক্ষার কেবল বাহন? বাহন কথাটা কি এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত?

'বাহন' বললে যে ছবিটা মনে জাগে তা অনেকটা এই রকম: একদিকে আছে শিক্ষার্থী আর অন্য দিকে আছে শিক্ষণীয় বিষয় হাতে নিয়ে শিক্ষক। শিক্ষক যেন শিক্ষণীয় বিষয়টিকে বাহনের পিঠে চাপিয়ে শিক্ষার্থীর মনের দরজায় পেঁছে দিচ্ছেন।

এই ছবিটা ভুল। সাধারণ ক্ষেত্রে বাহন কোনো অচ্ছেদ্য বস্তু নয়। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা মোটেই সে রকম নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভাষাকে কখনো সে রকম বাইরের ব্যাপার বলে মনে করেন নি। তবু যে তিনি 'বাহন' কথাটা ব্যবহার করেছেন, এটা সম্ভবত খানিকটা তাঁর আলংকারিক শব্দ প্রয়োগের প্রবণতার জন্য এবং খানিকটা উপযুক্ত শব্দের অভাবের জন্য। নইলে রবীন্দ্রনাথ খুব ভালোই জানেন, শিক্ষণীয় বিষয়কে ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, শিক্ষার্থীর মনকে ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, শিক্ষকও ভাষা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন না। ভাষা শিক্ষণীয় বিষয়ের নিছক মাধ্যমও নয়, বাহনও নয়, ভাষা শিক্ষণীয় বিষয়ের মর্মের সঙ্গে জড়ানো সত্য। তার কারণ ভাষা মানুষের সৃষ্টি, একথা যেমন সত্য, মানুষ ভাষার সৃষ্টি, এ কথাও তেমনি সত্য।

কিন্তু সে কোন্ ভাষা? যে ভাষা মানুষের ভাববিনিময়ের এবং প্রকাশের স্বাভাবিক 'মাধ্যম', সেই ভাষা। যে ভাষা মানুষকে আলাদা করে 'শিখতে' হয় না, যা অতি শৈশব থেকে মানুষের মনে 'সৃষ্ট' হয়, সৃজনশীলভাবে জন্মে-ওঠে, সেই ভাষা। অর্থাৎ মাতৃভাষা। অন্য কোনো ভাষাই নয়, একমাত্র মাতৃভাষা, মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে যাকে আমরা আত্মস্থ করি। সেই ভাষাই শিক্ষার স্বাভাবিক 'মাধ্যম', স্বাভাবিক 'বাহন'।

সেই শিক্ষা শিক্ষাই নয়, যে শিক্ষা শিক্ষণীয় বিষয়কে আপন করে না দেয়। মাতৃভাষাই শিক্ষণীয় বিষয়কে স্বাঙ্গীকৃত করে দেয়—জ্ঞানকে সত্তার সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নেয়। আপন করাটাই শিক্ষার আসল কথা। রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা, র।১১।৭০৫), "সেই আপন করিবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের খাদ্য হয়।... শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।"

মাতৃভাষা শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই মাতৃস্তন্য নয়, তা সর্বক্ষেত্রেই মাতৃস্তন্য—সমগ্র ঐতিহ্যের স্তন্য, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা নিয়ে বলি—যুগ-যুগান্তরের স্তন্য। তাই দিয়েই আমাদের চৈতন্য গড়া, আমাদের ভাবনালোক, বেদনালোক, বাসনালোক গড়া। অপর ভাষার সহায়তায় আমরা ব্যবহারিক জগতে বিচরণ করতে পারি, তার বেশি পারি না। অপর ভাষায় আমরা নির্মাণ করতে পারি, সৃষ্টি করতে পারি না। কদাচিৎ

হয়তো এর আপাত-ব্যতিক্রম কিছু নজরে পড়বে, কিন্তু সে দৃষ্টান্ত এতই বিরল এবং এমনই বিশিষ্ট যে তা এই সাধারণ সত্যকে মোটেই অপ্রমাণ করে না।

শিক্ষায় ভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য এই সর্বজনীন সাধারণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যে শিক্ষা সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটায় না, তা শিক্ষাই নয়। সেই কারণেই আমাদের দেশের ইংরেজসৃষ্ট ঔপনিবেশিক শিক্ষা—শিক্ষা নামের অনুপযুক্ত। এই শিক্ষাব্যবস্থার সর্বপ্রধান ক্ষতিকর দিক এই যে এর বাহন ('বাহন' কথাটা এই ক্ষেত্রে মোটেই অপ্রযুক্ত নয়) ইংরেজি ভাষা। "তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি…।" (শিক্ষার বাহন, শিক্ষা, র৷১১৷৬৪৫)

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় প্রথমত ছাত্রের জীবনের অতি মূল্যবান সময় কেবল ভাষাশিক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যয় হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সেই অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অধিগম্য হয় না; সে শিক্ষা শহরের অল্প কতিপয়েরই আয়ত্তাধীন; ফলে এই শিক্ষা শহুরে শিক্ষিতদের গোটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এবং, তৃতীয়ত মাতৃভাষার মাধ্যমে নয় বলে, এই ব্যবস্থায় শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর প্রাণের সামগ্রী হয়ে ওঠে না -'শিক্ষিতরা' অশিক্ষিতই থেকে যায়।

পরভাষায় শিক্ষাতে শিক্ষা যা হয়—যদি হয়—তা অতি অকিঞ্চিৎকর। তার সঙ্গে দেশের জীবনের যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, "আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষা র৷১১৷৬৯৯)

এই বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ হল পরভাষায় শিক্ষা, শিক্ষায় পরধর্ম। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অতি স্পষ্ট। "…নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ, শিক্ষায় পরধর্ম।" (তদেব. ৭০০)

প্রাসঙ্গিক রচনা—

১। ন্যাশনেল ফণ্ড; ২। শিক্ষার হেরফের; ৩। প্রসঙ্গকথা ১ (৩ খানি পত্র); ৪। শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি; ৫। বাংলা শিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি); ৬। ইংরেজি শেখা; ৭। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি; ৮। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ; ৯। শিক্ষার বাহন; ১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ; ১১। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ; ১২। ছাত্রসম্ভাষণ; ১৩। বাংলা শিক্ষার প্রণালী—ইত্যাদি।

ছ. শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষাবিস্তার—জনশিক্ষা

কার জন্য শিক্ষা? শিক্ষা সকলের জন্য এবং প্রত্যেকের জন্য। কার জন্য শিক্ষা, এ প্রশ্ন আদৌ উঠবে কেন? কিন্তু যে সমাজ উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যে সমাজে 'নিম্নতর শ্রেণীর' মানুষ অনেক মানবাধিকার থেকেই বঞ্চিত, সেখানে এ প্রশ্ন উঠবেই।

শিক্ষার বিস্তারই বলি, আর বিকিরণই বলি, কার জন্য শিক্ষা—মূল প্রশ্ন হল এইটেই। শিক্ষা কি শুধু এলিটের জন্য? শুধু 'ভদ্রসম্প্রদায়ের' নরনারীর জন্য? দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের অর্থে, দেশের সামর্থ্যে গড়ে ওঠে। হয় তাকে পরিচালনা করে রাষ্ট্র, না হয় করে সমাজ। কিন্তু কার স্বার্থে করে? কে শিক্ষিত হয়? কে লাভবান হয়? গোটা দেশ, না অল্প কতিপয় ব্যক্তি? আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা কার স্বার্থে পরিচালিত, এই শিক্ষার আলো কোথায় বিকিরিত হয়?

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, "এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে।...শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড, সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত।... দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা, কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এ রকম নয়।" (শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা, র।১১।৬৯১)

উচ্চবর্ণ এবং উচ্চবিত্ত মানুষদের জন্য উচ্চশিক্ষা আর দেশের জনসাধারণের জন্য লোকশিক্ষা, অনেকটা এই ধরনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। দুই শিক্ষার মধ্যে নিবিড় দেওয়া-নেওয়ার সংযোগ ছিল। উচ্চশিক্ষাকে বলা যেতে পারে শাস্ত্রিক শিক্ষা, আর লোকশিক্ষা হল তারই তরলীকৃত লোকায়ত সংস্করণ। উচ্চশিক্ষাকে যদি বলি বিশিষ্ট জ্ঞান, তাহলে লোকসাধারণের শিক্ষাকে বলতে পারি সাধারণ জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি: "য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল।...সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।" (শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা, র।১১।৬৮৯-৯০)

ইংরেজসৃষ্ট ব্যবস্থায় উচ্চবিত্তের জন্য বা শহুরে ভদ্রলোকের জন্য তৈরি হল ঔপনিবেশিক ইংরেজি শিক্ষা আর লোকসাধারণের জন্য লোকশিক্ষার বদলে রইল শূন্যতা, রইল অন্ধকার। থিয়োরি হল যে, সকলকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন নেই, উপরের স্তরের যারা শিক্ষা পাবে, তাদের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা চুইয়ে নিচের দিকে যাবে, নিচের স্তরের পক্ষে ঠিক যতোটুকু শিক্ষা আবশ্যক তা ওই চোয়ানো শিক্ষাতেই মিটে যাবে। এই চোয়ানো প্রতিক্রিয়াটিকে বলা হয়েছিল, শিক্ষার অভিস্যেচনক্রিয়া।

বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিস্যেচন থিয়োরির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন: "এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন 'ফিল্‌টর্‌ ডৌন্‌' করিবে। এ কথার তাৎপর্য এই

যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্ শিখাইবার প্রয়োজন নাই ; তাহারা কাজে-কাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে।" (বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃ ২২৩)

কেন এই থিয়োরি ভ্রান্ত বঙ্কিমচন্দ্র তার কারণও নির্দেশ করেছেন। "প্রধান কথা এই যে এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পরের সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন।...উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে।" (তদেব, ২২৪) বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, পার্থক্য প্রাচীন ভারতেও ছিল। সে হল বর্ণগত পার্থক্য। "এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুত্বভেদ জন্মিয়াছিল. এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।" (তদেব. ২২৫)

শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান বিষয়ে যেমন, ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশে ইংরেজি-শিক্ষিত এবং ইংরেজি-অশিক্ষিত এই দুই শ্রেণীর মানুষের দুস্তর দূরত্বের বিষয়ে যেমন, শিক্ষার অভিসেচন থিয়োরি ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের অভিমত পুরোপুরি বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি : "শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ. শিক্ষা, র৷১১৷৭০১)

প্রাচীন ভারতের বর্ণগত অসাম্য এবং তজ্জনিত ক্ষতিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। তাঁর কল্পনার প্রাচীন ভারতকে তিনি যথাসম্ভব শোধিত রূপেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে উচ্চশিক্ষা এবং লোকশিক্ষার মধ্যে বিদ্যালয়ের বাইরেই যে সব সংযোগের সূত্র ছিল, যেমন রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পাঠ, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন ইত্যাদি, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এই সংযোগসূত্রগুলির কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বলেছেন জনশিক্ষার সহজ পথ। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই পথগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন, "এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে।...ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না। তাহার স্থূল কারণ বলি – শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই, শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।" পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ, পৃ ৩৯৩-৪)

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত আর অশিক্ষিত

দুটি পৃথক্‌ জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার পথ রুদ্ধ হওয়াতে, অশিক্ষিত জনসাধারণ উত্তরোত্তর গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষিত অশিক্ষিতের বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথও তাই মনে করেন। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরও প্রধান অভিযোগ দুটি। এক, জনশিক্ষার সমস্ত পথকে লুপ্ত করে দেওয়া। দুই, শিক্ষিত শহরবাসী এবং অশিক্ষিত গ্রামবাসী, দেশকে এইভাবে দুই পৃথক জাতিতে পরিণত করে দেওয়া।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা তাঁর মুখেই শোনা যাক :

"কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে।·· এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে।···ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।" (শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা, র/১১/৬৯১-২)

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য আমরা একটু আগেই শুনতে পেয়েছি। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মন একেবারে এক তারে বাঁধা।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে অস্পৃশ্যতার কথা বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেই অস্পৃশ্যতা আজো—এই বর্তমান ভারতেও সমান সত্য। এই অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য এঁদের যে উৎকণ্ঠা তা আজো সমান জীবন্ত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রয়াসকে, তাঁর শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াসকে এই দিক থেকেই দেখতে হবে। শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্র স্কুল প্রতিষ্ঠাকেও (১৯২৪) এই প্রয়াসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আরো অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ যে 'লোকশিক্ষাসংসদ' গঠন করেছিলেন (১৯৩৬), তাও এই শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি দিক।

যে শিক্ষা কেবল উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের জন্য নয়, যে শিক্ষা কেবল শহরবাসীর জন্য নয়, যে শিক্ষা দেশের সমস্ত মানুষের জন্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই শিক্ষাই শিক্ষা। রুশদেশে সেই শিক্ষার আলোক সর্বত্র বিকিরিত হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ ওই দেশকে তীর্থস্থান বলে গণ্য করেছেন। মস্কোর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপের কালে (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) নিজের শিক্ষা-এক্সপেরিমেন্টের কথা বলতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের স্কুলের উপর জোর দেন নি, জোর দিয়েছেন শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের উপর। আশা করেছেন যে এই গ্রামীণ বিদ্যালয়টিই এক সময় ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে। (সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৩২-৪২ দ্রষ্টব্য।)

প্রাসঙ্গিক রচনা—

১। পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি ; ২। শিক্ষার বাহন ; ৪-৮। রাশিয়ার চিঠি (১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৮ম ও ৯ম পত্র) ; ৯-১২। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ (১ম, ২য়,

৩য় ও ৪র্থ রচনা) ; ১৩। পল্লীসেবা ; ১৪। শিক্ষার বিকিরণ ; ১৫। মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ; ১৬। শিক্ষর স্বাঙ্গীকরণ ; ১৭। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি—ইত্যাদি।

জ. স্ত্রীশিক্ষা

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দুটো বড়ো প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নটি আজ কালাতিক্রান্ত, প্রায় বাতিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আগের শতাব্দীতে এবং এই শতকেরও প্রথম দিকে প্রশ্নটি সকলের কাছেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রশ্নটি হল : স্ত্রীশিক্ষার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না।

আছে, এ বিষয়ে আজ প্রায় কারোই সংশয় নেই। সমাজের নিচের তলার দিকে তাকালে অবশ্য সংশয় নেই একথা তেমন জোর দিয়ে বলা যাবে না। বলা ভাল, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে শিক্ষিতের মনে আজ আর বিশেষ প্রশ্ন নেই।

যেদিন প্রশ্ন ছিল, সেদিনও এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুব স্পষ্টই ছিল। শিক্ষা যখন মনুষ্যত্বলাভের পথ তখন শিক্ষায় সকলেরই সমান অধিকার। এখানে ধনী দরিদ্রে ভেদ নেই, উচ্চ নিচে ভেদ নেই, ব্রাহ্মণ শূদ্রে ভেদ নেই—এবং পুরুষে নারীতেও ভেদ নেই। "যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।" (স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষা, র।১১।৬৩২)

দ্বিতীয় প্রশ্নের গুরুত্ব আজও কমে নি। প্রশ্নটি হল এই যে, পুরুষ ও নারীর শিক্ষা কি অবিকল একই রকম হবে।

মনুষ্যত্বে নারী ও পুরুষ এক। কিন্তু স্বভাবে সম্পূর্ণ এক নয়। শরীরে মনে জৈবতায় এরা পৃথক—পরস্পরের পরিপূরক। দুয়ের আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ এক রকম নয়। জীবনে দুয়ের ভূমিকা সম্পূর্ণ এক নয়। ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে যদি দেখি, দুয়ের সামাজিক ভূমিকা সম্পূর্ণ এক নয়, পারিবারিক ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভেদ আছে—বৃত্তিও দুয়ের সম্পূর্ণ এক হবার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার অকুণ্ঠ সমর্থক—এই জন্যই নয় যে তাতে পুরুষের লাভ বা তাতে সমাজের উপকার। সেটা আনুষঙ্গিক, এই জন্য যে নারীকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে, তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে হবে। কিন্তু নারী পুরুষে দেহে মনে কর্মে ব্যক্তিত্বে যে মৌলিক ভেদ আছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ভেদকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

অনেকে আশঙ্কা করেন শিক্ষা নারীপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করে দেবে। রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না। শিক্ষা যদি যথার্থ হয় তাহলে এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। "...আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি-বা কান্ট্‌হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।" (স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষা, র।১১।৬৩৩)

শিক্ষার সার্বভৌম দিক এবং জাতীয় শিক্ষার দিক এই দুই দিকই যেমন সত্য,

এখানেও তেমনি শিক্ষার সাধারণ এবং বিশেষ এই দুই দিকের সত্যকে স্বীকার করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই বলি—

"…শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, একথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষে পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে…।" (তদেব)

কিন্তু এই বিশেষত্ব পুরুষের সুবিধার দিকে তাকিয়ে নয়, মেয়েদের নিজস্ব ভূমিকার গরজে, মেয়েদের নিজস্ব স্বভাবের গরজে। এই রন্ধ্র পথেই কিন্তু অনেক সময় এমন কুযুক্তি এনে উপস্থিত করা হয় যা নারীমুক্তির পরিপন্থী, নারী-ব্যক্তিত্বের বিকাশের বাধা। এই কুযুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই প্রশ্রয় দেন নি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "…স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব ; দাসী হওয়া নয়।" (তদেব, ৬৩৪)

বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই, ব্যবহারিক শিক্ষাও এমন হওয়া চাই যে, "…পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার 'সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।'" (তদেব, ৬৩৫)

প্রাসঙ্গিক রচনা—

১। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' থেকে ; ২। স্ত্রীশিক্ষা ; ৩। ক্ষিতীশচন্দ্র দত্তকে পত্র ; ৪। ভক্তিদেবীকে পত্র - ইত্যাদি।

ঝ. শিক্ষা ও শিক্ষায়তন

(অ) শিক্ষার্থী

(আ) শিক্ষণীয় বিষয়—পাঠক্রম :
বিজ্ঞানশিক্ষা, চারুশিল্প, ধর্মশিক্ষা, নৈতিক আদর্শ, গঠনমূলক আদর্শ—ইত্যাদি

(ই) শিক্ষক বা গুরু

(ঈ) শিক্ষাপ্রণালী
অনুশীলন, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা

(উ) বিদ্যালয়, পরিবেশ, প্রকৃতি

(ঊ) বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন

শিক্ষা ও শিক্ষায়তন সংক্রান্ত বিষয়গুলি সবই তত্ত্বে এবং প্রয়োগে মেলানো। এই সব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমাদের পূর্বের আলোচনার মধ্যেই অল্পবিস্তর নিহিত আছে। স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত আলোচনার খুব বেশি প্রয়োজন নেই, সংক্ষেপে মূল কথাগুলিকে স্পর্শ করে গেলেই আমাদের কাজ হবে।—

প্রথমেই বলা দরকার, শিক্ষা একটা সামগ্রিক ব্যাপার—অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং প্রায় জীবন্ত সমগ্রতা। জীবন্ত এই জন্যে যে তার কেন্দ্রে আছে জীবন্ত মানুষ—শিক্ষার্থী বা ছাত্র। বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার বিভিন্ন অংগের কথা বলা যাবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কোনো বিশিষ্ট অংগে নয়।

শিক্ষার সর্বপ্রধান অংগ শিক্ষার্থী, সব থেকে গুরুত্ব তার, সব কিছু তার বিকাশের জন্য। এবং যেহেতু বিকাশটাই প্রধান কথা, শিক্ষা কখনোই 'শিক্ষণীয় বিষয়ে' সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তথাকথিত শিক্ষণীয় বিষয় বা পাঠক্রম সমগ্র শিক্ষাব্যাপারের একটি অংশ মাত্র। এই সত্য স্মরণ রেখে আমরা শিক্ষা ব্যাপারটিকে চারটি অংগে ভাগ করে নিতে পারি: (১) শিক্ষার্থী, (২) শিক্ষণীয় বিষয়, (৩) শিক্ষক বা গুরু, এবং (৪) শিক্ষাপ্রণালী। আরো একটি এর সংগে যুক্ত করে নেওয়া যায়—(৫) শিক্ষায়তন বা বিদ্যালয়।

শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম-যৌবন, শিক্ষার্থীর জীবনের এই চারটি প্রধান পর্বের প্রত্যেকটিতে শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষা, বোধ, অনুভব স্বতন্ত্র, প্রয়োজন স্বতন্ত্র। প্রত্যেক পর্বে তার ভূমিকা স্বতন্ত্র—পরিবারে, বিদ্যালয়ে, সমাজে—সর্বত্র। প্রতি পর্বে তার শিক্ষায়তন পৃথক, শিক্ষকের সংগে তার সম্পর্কও পৃথক। সব থেকে বড়ো কথা, প্রত্যেক পর্বে তার ব্যক্তিত্ববিকাশের রূপও আলাদা। সুতরাং প্রতি পর্বের শিক্ষাসমস্যাও অল্পবিস্তর আলাদা।

এক দিক থেকে এর মধ্যে শৈশব ও বাল্যের পর্বই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এইটেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বগঠনের প্রথম এবং সমস্যাসংকুল ধাপ। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর তা শিশু এবং বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ই ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় এই প্রথম দুটি পর্বই প্রাধান্য পেয়েছে।

একটা ক্ষেত্রে পর্বে পর্বে ভেদ নেই। সেই ক্ষেত্রটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি পর্বেই শিক্ষাকে মানুষের স্বধর্ম সাধনের পথ হতে হবে। সেই কারণেই শিক্ষাকে সৃজনশীল হতে হবে, শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন জিজ্ঞাসার অবকাশ থাকতে হবে, শিক্ষাকে আনন্দময় হতে হবে। আনন্দ যে শিক্ষার অপরিহার্য সংগী, স্বাধীনতা যে শিক্ষার অপরিহার্য শর্ত, সৃজনশীলতা যে শিক্ষার উচ্চতম লক্ষ্য, মনুষ্যত্ব-বিকাশ যে সৃজনশীলতাকে কেন্দ্র করেই, এটা শিক্ষার্থীর জীবনের সমস্ত পর্বের পক্ষেই সমান সত্য।

বিদ্যালয়-পরিবেশের প্রশ্ন, যন্ত্রবদ্ধ নগরজীবনের পরিবেশ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুক্তি দেবার প্রশ্ন, শিক্ষায় প্রকৃতির স্থান নিয়ে যে প্রশ্ন—এই সব প্রশ্নকে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই আনন্দ এবং মুক্তির সংগে মিলিয়ে দেখেছেন। বিদ্যালয়ের চারদেয়ালে ঘেরা অসুন্দর নিরানন্দ কক্ষ, নীরস পাঠক্রম, গতানুগতিক শৃংখলাবদ্ধ রুটিন, নিয়মের জন্য নিয়ম—ছাত্রের নিরুপায় বন্দীদশা—এই ভয়ংকর অপচয় ও বিড়ম্বনা থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করা রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সাধনা। সহজেই বোঝা যায়, কী বিদ্যালয়-পরিবেশ, কী প্রকৃতির গুরুত্ব, কী পাঠক্রম, কী শৃংখলা—সমস্তই শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সংগে সংগত।

শৃঙ্খলার প্রয়োজন নেই এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। সাধনা মাত্রেই নিষ্ঠা, শ্রম, অধ্যবসায় এবং শৃঙ্খলাসাপেক্ষ। কিন্তু সে শৃঙ্খলা নিজের মধ্য থেকে উদ্ভূত শৃঙ্খলা, বাইরের থেকে চাপানো শৃঙ্খলা নয়। 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধে (শিক্ষা, র৷১১৷৬৪৭-৫৭) ছাত্রদের শাসন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। "জেলখানার কয়েদির বেলায় আমরা নিয়মের কড়াকড়ি করি, কেননা তাদের আমরা অপরাধী হিসেবে দেখি, মানুষ হিসেবে দেখি না। ফৌজের সিপাইদের বেলায় নিয়মের কড়াকড়ি করা হয়, কারণ তাদের আমরা যন্ত্র হিসেবে দেখি, মানুষ হিসেবে দেখি না। "কিন্তু, ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এই জন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না‥" (তদেব, ৬৪৯)

ওই প্রবন্ধ থেকেই আর-একটু উদ্‌ধৃত করি।—

"ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে ; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই ; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বের দিকে উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণমনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল ; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না/ যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না।" (তদেব, ৬৫০)

প্রবন্ধের শেষে বলেছেন—

"শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদিরা হাতে বেড়ি পড়িয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ।" (তদেব, ৬৫৭)

'জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ'—এইটে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের একটা প্রধান কথা। শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এর সংযোগ অচ্ছেদ্য। আদর্শ শিক্ষকের প্রসঙ্গকে দেখতে হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। শিক্ষক স্থলে অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথ গুরু কথাটি গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু কখনোই তাঁকে আমাদের পরিচিত ধর্মগুরুর আসনে বসান নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পিত তপোবনের কেন্দ্রস্থলে মনে মনে যে গুরুকে বসিয়েছেন, তাঁকেও তিনি শিক্ষার সজীব আদর্শের সঙ্গে মিলিয়েই কল্পনা করেছিলেন। যেমন—

"দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে ; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি

প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ।" (আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা, র।১১।৭১১)

এই রকম শিক্ষকই তিনি তাঁর নিজের বিদ্যালয়ের জন্য কামনা করেছিলেন। তাঁর এমনও মনে হয়েছে যে, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের কাছ থেকে যে "নিত্যজ্ঞানরূপ মানবচিত্তের" সঙ্গ পায়, সেইটেই শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান।" (তদেব)

ওই একই প্রবন্ধে (আশ্রমের শিক্ষা) তিনি আরো বলেছেন—

"যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেওয়ার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।" (তদেব, ৭১১-১২)

এই কথাটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের একটি মূল্যবান সত্য। যার মধ্যে সহানুভূতি নেই, সমমর্মিতা বা এম্‌প্যাথি নেই, যার কল্পনাশক্তি নেই, যিনি মিলতে এবং মেলাতে পারেন না, যাঁর মধ্যে আনন্দের উৎস নেই, সৃজনশীলতার উৎসার নেই, মুক্তির সজীবতা নেই, তিনি গুরু হবার যোগ্য নন। তা যাঁর আছে তেমন গুরু কখনোই অথরিটেরিয়ান নন, কেননা তিনি মুক্ত মনের সাধক। যেমন রবীন্দ্রনাটকের গুরু বা ঠাকুর্দা। তেমন গুরু কখনোই শৃঙ্খলার জন্য শৃঙ্খলার সাধক নন, নিয়মের জন্য নিয়মনিষ্ঠ নন।

এ থেকে আমরা শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধেও সহজেই একটা ধারণা করে নিতে পারি। শিক্ষাপ্রণালী অথরিটেরিয়ান হবে না, শাসনতান্ত্রিক হবে না, শৃঙ্খলাসর্বস্ব হবে না— মুক্ত মনের বিকাশের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালী হবে। কথাটা শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেও সমভাবেই প্রযোজ্য। বিষয়ও যেমন তথ্যসর্বস্ব নয়, শিক্ষাপ্রণালীও তেমনি স্মৃতিনির্ভর হবে না। এ কথা কখনোই বলব না যে, আবৃত্তি সর্ববিষয়েই 'বোধাদপি গরীয়সী'। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে বলি—

"নানা আলোচনা নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে— যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন—সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বন্ধ হইতে হয় না।"

(ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, আত্মশক্তি ও সমূহ, র।১২।৭২৬)

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা বা নৈতিক আদর্শের প্রচার বা নীতিশিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি কিছু বলেন নি। বলা স্বাভাবিকও নয়। শিক্ষার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মের উপর জোর দিয়েছেন তা হল মানুষের স্বধর্ম অর্জন বা মনুষ্যত্বলাভ। কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতিই তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল না। সমস্ত শিক্ষাই যেখানে মানব-ধর্মের বিকাশের প্রয়াস, তখন আলাদা করে ধর্মশিক্ষার আর কতটুকুই বা অবকাশ থাকে? নীতিশিক্ষার কথাও তাই। শিক্ষার সমগ্র ব্যাপারটাই তো মানব-নীতির

সাধনা, সমস্ত শিক্ষার মধ্যেই নীতিশিক্ষা অনুস্যূত, আলাদা করে নীতিশিক্ষার ক্ষেত্র কোথায় ?

শিক্ষণীয় বিষয়কে বৃত্তিবিকাশের সঙ্গে মিলিয়ে জ্ঞানাত্মক, ভাবাত্মক বা নান্দনিক এবং কর্মমুখী বা ব্যবহারিক; এই তিন গোত্রে ভাগ করে নিতে পারি। জ্ঞানাত্মক বিষয়ের সম্পর্কে নতুন করে বলার বিশেষ কিছু নেই। বিজ্ঞানশিক্ষা ও চারুশিল্প বা কলাবিদ্যা বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানে প্রয়োগবিদ্যায় যেমন উৎসাহী, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চাতেও তেমনি—বোধকরি আরো বেশি আগ্রহী। শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞান নয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজ্ঞানও নয়, রবীন্দ্রনাথের সমানই আগ্রহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, তাঁর সমানই আগ্রহ ছাত্ররা যাতে বৈজ্ঞানিক জীবনদৃষ্টি অর্জন করতে পারে, তারা যাতে প্রশ্ন, পরীক্ষা, যাচাই এবং যুক্তি ও বিচারের উপর আস্থাশীল হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের বিজ্ঞানবিষয়ক যে ক্ষুদ্র পাঠ্যপুস্তকটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন, সেই 'বিশ্বপরিচয়' বইটির ভূমিকায় (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে চিঠি) তিনি লিখেছেন—

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।" র।১৪।৮২১

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তিতে তিনি লিখেছেন,—

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।"

এইবারে কলাবিদ্যার কথা—চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি চারুশিল্পের কথা। বলা বাহুল্য, এর প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র বিষয় রূপেই শিক্ষণীয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি অল্পবিস্তর বৃত্তিমুখী, সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে বৃত্তি রূপেও শিক্ষণীয়। কিন্তু সেখানে এদের দাবি আবশ্যিক বিষয় রূপে নয়, ঐচ্ছিক বিষয় রূপে। কিন্তু যে পাঠক্রমে নান্দনিক দিককে কোনো স্থান দেওয়া হয় নি, তা যে পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রমই নয়, তাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশই যে অসম্পূর্ণ থাকে, এই সত্যের উপর জোর দেওয়াটা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের একটা বড়ো বিশেষত্ব।

পাঠক্রমের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সূত্রাকারে পর পর উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম কথা, পাঠক্রমের সীমানা নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু পাঠের সীমা যেন পাঠক্রমেই আবদ্ধ না হয়। "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না…।" শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা, র।১১।৫৩৭)

দ্বিতীয় কথা, পাঠক্রম কেবল জীবিকার ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকবে না, জ্ঞানের জন্য জ্ঞান শিক্ষার একটি প্রধান দিক।

তৃতীয় কথা, শিক্ষা শুধু জ্ঞানচর্চা নয়, জ্ঞান ভাব কর্ম তিনেরই সাধনা। পাঠক্রম সেই ভাবেই রচিত হবে। অর্থাৎ সংগীত, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, নৃত্য ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে।

চতুর্থ কথা, পাঠক্রম যেন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়, তা যেন জাতীয়জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পঞ্চম কথা, মাতৃভাষা ছাড়া এই যোগ সম্ভব নয়। যথার্থ সৃজনশীল শিক্ষাও মাতৃভাষা ছাড়া সম্ভব নয়।

ষষ্ঠ কথা, পাঠক্রমকে অবলম্বন করে পাঠক্রমের বাইরে গিয়ে দেশের চিত্তের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে, পাঠক্রমে এবং শিক্ষাপরিমণ্ডলে দেশীয় সাহিত্যের জন্য একটি বড়ো স্থান সংরক্ষিত রাখতে হবে।

সপ্তম কথা, কর্মসাধনাকে, পারস্পরিক সহযোগিতাকে পাঠক্রমে অথবা তার পাশাপাশি সমান গুরুত্বে স্থান দিতে হবে। এই কর্মের সূত্রেই ছাত্রেরা চারপাশের সমাজজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবে।

বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁর বক্তব্য বলেছেন। বিদ্যালাভের এমন এক ক্ষেত্র রচনা করা—যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্। প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ কী তাও বিশ্বভারতীর সূত্রে বার বার বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে—এবং বলা বাহুল্য বিশ্বভারতীকে তাবৎ বিদ্যার এবং বিশ্বের তাবৎ দেশের বিদ্যার্থীর মিলনের কেন্দ্র হতে হবে। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' প্রবন্ধে (শিক্ষা, র।১১।৬৮৪) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে।" এই আতিথ্য আজ ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই কথা স্মরণ করেই 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে (শিক্ষা, র।১১।৬৭৭) স্পষ্ট করে বলেছেন, "এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।"

বলা নিষ্প্রয়োজন বিশ্বভারতী এই কামনারই অভিব্যক্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর একটি কামনা প্রকাশ করেছেন যে, তা সজীব হবে। তা শুধু বিদ্যা বিতরণ করবে না, বিদ্যা উদ্ভাবনও করবে। শেষেরটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।—

"শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন।" (বিশ্বভারতী, র।১১।৭৪৭)

আদর্শ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে—বা সোজা কথায় বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে অপর যে কামনাটি বার বার আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে, তা হল এই যে বিশ্বভারতী একদিন যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হবে, অন্যদিকে তা যেন খাঁটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়, জাতীয়জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—

"...সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের

দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।" (তদেব, র।১১।৭৪৭-৪৮)

শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৮ বছর পরের এবং শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পূর্বের এই ভাষণে (বৈশাখ ১৩২৬, ইং ১৯১৯) যে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে কি না, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জেগেছে। যেভাবে পল্লীজীবনের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার কথা বলেছেন—'যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে', শিক্ষাকে যেভাবে তার মাঝখানে এনে স্থাপন করার কথা বলেছেন, তিনি বুঝেছেন, শান্তিনিকেতনে তা পুরোপুরি ঘটা সম্ভব নয়। সেই কারণে পল্লীজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে, কেবল জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান রূপে নয়, কর্মের সঙ্গে সমন্বিত, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীনিকেতন-প্রয়াসের সাফল্য-অসাফল্য আমাদের আলোচ্য নয়। শিক্ষায় যে আমূল পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল, তা শুধু শ্রীনিকেতনের জন্য নয়, তা সারা দেশের জন্য। শ্রীনিকেতন-প্রয়াস তার মূল্যবান দিগ্‌দর্শনী। কাজের সিদ্ধি অথবা কাজের অসিদ্ধি দিয়ে তার বিচার হয় না।

প্রাসঙ্গিক রচনা

[শিক্ষা ও শিক্ষায়তন বিষয়ে—শিক্ষার্থী, শিক্ষণীয় বিষয় ও পাঠক্রম, শিক্ষক বা গুরু, শিক্ষাপ্রণালী, বিদ্যালয় পরিবেশ, আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক প্রায় সমস্ত রচনাতেই—অল্পবিস্তর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। এ রকম ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক রচনার নির্দেশ খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এখানে মাত্র মূল্যবান নমুনা হিসেবেই কয়েকটি রচনার নির্দেশ দেওয়া গেল। জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, এ তালিকা নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

১। প্রসঙ্গকথা (তিনখানি পত্র) ; ২। পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি ; ৩। শিক্ষা-

সমস্যা ; ৪। শিক্ষাসংস্কার ; ৫। জাতীয় বিদ্যালয় , ৬। তপোবন ; ৭। লক্ষ্য ও শিক্ষা ; ৮। শিক্ষার মিলন ; ৯-১০। জগদানন্দ রায়কে পত্র (২) এবং (৩) ; ১১-১২। অজিত কুমারকে পত্র (১) এবং (২) ; ১৩। সন্তোষ মজুমদারকে পত্র ; ১৪-২২। বিশ্বভারতী (১), (২), (৪), (৬), (১০), (১১), (১৪), ১৭) এবং (১৮) ; ২৩। অসন্তোষের কারণ ; ২৪। বিদ্যার যাচাই ; ২৫। আকাঙ্ক্ষা ; ২৬। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ (২) ; ২৭। শিক্ষার বিকিরণ ; ২৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ; ২৯। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ; ৩০। শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি ; ৩১। আশ্রমের শিক্ষা ; ৩২। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ; ৩৩। স্ত্রীশিক্ষা ; ৩৪। কলাবিদ্যা ; ৩৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান ; ৩৬। শিক্ষার আদর্শ ; ৩৭। ধর্মশিক্ষা ; ৩৮। মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ; ৩৯। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ; ৪০। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ ; ৪১। আশ্রমের শিক্ষা ; ৪২। ছাত্রশাসনতন্ত্র ; ৪৩। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি ; ৪৪। **The School Master** ; ৪৫। **A Poet's School** ; ৪৬। **My Educational Mission** ; ৪৭। **Letter to L. K. Elmhirst**— ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ

শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্র-রচনাসংকলন

১। মেঘনাদবধ কাব্য

ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৪ (১৮৭৭)

…বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল—ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই।

[রবীন্দ্র রচনাবলী, পঃ বঃ সরকার ১৫শ খণ্ড, পৃ—১১৯]

টীকা :

মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপর রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা লেখেন। ১২৮৪ (১৮৭৭) সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম বর্ষে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৬ বছর।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষা প্রণালী

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. প্রসঙ্গ কথা—১ নং (তিনখানি পত্র)।
২. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি।
৩. শিক্ষা সংস্কার।
৪. শিক্ষা সমস্যা।
৫. আবরণ।
৬. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)।
৭. শিক্ষাবিধি।
৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা।
৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং।
১০. অসন্তোষের কারণ।
১১. বিশ্বভারতী ২নং।
১২. বিদ্যার যাচাই।
১৩. আকাঙ্ক্ষা।
১৪. বিশ্বভারতী ৬নং।
১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি।
১৬. আলোচনা।
১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা।

১৮. জনৈক অধ্যাপককে পত্র।
১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং।
২০. শিক্ষার বিকিরণ।
২১. বিশ্বভারতী ১৭ নং।
২২. আশ্রমের শিক্ষা।
২৩. The Poet's School.
২৪. The School Master.
২৫. তোতাকাহিনী।
২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং।

২। ন্যাশনল ফণ্ড

[ভারতী, কার্তিক ১২৯০ (১৮৮৩) পৃ-২৮৯—৯৫]

…সম্প্রতি ন্যাশনল ফণ্ড্ নামে আর একটা কথা শুনা যাইতেছে।…
শুনা যাইতেছে একমাত্র Political agitation-ই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।…

…এই কাজটার ভার কাহাদের উপরে, এবং তাঁহারা কি উপায়ে ইহা সাধন করিতেছেন? যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা অবহেলা করেন; বাঙ্গালা ভাষা জানেন না; ইংরাজী ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন করাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; তাঁহারাই ইহার প্রধান। গোড়াতে ইহার নামই হইয়াছে national fund; ইংরাজিতেই ইহার উদ্দেশ্য প্রচার হইয়াছে, আজ পর্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে। অথচ মুখে বলা হইতেছে, Peopleরাই আমাদের সহায়, People-দের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, People-দের উপরই আমাদের ভরসা! এ সব ভাণ করিবার দরকার কি? People-রা যে তোমাদের কথাই বুঝিতে পারে না। ইংরাজি ভাষায় তোমাদের তর্জন গর্জন শুনিয়া সে বেচারিরা যে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে! তোমরা যদি তাহাদের ভালবাসিতে, তবে তাহাদের ভাষা শিখিতে…।

…আজ গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন দিয়াছেন, কিন্তু ভিক্ষার মত দিয়াছেন, অনুগ্রহের মত দিয়াছেন, যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দিয়াছেন; এ বিষয়ে যেন নানা সংশয় আছে, নানা বিবেচনার বিষয় আছে, কাল যদি দেখা যায় এ প্রণালী ভাল খাটিল না, তবে কালই হয়ত ইহা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা সমস্ত জাতি এই স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর জন্য আগে প্রস্তুত হইতে পারিতাম, তবে এ অধিকার আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতাম ও গবর্ণমেন্টকে অবিচারে দিতে হইত। এইরূপ প্রস্তুত হইবার উপায় কি? তাহার এক উত্তর আছে বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি কেবল গুটি দুই তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় নিদেন গুটী কতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়; এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজি লিখিলে

কিম্বা ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলে ইটি হয় না! ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ কর, বাঙ্গালাসাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কি কথা কহিতেছ, সমস্ত জাতিকে একবার দাবী করিতে শিখাও কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে, Political agitation-এর দ্বারা হইবে না।…

টীকা :

ন্যাশনল ফন্ড

১২৯০ সালে (৪ঠা জুলাই ১৮৮৩) রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়তাকল্পে Indian Mirror পত্রিকায় 'ন্যাশনল ফন্ড' বা জাতীয় তহবিল খোলার প্রস্তাব হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় মন্তব্য :

মাতৃভাষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. শিক্ষার হেরফের।
২. প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)।
৩. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।
৪. বাংলা শিক্ষার অবসান।
৫. ইংরেজি শেখা।
৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।
৮. শিক্ষার বাহন।
৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ।
১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ।
১১. ছাত্রসম্ভাষণ।
১২. বাংলাশিক্ষার প্রণালী ইত্যাদি।

৩। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি

['য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র ১ম খণ্ডের দ্বিতীয়াংশ; বৈশাখ ১২৯৮। 'সমাজ' (গদ্যগ্রন্থাবলী ১৩শ, ১৩১৫) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পৃ: ৫২-৫৬।]

…সম্প্রতি সমাজের নানা বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটছে। দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মত বোধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে

না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে' উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।

অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হ'লে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে ইংরাজি যে জানে এবং ইংরাজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মত দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর এক জনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন। এই জন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে' থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।

এই জন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে; কারো বক্তৃতায় নয়, কর্তব্য-জ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।

এখন, অন্তরে বাহিরে এই ইংরাজি শিক্ষা প্রবেশ করে' সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত করবেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সম্বরণ করে, পরম পাশ্চাত্ত্যলোক লাভ করব—আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।

কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে কিন্তু তার সমস্ত অনুকূল অবস্থা এনে দিতে পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পেতে পারি কিন্তু ইংলণ্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।...

...বর্তমান কালে যাঁরা বলেন আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হ'তে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে' বসে' থাকব, কিম্বা যাঁরা বলেন হঠাৎ-শিক্ষার বলে আমরা আতসবাজির মত এক মুহূর্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে' সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্ক-লোকে গিয়ে হাজির হব তাঁরা উভয়েই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করছেন।

কিন্তু সহজ-বুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে শিকড়-উৎপাটন করে'ও আমরা বাঁচবনা এবং যে-ইংরাজি শিক্ষা আমাদের চতুর্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্ছে তাও আমাদের শিরোধার্য করে' নিতেই হবে।...

টীকা :

১৮৯০ সালে দ্বিতীয় বার বিলেত ভ্রমণ উপলক্ষে রচিত। প্রথমে ১৮৯১ সালে সাধনাতে প্রকাশিত।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

স্ত্রীশিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. স্ত্রীশিক্ষা। ২. ভক্তিদেবীকে পত্র ইত্যাদি।

৪। শিক্ষার হেরফের

[রচনা—অগ্রহায়ণ ১২৯৯, নভেম্বর ১৮৯২, প্রকাশ—সাধনা, পৌষ ১২৯৯]

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, পাস দিয়া, কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুত বেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া, পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।...

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায় মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি. এ. এম. এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে ; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিক-শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক তো, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার 'পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে; সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো একটা শিশু-পাঠ্য রীডারে hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে; ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক। অথবা snowball খেলায় চার্লি এবং কেটির মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাৎড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নীচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্‌ট্রেন্‌স্ পাস, কেহ বা এন্‌ট্রেন্‌স্ ফেল; ইংরাজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরাজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না।—**Horse is a noble animal**: বাংলায় তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরাজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়? ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূত-রকম হয় না; এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরাজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত, অল্প বয়সে আমরা যে ইংরাজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনো-প্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়; কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না; মাস্টারও বলে ছাত্রও বলে, 'আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোনো মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাকরি জোটে।'...

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী? যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত—গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতিজননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া, শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ

করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে; মনুষ্য যেখান হইতে জীবন বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে—যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা, সর্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়? ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতা-মাতার হৃদয়ে স্নেহসঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়? বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই. আনন্দ নাই, অবকাশ নাই; নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার একতিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন্ শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে. নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না?...

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না, এ. কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরাজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরাজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্‌ট্রেন্‌স্ এবং ফার্স্ট-আর্ট্‌স্ পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরাজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়; তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই. শক্তিও নাই—সবগুলা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না ইহার অর্থ এই যে স্তূপ উঁচা করিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না।

...সংগ্রহযোগ্য জিনিসটা যখনি হাতে আসে তখনি তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার

প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ এক দিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর-এক দিকে জমা হইতেছে; খাদ্য এক দিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর এক দিকে আপনার জারক রসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে—আমাদের দেশে এই একপ্রকার অদ্ভুতপূর্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব, ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙা, কেবলই ঠেঙালাঠি মুখস্থ এবং এক্‌জামিন—আমাদের এই 'মানব-জনম'-আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে, এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না। বয়োবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা-সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ'। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে—যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতুহল চারি দিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে—তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও—য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও—সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরাজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদিবা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি, কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে

আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না ; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।…

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে; আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

…আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক এক দিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্য দিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছে—এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন—এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জীবনকে ভাবের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না; কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি-সাধনেই ব্যস্ত—তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।…

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।…

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকটসংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোক য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্য দিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, 'বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।' প্রকৃত কথা আঙুর আয়ত্তের

অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি, দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, 'আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি-যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি, এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।'

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র, কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য ; নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।...

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ৭—১৯

টীকা ঃ

শিক্ষার হেরফের—১২৯৯, অগ্রহায়ণ (১৮৯২, নভেম্বর) মাসে রবীন্দ্রনাথ রাজসাহীতে লোকেন পালিতের নিকট অতিথিরূপে বাস করেন। প্রমথ চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজসাহীতে গিয়েছিলেন। রাজসাহীতে সেই সময়ে অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক ছিলেন। রাজসাহীতে তৎকালীন এসোসিয়েশন থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ তখনকার বহু মনীষীর কাছে সমাদৃত হয়। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন,—"..শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।" [প্রসঙ্গকথা, তিনখানি পত্র, সাধনা, ১২৯৯—১৩০০, পৃ—৪৪০—৪১]।

জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতীয় র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসুও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধোক্ত মতগুলিকে পত্রে বিশেষভাবে সমর্থন করেন। উক্ত প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গকথা (তিনখানি পত্র)' এবং 'পূর্ব' প্রশ্নের অনুবৃত্তি' দুটি প্রবন্ধ লেখেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

মাতৃভাষা, শিক্ষা ও জীবন

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. ন্যাশনল ফণ্ড। ২ প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি। ৪. বাংলা শিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)। ৫. ইংরেজি শেখা। ৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৮. শিক্ষার বাহন। ৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। ১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। ১১ ছাত্রসম্ভাষণ। ১২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ১নং। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪ বিশ্বভারতী ৪নং। ১৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ১৬. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ১৭. শিক্ষার সার্থকতা। ১৮. আবরণ। ১৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ২০. বাংলা শিক্ষার প্রণালী ইত্যাদি।

৫। প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)

[সাধনা, চৈত্র ১২৯৯ (১৮৯৩)]

...দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনও গতি নাই, এ-কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে, কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল বাংলাই চলিবে; যাহা কিছু বাংলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশ্ব ওই বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে।

ভালোরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলাকে বুদ্বুদ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোকপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনও মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এইরূপ ধবলাকার,

একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।

শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।

এ-সব কথা ইতিহাসে অনেকবার আলোচিত হইয়া গেছে, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও এ-কথা লিখিয়াছেন। জর্মানিতে যতদিন না মাতৃভাষার আদর হইয়াছিল ততদিন তাহার যথার্থ আত্মাদর এবং আত্মোন্নতি হয় নাই। শিক্ষাসভার যে-সভ্যগণ মাতৃভাষার প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন তাঁহারা এ-সমস্ত উদাহরণ অবগত আছেন, সেইজন্যই কথাটা তাঁহাদের বুঝানো আরও কঠিন, কারণ, বুঝাইবার কিছু নাই।

আর-একটা যুক্তি আছে। এতদিনকার ইংরেজি শিক্ষাতেও শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত মানসিক বিকাশ দেখা যায় না। তাঁহারা এমন একটা কিছু করেন নাই যাহাকে পৃথিবীর একটা নূতন উপার্জন বলা যাইতে পারে, যাহাতে মনুষ্যজাতির একটা নূতন গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ ভাল ইংরেজি বলেন, কেহ কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করেন, কিন্তু ধাত্রীর অঞ্চল ছাড়িয়া কেহ এক পা হাঁটিতে পারেন না।

তাহার প্রধান কারণ, বিদেশী ভাষার ভার বড়ো গুরুতর। একজনের খোলস আর একজনের স্কন্ধে চাপাইলে সে কখনোই তাহা লইয়া বেশ স্বাধীন সহজভাবে চলিতে পারে না। আমাদের ভাবকে বিদেশী ভাষার বোঝা কাঁধে লইয়া চলিতে হয়, প্রতি পদে পদস্খলনের ভয়ে তাহাকে বড়ো সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়, কোনোমতে মান বাঁচাইয়া বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে পারিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু ততটুকু করাই এত কঠিন যে, সেইটুকু সুসম্পন্ন করিলেই পরম একটা গৌরব অনুভব করা যায়, সেটাকে খুব একটা মহৎ ফললাভ বলিয়া ভ্রম হয়। অন্যদেশে একটা বড়ো কাজের যতটা মূল্য, আমাদের দেশে একটা অবিকল নকলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। এতটা করিয়া যাহা হইল তাহা যে কিছুই নহে, এ-কথা লোককে বোঝানো বড়ো শক্ত। এইজন্য মুখুয্যের ছেলেকে গড়গড় শব্দে ইংরেজি বক্তৃতা করিতে শুনিলে বাঁড়ুয্যের ছেলেকেও সেই চূড়ান্ত গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে তাহার বাপের প্রবৃত্তি হয় না। তখন যদি তাহাকে বুঝাইতে বসা যায় যে, বার্ক্‌ ব্রাইট্‌ গ্লাডস্টোনের ভাষার সহিত প্রচুর পরিমাণে পানাপুকুরের জল মিশাইয়া একটি বঙ্গশাবক যে বহুকষ্টে অথবা অল্পায়াসে গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর কথা বলিয়া গেল, উহাতে কোনো কাজই হইল না, উহা না আমাদের দেশের অন্তঃকরণে স্থায়ী হইল, না বিলাতী সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল—কেবল নিষ্ফল শিলাবৃষ্টির ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী চট্‌পট্‌ শব্দের করতালি আকর্ষণ করিয়া শস্যবীজহীন পথকর্দমের সহিত মিশাইয়া গেল ; উহা অপেক্ষা বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টারও সহস্রগুণ সফলতা আছে।—তবে এ-সব কথা বাঁড়ুয্যের কর্ণে স্থান লাভ করে না, মুখুয্যের ছেলের ইংরেজি ফাঁকা আওয়াজের কাছে স্বদেশের সমস্ত দাবি তাহার নিকট এতই ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বুঝাইবার পক্ষে আর-একটা বড়ো বাধা আছে। অনেকে এমন কথা মনে করেন, আমরাও তো আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়াছি ; কই আমাদের মানসিক ঔৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের মনে তো কখনও তিলমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় না। বুঝিতে পড়িতে কহিতে বলিতে আমরা তো বড়ো কম নহি।

সে-কথা অস্বীকার করিয়া কাজ নাই। তাঁহাদিগকে বলা যাক, আপনারা কিছুতেই ন্যূন নহেন। কিন্তু আরও ঢের বেশি হইতে পারিতেন। এখনই যদি আপিসের কাজ সুশৃংখল-মতো নির্বাহ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেছেন, বিদেশী ভাষার বাধা অতিক্রম করিতে না হইলে না জানি কী হইতেন এবং কী করিতেন। তাঁহাদিগকে আরও বলা যাইতে পারে যে, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। আপনারা যে এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এত বড়ো হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আপনাদেরই বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে, শিক্ষাপ্রণালীর নহে। কিন্তু দেশের সকলেই তো আপনাদের মতো হইতে পারে না।

শিক্ষায় স্বদেশী ভাষা অবলম্বন করিলে কেন যে মনের বিশেষ উন্নতি হয় সে-কথা পূর্বে বলিয়াছি। যে-সৌভাগ্যবান সভ্যজাতিরা দেশীভাষায় শিক্ষালাভ করে তাহারা প্রথম হইতেই ধারণা করিবার চিন্তা করিবার অবসর পায়। আরম্ভ হইতেই তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে। কেবল যে কতকগুলা মুখস্থ জ্ঞান অর্জন হয় তাহা নহে, মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।……কোনো কোনো ইংরেজ অধ্যাপক আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বাঙালি ছাত্রের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির কোনো লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে-কথা সত্য। কিন্তু কচুর আবাদ করিয়া, কলার কাঁদি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরিতাপ করা শোভা পায় না। ঢেঁকির কাষ্ঠ নিয়মিত পদাঘাত দ্বারা চালিত হইয়া অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া সুচারুরূপে ধান ভানিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পাতা গজায় না, ফল ফলে না। এ জন্য অন্য যে-খুশি আক্ষেপ করুক, কিন্তু যে-ছুতার সজীব গাছ কাটিয়া এই নির্জীব ঢেঁকি বানাইয়াছে সে কেন বিস্মিত হয়। মানুষের মনকে যদি মনরূপে বাড়িতে দিতে তবেই তো মধ্যে মধ্যে ওরিজিন্যালিটি বিকাশ লাভ করিত, কিন্তু শিশুকাল হইতে তাহাকে যদি যন্ত্ররূপে পরিণত করিলে তবে সে নিরুপায় হইয়া কেবল শেখা-কথা আওড়াইতে এবং অভ্যস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করি, জর্মানি যখন ফরাসি শিখিত, তখন কি সে ফরাসিভাষায় ওরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছিল। জর্মন-রচিত কোন্ ফরাসি গ্রন্থ ফরাসি-সাহিত্যে স্থায়ী সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রেঞ্চ এবং জর্মনদের ভাষা, ভাব, দেশের প্রকৃতি, ইতিহাস ও ধর্মকর্মের যতটা ঐক্য আছে আমাদের সহিত ইংরেজের কি তাহার শতাংশ আছে। আমরা সেই ইংরেজি শিখিয়া সেই ইংরেজি ভাষায় ইংরেজ অধ্যাপকের নিকট ওরিজিন্যালিটি দেখাইব? নিজের পা খোয়াইয়া কাঠের পা পরিয়া চলিতে পারি এই পরম সৌভাগ্য, নৃত্য করিতে পারি না বলিয়া ধিক্কার দাও কেন।……

দেশী ভাষায় যদি আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম, তবে সে-শিক্ষা আমাদের পক্ষে অপর্যাপ্ত হইত। আমরা তাহার মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ সঞ্চরণ করিতে পারিতাম,

তাহার মধ্যে বাস করিতে পারিতাম এবং ক্রীড়া করিতেও পারিতাম। তাহার মধ্যে কাজও পাইতাম অবকাশও পাইতাম, সেও আমাকে গঠন করিত আমিও তাহাকে গঠন করিতাম। শিক্ষা এবং মনের মধ্যে খুব একটা স্বাভাবিক চলাচল থাকিত।

এখন, কথা হইতে পারে, বাংলায় এত বই কোথায়। তবে সেই কথাই হউক। বাংলায় যাহাতে পাঠ্য বই হয় সেই চেষ্টা করা যাক।

ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায় তো তর্জমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হউক, ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতাভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি।......

সরল হইতে ক্রমে দুরূহে অধিরোহণ করাই শিক্ষার অভিক্রম। শিক্ষার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করাই শিক্ষার একটি প্রধান বাধা, সেই ছাঁচটি একবার গড়িয়া লইতে পারিলে অনেক কঠিন শিক্ষা সহজ হইয়া আসে। ব্যাকরণশিক্ষা ভাষাশিক্ষার একটি প্রণালী। কিন্তু যে-ভাষার কিছুই জানিনা সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিষ্কের প্রতি কী অন্যায় উৎপীড়ন করা হয়। কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অ্যাবস্ট্রাক্ট্ শব্দগুলি ছেলেদের পক্ষে কত কঠিন সকলেই জানে; উপর্যুপরি সহজ উদাহরণের দ্বারা ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলি কথঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। কিন্তু ভাষা এবং ব্যাকরণ দুই যখন বিদেশী তখন কাহার সাহায্যে কাহাকে বুঝিবে। তখন সূত্রও অপরিচিত, উদাহরণও অপরিচিত। যে-ভাষা সর্বাপেক্ষা পরিচিত সেই ভাষার সাহায্যে ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করাই প্রশস্ত নিয়ম; অবশেষে একবার ব্যাকরণজ্ঞান জন্মিলে সেই ব্যাকরণের সাহায্যে অপরিচিত ভাষাশিক্ষা সহজ হইয়া আসে।

অতএব, শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীরমনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্প সময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

বাল্যকাল হইতেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিক রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলাশিক্ষা ইংরেজিশিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অংক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষা রূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়; বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া লিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।...

র। ১২শ, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৬১৮—২২,

টীকা ঃ

প্রসঙ্গকথা ১(তিনখানি পত্র)—

১২৯৯ সালে রাজসাহী এসোসিয়েশনে রবীন্দ্রনাথ **'শিক্ষার হেরফের'** প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধটি বাংলাদেশে সর্বত্রই সমাদৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ মোহন বসু উক্ত প্রবন্ধটিকে বিশেষভাবে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত তিনখানি পত্র উদ্ধৃত করে 'প্রসঙ্গ কথা' (তিনখানি পত্র) প্রবন্ধটি লেখেন। 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯—১৩০০, (পৃ— ৪৪০—৪৫৪) প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

মাতৃভাষা, শিক্ষাপ্রণালী, সার্থক শিক্ষা, শিক্ষা ও জনজীবন

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ন্যাশনল ফন্ড। ২. শিক্ষার হেরফের। ৩. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি। ৪. বাংলাশিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)। ৫. ইংরেজি শেখা। ৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৮. শিক্ষার বাহন। ৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। ১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। ১১. ছাত্রসম্ভাষণ। ১২. মেঘনাদবধ কাব্য। ১৩. পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি। ১৪. শিক্ষাসংস্কার। ১৫. শিক্ষাসমস্যা। ১৬. আবরণ। ১৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ১৮. শিক্ষাবিধি। ১৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ২০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩ নং। ২১. অসন্তোষের কারণ। ২২ বিশ্বভারতী ১ নং। ২৩. বিশ্বভারতী ২ নং। ২৪. বিদ্যার যাচাই। ২৫. আকাঙ্ক্ষা। ২৬. বিশ্বভারতী ৬ নং। ২৭. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ২৮. আলোচনা। ২৯। পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ৩০. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ৩১. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২ নং। ৩২. শিক্ষার বিকিরণ। ৩৩. বিশ্বভারতী ১৭ নং। ৩৪। আশ্রমের শিক্ষা। ৩৫. The Poet's School। ৩৬. The School Master। ৩৭. তোতাকাহিনী। ৩৮. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২ নং। ৩৯। বাংলা শিক্ষার প্রণালী ইত্যাদি।

৬। শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি

[সাধনা, আষাঢ় ১৩০০ (১৮৯৩)]

......ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্‌বুদ্‌ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; লোকপ্রবাহের গভীর তলদেশে তাহার মূল নাই।

বলা বাহুল্য, এরূপ কথা তুলনাসাপেক্ষ। যে-সকল কথা কাব্যে পুরাণে প্রচলিত, যে-সকল কথা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে সর্বদা প্রবাহিত, যে-সকল কথা সহজে স্বাভাবিক নিয়মে অনুক্ষণ কার্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে তাহাই জাতীয় জীবনের মূলে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই চিরস্থায়ী। অতএব কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চির-পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ সাধন হয়। বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।······

র। ১২শ, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃঃ—৫০৩,

টীকা ঃ

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি—

১২৯৯ সালে রাজসাহী এসোসিয়েশনে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি সর্বজনের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। প্রবন্ধটি পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রবন্ধটি বিশেষভাবে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথকে পত্র প্রদান করেন। পুনরায় রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্র তিনখানি উদ্ধৃত করে 'প্রসংগ কথা (তিনখানি পত্র)' প্রবন্ধটি রচনা করেন। তারপরেও এ বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। 'শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি' প্রবন্ধটি উক্ত আলোচনারই বিশেষরূপ।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

মাতৃভাষা

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১. ন্যাশনল ফন্ড। ২. শিক্ষার হেরফের। ৩. প্রসংগ কথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৪. বাংলা শিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)। ৫. ইংরেজি শেখা। ৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৭। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৮. শিক্ষার বাহন। ৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। ১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। ১১. ছাত্রসম্ভাষণ। ১২. বাংলা শিক্ষার প্রণালী ইত্যাদি।

৭। প্রসঙ্গকথা ২

[ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫ (১৮৯৮)]

...বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে-উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়। সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি গত পাঁচিশ বৎসর এই কার্যে যত্নশীল হইতেন তবে যে-ফললাভ করিতেন তাহা রাজপুরুষবর্গের সমুচ্চ প্রাসাদ বাতায়ন হইতে দৃষ্টিগোচর না হইলেও আমাদের এই বিজ্ঞানদীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইত।

নালিশ এই যে, বিজ্ঞানসভা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত-মতো খোরাকি এবং আদর পায় না। কেমন করিয়া পাইবে। যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞান-চর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে এবং সফলতা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দিগন্তে বিলীন হইবে না।

পূর্বকালে ভারতবর্ষে কেবল ব্রাহ্মণদের জ্ঞানানুশীলনের অধিকার ছিল। ব্রহ্মণ্যের উচ্চ আদর্শ সেই কারণেই ক্রমে ম্লান এবং বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমে কর্ম নিরর্থক, ধর্ম পুঁথিগত, এবং পুঁথিও মুখস্থ বিদ্যায় পরিণত হইয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ, নিম্নের মাধ্যাকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। যেখানে চতুর্দিক অনুন্নত সেখানে সংকীর্ণ উন্নতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা দুঃসাধ্য। অদ্য ব্রাহ্মণ নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহার তিন দিনের উপনয়ন ব্রহ্মচর্যের বিদ্রূপমাত্র, তাহার মন্ত্রার্থজ্ঞানহীন সংস্কার বর্বরতা। তাহার কারণ, অশিক্ষিত বিপুলবিস্তৃত শূদ্রসম্প্রদায় আপন দূরব্যাপী প্রকাণ্ড মূঢ়তার গুরুভারে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মণ্যের উচ্চশিরকে ধূলিসাৎ করিয়া জয়ী হইয়াছে।

অদ্য ইংরেজিশিক্ষিতগণ কিয়ৎপরিমাণে সেই ব্রাহ্মণদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সাধারণের কাছে ইংরেজিভাষা বেদের মন্ত্র অপেক্ষা সরল নহে। এবং অধিকাংশ জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরেজিভাষার কড়া পাহারার মধ্যে আবদ্ধ।

তাহার ফল এই, বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভ করি সমাজে তাহার কোনো চর্চা নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিদ্যার প্রধান গৌরব দাঁড়াইয়াছে অর্থোপার্জনের উপায়রূপে।

সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই স্বল্পসংখ্যক আধুনিক ব্রাহ্মণস্থানীয়দের জন্য আপন শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। যে-কয়জনা ইংরেজিতে বিজ্ঞান শেখে সভা তাহাদের নিকট ইংরেজিভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে; বাকি সমস্ত বাঙালির সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। অথচ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের জন্য বাঙালি বিশেষ উদ্যোগী হইতেছে না, এ-আক্ষেপ তাহার উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তন-ক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার

সূর্যোদয়ে কুয়াসার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত বিজ্ঞানঘেঁষা ছাত্রেরাও কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা ঢিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্বক বিশ্রামলাভ করেন। যেমন পাথুরে জমির উপর আধহাতখানেক পুষ্করিণীর পাঁক তুলিয়া দিয়া তাহাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে গাছটা প্রথম প্রথম খুব ঝাড়িয়া মাথা তুলিয়া ডালেপালায় গজাইয়া উঠে, অবশেষে শিকড় যেমনি নিচের কঠিন স্তরে গিয়া ঠেকে অমনি অকস্মাৎ মুসড়িয়া মরিয়া যায়—আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষারও সেই অবস্থা।

ঘরে বাহিরে চারিদিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে স্থায়ীরূপে বর্ধিত হইতে পারিবে। নতুবা আপাতত দুইদিনের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই—কেননা, চারিদিকের দিগন্তপ্রসারিত মূঢ়তা দিনে নিশীথে অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ণমূল উচ্চতাকে আপনার সহিত সমভূম করিয়া আনিবে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধোগতির প্রধান কারণ এই ভিত্তির সংকীর্ণতা, ব্যাপ্তির অভাব, একাংশের সহিত অপরাংশের গুরুতর অসাম্য……

র। ১২শ খণ্ড; বিশ্বভারতী, আশ্বিন, ১৩৪৯, পৃঃ ৫০৭—০৮

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

বিজ্ঞানচর্চা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষার মিলন। ২ শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ৩. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৪. ছাত্রসম্ভাষণ ইত্যাদি।

৮। জগদীশচন্দ্র বসুকে পত্র

(অগাস্ট ১৯০১)

[চিঠিপত্র-৬, বিশ্বভারতী ১৯৫৭ পৃঃ ৩৫—৩৬]

……শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না—ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোনমতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা

ও তখনকালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্মযোগী করিতে পারিল না কেন? ···ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না।······

টীকা ঃ

জগদীশচন্দ্র বসু—রবীন্দ্রনাথের সুহৃৎ, বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক। জন্ম—১৮৫৯, মৃত্যু—১৯৩৭।

বিদ্যালয়—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

আশ্রমের শিক্ষা (তপোবন)

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষাসমস্যা। ২. ধর্মশিক্ষা। ৩. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৪. শিক্ষার আদর্শ। ৫. ধারাবাহী। ৬. আশ্রমের শিক্ষা ইত্যাদি।

৯। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

(রচনা—চৈত্র ১৩১১)

[প্রকাশ ঃ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১২ (১৯০৫)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ভাষণ]

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন দিন ছিল যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে; একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি?···

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে; সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে—যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায় তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্‌যোগের সহিত সুসম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎকে অনুরোধ করিতেছি—আমার অনুনয়, বাঙালি ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন, যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎ-পরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই-সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি। ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই; সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে

পারি না। আর-একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, 'এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থ বিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।'

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি; কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি; কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িয়া মাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না; এমন-কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই, কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি, ধর্ম সমাজ এমন-কি সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বলো, হৃদয়ই বলো, কল্পনাই বলো, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে—ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ নানাপ্রকার অসংগত অনুকরণের দ্বারা 'লাভ

করিয়াছি' বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এত কাল গেল, তথাপি এই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত-অনুকরণ-মূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে ; আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না; আমাদের দেশ যে কিরূপ তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না।···

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো; নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত-সংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায় তবে সাহিত্যপরিষদ্‌ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কত দূর প্রয়োজনীয়তা তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দ-চরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে; নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্‌ পথে চলিতেছে, কোন্‌ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য তাহা আমি বলি না। যেখানেই হউক-না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের

নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এইসকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার প্যইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন-কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ্ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য আমার অনুরোধ পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।...

আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই ; লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়্রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রিয়টিজ্মের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখ-দুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহু দূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম। এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলো দিবার আয়োজন করিতে হয়।

'আইডিয়া' যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহা-রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম, ভিখারির মতো পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্-ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনু-বাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠর-গহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দিষ্ট। এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিটখাম্বাজ রাগিণীতে যতই মর্মভেদী হউক-না, ডেপুটি-গিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধুর বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরী স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিনশেষ করে; একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয় সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্পকল্পনার বিলাস-ভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহৃদয় হইয়া উঠে যে উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূর পথে দেখে তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রসালস জড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না, এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া

কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে—সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।…

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩; পৃঃ—২০-২৮

টীকা ঃ

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

পরীক্ষার জন্য যে সব ছাত্র কলকাতায় আসতেন, তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ একটি সভা আহ্বান করেন এবং ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে সভার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেই ১৭ই চৈত্র ১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ

১৩০১ (১৮৯৪) বৈশাখ মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের প্রতিষ্ঠা। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য মানুষের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সবচেয়ে বড় উপায়। বঙ্গভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রসারের উদ্দেশ্যেই বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন রমেশ দত্ত ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন এল্. লিওটার্ড।

বায়রণ (**George Gordon Byron**)

ইংরেজ কবি। জন্ম—১৭৮৮, মৃত্যু—১৮২৪।

গারিবলডি (Garibaldi)

ইটালির বিখ্যাত দেশপ্রেমিক। জন্ম—১৮০৭, মৃত্যু—১৮৮২।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

জাতীয় শিক্ষা, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. তপোবন। ২. হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়। ৩. ছাত্রশাসনতন্ত্র। ৪. বিশ্বভারতী ১নং। ৫ বিশ্বভারতী ২নং। ৬. বিশ্বভারতী ৬নং। ৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ৮. জাতীয় বিদ্যালয়। ৯. প্রাক্তনী। ১০. বিশ্বভারতী ১০ নং। ১১. ধারাবাহী। ১২. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান। ১৩. The School Master। ১৪. A Poet's School। ১৫. শিক্ষাসংস্কার। ১৬. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১৭. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ১৮. অসন্তোষের কারণ। ১৯. আকাঙ্ক্ষা। ২০. প্রাক্তনী। ২১. বিশ্বভারতী ৪নং। ২২. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ২৩. কলাবিদ্যা। ২৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২৫ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ২৬. শিক্ষার সার্থকতা। ২৭. শিক্ষার আদর্শ। ২৮. বিশ্বভারতী ১৫নং। ২৯. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ৩০. বিশ্বভারতী ১৭নং। ৩১. বিশ্বভারতী ১৮নং। ৩২. আশ্রমের শিক্ষা। ৩৩. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ৩৪. বাংলা শিক্ষার প্রণালী। ৩৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৩নং ইত্যাদি।

১০। পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি ঃ

[ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ (১৯০৫)

...শিক্ষা-জিনিসটাকে একদিকে একবার শুরু করিয়া দিলে তার পরে তাহাকে গণ্ডি টানিয়া কমানো শক্ত। বিদেশী রাজার পক্ষে সেটা একটা বিষম ভাবনা। প্রজা বাঁচিয়া-বর্তিয়া থাকে, এটা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বাঁচার চেয়েও যদি বেশি অগ্রসর হইয়া পড়ে, তবে সেটা তাঁহার প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

এইজন্য প্রাইমারি শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানা রকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন খাল কাটিয়া বেনো জল ঢোকানো কাজটা ভাল নয়—শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে।

অতএব চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়। তাহারা যেন কেবল গ্রামের ম্যাপটাই বোঝে ; পৃথিবীর ম্যাপ চুলায় যাক, ভারতবর্ষের ম্যাপটাও তাহাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া তাহাদের ভাষাশিক্ষাটা প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায়, সেটাও দেখা দরকার।

অতএব প্রথমেই দেখিতেছি, আমরা চাষাদের শিক্ষালাভ হইতে দেশের যে সুবিধাটা আশা করিতেছি, কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই সেটাকে আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

আমাদের দেশহিতৈষীরা যদি মনে করেন, সরকারের কর্তব্য দেশের সাধারণ লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আমাদের কর্তব্য তৎসম্বন্ধে রেজোল্যুশন পাস করা, তবে এ-কথাটা আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, সরকারের হাতে শিক্ষার ভার দিলে সে-শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনেরই চেষ্টা করিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য দেখিবেন না। তাঁহারা চাষাকে গ্রামের চাষা রাখিবার জন্যই ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকে ভারতবর্ষের অধিবাসী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

শিক্ষা যদি নিজের হাতে লই, তবেই নিজের মতলব মতো শিক্ষা দিতে পারিব—ভিক্ষাও করিব, ফরমায়েশও দিব, এ কখনও হয় না। ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে, দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না।

আমাদের নিজের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিজেরা করিব, এ-কথা তুলিলেই আপত্তি এই উঠে যে, আমাদের পাঠশালার শিক্ষায় অন্নের সংস্থান কেমন করিয়া হইবে। সরকার যদি এমন কথা বলেন, সরকারী বিধানের ছাঁচে বিদ্যালয় না বানাইলে সেখানকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে আমরা উমেদারির বেলা আমল দিব না, তবে আমরা কী উপায় করিব।

এই প্রশ্নের সদুত্তর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উত্তর দিবার পূর্বে প্রশ্নের বিষয়টাকে পরিষ্কার করিয়া সম্মুখে ধরা যাক।

প্রথম কথা—দেশের কাজে দেশকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিতে হইলে গোড়ায় সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা—শিক্ষার যদি একটা প্রধান উদ্দেশ্য এই হয় যে, দেশের লোককে দেশের কাজে যোগ্য করা, তবে স্বভাবতই শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হইবে না।

তৃতীয় কথা—যদি তাহা না হয় তবে পরের বাঁধা-চালে কতকগুলা বিদ্যালয় বানাইয়া বিদেশের শাসনে স্বদেশের সরস্বতীকে জিঞ্জির পরাইলে বিশেষ ফললাভ প্রত্যাশা করা চলিবে না। শিক্ষাপ্রণালীকে সকল প্রকারেই স্বদেশের মঙ্গলসাধনের উপযোগী করিবার জন্য দেশের বিদ্যালয়কে সরকারের শাসন হইতে মুক্তি দেওয়া দরকার।

শেষ কথা—তাহার বাধা এই যে, অন্নের দায়ে বিদ্যা সরকারের দ্বারে বাঁধা পড়িয়াছে। সে-বন্ধন না কাটিলে বিদ্যাকে স্বাধীন করিব কী উপায়ে। …………

র। ১২শ, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃঃ—৫১৬-৫১৭

টীকা ঃ

পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি ঃ

১৩১২ সালের বৈশাখের ভাণ্ডারে শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। প্রশ্নটি এই ঃ আমাদের দেশের পাব্লিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে দেশের প্রাকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি। বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট লোকের কাছ থেকে ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। 'পূর্ব-প্রশ্নের অনুবৃত্তি' (ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ—১৩১২) প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গেই লিখিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় মন্তব্য ঃ

শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষাপ্রণালী

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩ শিক্ষা-সংস্কার। ৪ শিক্ষাসমস্যা। ৫. আবরণ। ৬. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৭. শিক্ষাবিধি। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১০. অসন্তোষের কারণ। ১১. বিশ্বভারতী ২নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্ব-ভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. **A Poet's School.** ২৪. **The School Master.** ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. শিক্ষার বাহন। ২৮. রাশিয়ার চিঠি। ২৯. পল্লীসেবা ইত্যাদি।

১১। ইতিহাসকথা

[ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩১২ (১৯০৫)]

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা। এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

আজকাল শিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছে—একমাত্র পুরাণকথার ভিতর দিয়া সকলপ্রকার উপদেশ চালানো যায় না। অথচ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দলের মধ্যে ভেদ যদি যথাসম্ভব লোপ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় হয়, তবে যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যাহা লাভ করিবার উপায় তাহাদের নাই।

একেবারে গোড়াগুড়ি ইস্কুলে পড়িয়া সেই-সকল জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সাধারণ লোকের ভাগ্যে ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তেমন করিয়া কখনোই ঘটিবে না। তা ছাড়া ইস্কুলে-পড়া জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে না।

ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সব-চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ কী করিয়া বড়ো হইয়াছে, প্রবল হইয়াছে, দল বাঁধিয়াছে, যাহা শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে তাহা কী করিয়া পাইয়াছে, পাইয়া কী করিয়া রক্ষা করিয়াছে, সাধারণ লোকের এ-সমস্ত ধারণা না থাকাতে তাহারা শিক্ষিতলোকের অনেক ভাবনা-চিন্তার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং তাহাদের কাজকর্মে যোগ দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে মানুষ কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে, তাহা না জানা মানুষের পক্ষে শোচনীয় অজ্ঞতা।

কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। এমন কি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে।

আজকাল য়ুরোপে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক ইতিহাস শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়—এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন।

সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই চলিত আছে—য়ুরোপ আজ সেইরূপ সরস উপায়ের দিকে ঝোঁক দিয়াছে, আর আমরাই কি আমাদের জ্ঞান প্রচারের স্বাভাবিক পথগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পনালোকবর্জিত ইস্কুল-শিক্ষার শরণ লইব।

আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। আমরা আজকাল কেবল মাসিক কাগজে ও ছাপানো গ্রন্থে সাহিত্য-প্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকি,—কিন্তু যদি কোনো কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্য দেশের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস, এমনকি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।

যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজী, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন। এমন কি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন।

র। ১২শ, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃঃ—৫২০-২১,

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য

ইতিহাসশিক্ষা

১২। শিক্ষাসংস্কার

[ভান্ডার, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ (১৯০৬)]

…য়ুরোপের যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্বর-আক্রমণের ঝড়ে রোমের বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়র্লন্ডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়া ছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়র্লন্ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল তখন তাহারা আহার বাসা পুঁথি এবং শিক্ষা বিনা মূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মতো আর-কি।

… প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষা দ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজেরা আয়র্লন্ড্ আক্রমণ করে তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়র্লন্ডের যে যে স্থান এই-সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল তখন আয়র্লন্ডের স্বায়ত্ত বিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়র্লন্ড্বাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহাদের ভাষা নিকৃষ্ট সমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল।…

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাক্সনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল স্কুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয় তখন আয়র্লন্ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।…

ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত

হইয়া গেল। আইরিশভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।

ইহার কারণ, এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।...

ঠিক একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সকল অংশের তুলনা হইতেই পারে না। আয়র্লন্ডের শিক্ষানীতি যে ভাবে চলিয়াছিল, ভারতবর্ষেও যে ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু আয়র্লন্ডের শিক্ষাসংকটের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা গভীর জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না, আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয় সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। তত দিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি পেটা এবং কুলুপ খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে; সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থবিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া? প্রায় বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত মারামারির পর ইংরেজি ভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু তত দিন আমাদের মন কী খোরাকে বাঁচিয়াছে? আমরা কী ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কী রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টিকার্যচর্চার জন্য কী উপকরণ লাভ করিয়াছে? যাহা গ্রহণ করি তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত, প্রকাশ করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চা না থাকাতে যাহা শিখি তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। key মুখস্থ করিয়া, শেখা এবং লেখা দুয়ের কাজ চালাইয়া দিতে হয়। যে বয়সে মন অনেকটা পরিমাণে পাকিয়া যায় সে বয়সের লাভ পুরা লাভ নহে। যে কাঁচা বয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে তখনি সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে মাঠ শস্যশূন্য অনুর্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে!

এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পেঁাছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবনাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র-অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়; আমরা নকল করি, নজির খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি তাহা হয় কোনো না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশত বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকি।

কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে, এ কথা কোনো মতেই স্বীকার্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।

আর-একটি কথা। শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়।...

শুধু তাই নয়। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাকে যে পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে—ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষির চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে। তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায় তবে ইহাই এক দিন চরিত্র এবং বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতাসৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির শুভ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এইজন্য বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন। ইংলণ্ডে এই ক্ষমাগুণের চর্চা যথেষ্ট দেখা যায়—এমন-কি, আমাদের কাছে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক ; আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের যখন সুদিন ছিল তখন ইংলণ্ডও কোনো জাতি সম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না, ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে—এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্মেন্ট্-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিন্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল তাহা আমি মনে করি না। গবর্মেন্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্মেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি তখনি আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয় তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশী লোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নহিলে এ দেশের দুর্গতি কিসের! অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ

নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি, অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই-যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার—বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।…

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ৩২-৩৭

টীকা ঃ

মেকলে (Thomas Babington Macaulay)

ইংরেজ সাহিত্যিক ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ। জন্ম—১৮০০, মৃত্যু—১৮৫৯।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষার লক্ষ্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষা সমস্যা। ৫. আবরণ। ৬. পিতৃদেব (জীবন স্মৃতি)। ৭. শিক্ষাবিধি। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯ জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১০. অসন্তোষের কারণ। ১১. বিশ্বভারতী ২নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. The Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২৮ তপোবন। ২৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৩০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৩১. প্রাক্তনী। ৩২. বিশ্বভারতী ৪নং। ৩৩. কলাবিদ্যা। ৩৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ৩৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ৩৬. শিক্ষার সার্থকতা। ৩৭. শিক্ষার আদর্শ। ৩৮. বিশ্বভারতী ১৫নং। ৩৯. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ৪০. বিশ্বভারতী ১৭নং। বিশ্বভারতী ১৮নং ইত্যাদি।

১৩। শিক্ষাসমস্যা

[প্রকাশ—বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৩ (১৯০৬)]

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েক জন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ এই পরিষদের স্কুল-বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

…গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে. জাতীয় শিক্ষাপরিষৎটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। দেশে সম্প্রতি যে-সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না, এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে কোন্ ভাবে এই শিক্ষাকার্য চলিবে। কোন্ নিয়মে চলিবে এবং কী কী বই পড়ানো হইবে, সে-সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন 'জাতীয়' ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তবে প্রশ্ন উঠিবে, শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী বুঝায়? 'জাতীয়' শব্দটার কোনো সীমা-নির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয় এবং কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত, নিজের অভাব, বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।…

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফর্মাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়; এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না; তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে

বিচ্ছিন্ন নহে ; সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে; সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজে-কর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনার নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে, তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই—যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব, তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে ; তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেই প্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।…

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্ক-শূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক আব্‌স্ট্রাক্ট্‌ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।…

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে। তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই—বিদেশী য়ুনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেন্সিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে, কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।

এক দিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল, এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কালে এই-সকল আশ্রম সত্য ছিল সে কালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি **লক্ষ্য** করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারি দিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা ; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই, সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যত দিন অধ্যয়নের কাল তত দিন ব্রহ্মচর্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে ;. ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে ; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইঁট কাঠ পাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব, বিধাতার এমন বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের শহরের কাছে পুষ্পপল্লব-চন্দ্রসূর্যের কোনো দাবি নাই - তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না—তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতি দিনই দূরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে, শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য—ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ্ চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে।…

অগ্নি বায়ু জল স্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না ; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানা-ঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

…খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর-মনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি—তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও– তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথম-যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে—এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই—তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্ব-জননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইন্‌স্‌পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দর-ভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে-নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার 'হরিণবাড়ি'র মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া, মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের

সৃষ্টি করা হইয়াছে ! শিশু যে অ্যাল্‌জেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সে জন্য সে কি অপরাধী ? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে ? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না ? আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা-বশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই ? শিশুদের জ্ঞান-শিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল ; সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো, মাতৃগর্ভের দশ মাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না—তাহাদিগকে দয়া করো।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া থাক, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই ; কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ-বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে ! দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন

হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি, এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে।

…আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো জোর একটা প্রাইভেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই. শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে, এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়। কামার কুমার তাঁতি প্রভৃতি শিল্পিগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে—তাহার কারণ, তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালোরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়—তখন এ কথা কেহ বলে না যে বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরও যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইঁহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইঁহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক-একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ এক-একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।…

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্য-শোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারি দিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে; বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়—জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্যশোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি। সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে। কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তিসংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না—বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্বে ব্রহ্মচর্য-পালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেক দিন হইতেই সে আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ-আদর্শই গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরানি সেরেস্তাদার দারোগা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি ; তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহুল্য বলি।…

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্যস্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই—নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে, এরূপ আশা করিয়া নূতন আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না ; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয় সেইখানেই যে শিক্ষাকল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে—শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না। বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি। যেখানে গোপনে ত্যাগ,

যেখানে একান্তে সাধনা; সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত। ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক। আর, যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিন্ডিকেট, ইঁটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।

বঙ্গদর্শন (১৯০৬)

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ৩৮-৫৫

টীকা ঃ

শিক্ষাসমস্যা

১৩১৩ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ওভারটুন হলে আহূত সভায় রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ্‌কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেবার উদ্দেশ্যে কর্মকতারা একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপরিকল্পনা তৈরি করেন। এই পরিষদের মূল লক্ষ্য ছিল "Quickening of the national life of the people" (সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়)। রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীরা এই পরিষদে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন।

উত্তরকালে ১৯৫৫ সালে উক্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, আশ্রমের শিক্ষা, প্রকৃতি, শিক্ষার পরিবেশ

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩ পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. আবরণ। ৬. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৭. শিক্ষাবিধি। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১০. অসন্তোষের কারণ। ১১. বিশ্বভারতী ২নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮ জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে

রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১ বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. The Poet's School, ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. জগদীশচন্দ্র বসুকে পত্র। ২৮. ধর্মশিক্ষা। ২৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৩০. শিক্ষার আদর্শ। ৩১. ধারাবাহী। ৩২. তপোবন। ৩৩. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ৩৪. বিশ্বভারতী ৪নং। ৩৫. বিশ্বভারতী ৫নং। ৩৬. বিশ্বভারতী ১০নং। ৩৭. বিশ্বভারতী ১৪ নং। ৩৮. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

১৪। জাতীয় বিদ্যালয়

[বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৩ (১৯০৬)]

জাতীয় বিদ্যালয় তো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কী সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর-কোনো প্রয়োজন আছে ?···

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে-একটি বিশেষ অধিকার আছে সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পোলিটিক্যাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিক্যাল ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি তাহা আমাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছে ; সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিক্যাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্গতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায় সেটাকে কোনোমতেই

মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্‌বুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কৈ, আমরা পোলিটিক্যাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায় ? আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কৈ ? আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশ দেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে— জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল। এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না ; সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এইসকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব; আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে ; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতনদীপ্তি নূতনব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনি সে অমৃতলাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে ; নানা তথ্য নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে। পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণত জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি। জাতীয় বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরু বিদ্যার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি আমরা ভুল করিতেও **সংকোচ** বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার

অধিকার যাহার নাই সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভালো। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায় সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক, যেমন করিয়াই হউক. শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব, আমরা যে ইংরেজি লেকচারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকল-বাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতনপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে; তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়; দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে; তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে: সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্। তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে: ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই।..

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ৫৬-৬৪

টীকা ঃ

জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। ১৪ই আগস্ট ১৯০৬ সালে জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শ।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২ প্রাক্তনী (৫নং)। ৩. বিশ্বভারতী ১০নং। ৪. ধারাবাহী। ৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান। ৬. The School Master. ৭. A Poet's School. ৮ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ১নং। ৯. বিশ্বভারতী ১১নং। ১০ বিশ্বভারতী ১৫নং। ১১ শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ১২. বাঁকুড়ায় ছাত্রদের উদ্দেশে। ১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৩নং ইত্যাদি।

১৫। আবরণ

[বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৩ (১৯০৬)]

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যে দিন হইতে জুতা পরিতে শুরু করিলাম সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল।…

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীন শক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।…

…মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনো কালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত; অর্থাৎ, বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয় তাহা সে ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।…

অবশ্য ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সংগত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনোই ভালো ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই-সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই; কোনো কালে আমরা ছিলামও না। আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা-জিনিসটা যে নৈমিত্তিক, ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল।…

শরীর সম্বন্ধে কাপড় জুতা মোজা যেমন আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বই-পড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র তাহা আর আমাদের মনে হয় না, আমরা বই-পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাস্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও

পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা ; তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া, চোখ কান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাস্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র ; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে সে যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে, তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিসটা আছে সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি—জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বই-পড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবি তেমনি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক হইয়া উঠে এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবু-নামক জীব চাকর-বাকর জিনিস-পত্রের সুবিধার অধীন। নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে যেটুকু কষ্ট, যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেইটুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বই-পড়া বাবুয়ানাতেও জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারা লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায় ; সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাই থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বই-পড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়-পরা শরীরের যেমন একটা সংকোচ জন্মিয়াছে আমাদের মনেরও তেমনি ঘটিয়াছে ; সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপন-ভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া, আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে ক্রমশই

কঠিন হইয়া উঠিতেছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না ; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমতো বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে, দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলে-পুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা, আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে-সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার। কিন্তু সত্যকার মানুষ-যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত ; এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।…

এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে, এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর-এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে-মুখে সহস্র লোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে, অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে—এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চার দিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই-সকল বাস্তবতাবর্জিত ভাবগুলা ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে, তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়, সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া তোলে।…

মানুষের মনের চারি দিকে এই-যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে ইহার মোদো গন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে ; শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে ; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিসের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটি দুইতিন মহাকাব্য আছে যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই ; নির্মল জলের মতো তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মতো তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক করিয়া অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলই ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতিসভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে, স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং হয়তো মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মতো ব্যাপক, যাহা বাতাসের মতো মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া, উপার্জন করিয়া লইতে হয়তো প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে ; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতি বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি, যাহা আবর্জনা তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশী বুলি সর্বদাই অসন্দিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই ; তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখে-মুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশ জনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর-দশ জনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই-সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, যেন তাহা বিদেশী ইস্কুল-মাস্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখি যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায় তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে-সব জাতির মধ্যে বিলাতি সভ্যতা নূতন প্রবেশ করে তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়, অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেমনি দেখা যায়, যে-সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্তারা অনেকটা পরিমাণে অবিচলিত থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্‌-এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণ সম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতি বুলি দাঁড়ের পাখির মতো আওড়াইয়া গেলেন ; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজি কায়দায় শেখানোই যে একমাত্র 'শিক্ষা' নামের যোগ্য এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র শ্রেয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু, বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মতো আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচারমাত্র উপস্থিত হয় না, তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ-সব কথা আমরা পুঁথি হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলা-মেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক! জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে সন্দেহ নাই, আমাদের সহিত সর্বপ্রকার সামাজিক যোগ-বিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর একটা কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয়; এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের যোগ অতি অল্প। এ জ্ঞান আনন্দের জন্য নহে, এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি, তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়; বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহংকার বাড়িয়া উঠে; সেই অহংকারের যেটুকু সুখ সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম তবে এতগুলি শিক্ষিত লোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম যাঁহারা জ্ঞানচর্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়ান্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যগ্র, এবং কতকগুলো পাস করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পঙ্কে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্তি হইয়া থাকে। দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল জজ কেরানির অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়?

কথায় কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমত আমার যেটুকু বক্তব্য সে এই, বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি পুরাকালে, যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনো তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে, তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। 'আর্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন', 'খৃস্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদরচনা হইয়াছে', এ-সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি। বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুট-হীন নির্বিকার, তাহারা

শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে ; তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানিতে হইবে এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলো যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া, তাহাদের নিজেদের অনুমান-শক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কী করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে-অল্পে ক্রমে-ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক ; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না, বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না : শিক্ষার উপরে সেই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁটিয়া দেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়—ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয় ; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা ; তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভুত হইয়া পড়ে—সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়ন বশত চিরকালের মতো হারায়—তবু ইহা বিদ্যা, কারণ, ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভুগোলের পাতা, এতক'টা অংক এবং এতটা পরিমাণ বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে ! শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা ; আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের 'পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন ; সেইজন্য গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং শিশু-কাল হইতে শিক্ষার দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কী বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায়, তাহা কেহ বা বুঝেন না ; কেহ বা বুঝেন, স্বীকার করেন না ; কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ৬৫—৭৭

টীকা :

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষা ও জীবন

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষা সংস্কার। ৫. শিক্ষা সমস্যা। ৬. পিতৃদেব জীবনস্মৃতি)। ৭. শিক্ষাবিধি। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১০ অসন্তোষের কারণ। ১১. বিশ্বভারতী ২নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩ আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩ A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. শিক্ষার হেরফের। ২৮. জগদানন্দ রায়কে পত্র ১নং। ২৯. বিশ্বভারতী ৪নং। ৩০ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ৩১. শিক্ষার সার্থকতা ইত্যাদি।

১৬। তপোবন (১)

[প্রবাসী, পৌষ ১৩১৬ (১৯০৯)]

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট-কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চার দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন-সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানা দিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত, এ ছাড়া অন্যরকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চার দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে

প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সারপদার্থসকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।···

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেষি করে একেবারে পিন্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদীসরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল; ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে সেই অরণ্যবাস-নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি, এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত **বহিরাভিমুখী** হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অল্পস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্‌বিজয়ী হয়েছে—এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক-আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন

তাঁরা নিজের চারি দিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন : যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশ সমিৎ জুগিয়েছে ; তাঁদের প্রতি দিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য ব'লে, নির্জীব ব'লে, পৃথক্ ব'লে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যে তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন ; সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে, বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আম্রবন কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন ; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য-সাম্রাজ্য নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে ; দেশবিদেশের সঙ্গে তার পণ্য-আদান-প্রদান চলেছে ; অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনোদিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদিপুরুষ ব'লে জেনে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি ; তখন চীন হূন শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চার

দিকে ভিড় করে এসেছে ; তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করেছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কত খানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনি উদ্ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশ সমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো, তারা নীবারধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠেছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন, পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবারধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা; এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত **অভিজ্ঞানশকুন্তলা** নাটকের মধ্যে ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ওই, চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটীরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে, বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেববলিপিণ্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবার-বলি খেয়ে যাচ্ছে, হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট।

যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই নাকি প্রধানত নাটকের উপাদান, এইজন্যেই অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই, প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই-যে জগৎপ্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই-যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মাত্র—এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।···

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূর কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন: সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম গিয়েছিল; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত—আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বোঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদ-ভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্র বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ ক'রে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতি-প্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গলজটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয়বার্তায় জগৎকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধ তেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর, নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম-আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী আর হয়েছে কী! সে কালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর এ কালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারি দিকের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের

সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব ; সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয় নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল ; অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ ; কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের, সকল কালের—কামনাত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, এইটি উপনিষদের অনুশাসন। এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা—লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং Resignation. আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার, এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি ; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গ'লে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন, এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করেছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব, ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের

স্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজন্যেই তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়-সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এইজন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারতুম, প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্ব-জনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রঙ হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই-যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল, এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে, এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠেছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদীতৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন—এই তপোবনটি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান ক'রে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর, সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষপর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধ'রে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে

অসহ্য হয়ে ওঠে—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে, প্রথম তপোবনটি মর্তলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। **অর্থাৎ,** প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়া-ভালো। এই যেমন-হওয়া-ভালোর দিকে যেমন-হয়ে-থাকে চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। যেমন-হয়ে-থাকে হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর যেমন-হওয়া-ভালো হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় ক'রে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও যেমন-হয়ে-থাকে তপস্যার দ্বারা অবশেষে যেমন-হওয়া-ভালোর মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানস-লোকের এই-যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পেঁছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী; সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ; অতএব, কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন; তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লেশ বোধ করেন নি। এই-সমস্ত নদী-গিরি-অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল; এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি, তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।…

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগপক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন; এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়, সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল, সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘন শ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে, একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের **As You Like It** নাটক একটি বনবাসকাহিনী—**Tempest**ও তাই, **Midsummer Night's Dream**ও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত, অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ দেখতে

পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি ; হয় তাকে জয় করবার নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে, হয় বিরোধ নয় বিরাগ নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্‌টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদিদম্পতি প্রেমের আনন্দপ্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে—

> Beast, bird, insect, or worm, durst enter none
> Such was their awe of Man…

[অর্থাৎ, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।]

এই-যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্ত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই ; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই, ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না ; মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয় ; সে মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে-প্রেম সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন 'যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে' ; তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, 'মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গ'লে যাচ্ছে।'

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ

করছে না। বিরহদুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায়-প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নদনদী-অরণ্য-নগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়-বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন : এইজন্যই প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ীহৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে ; এক ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই, যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান ; মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে।···

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে, তার একটি প্রধান লক্ষণ কী ? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল ; সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে, আর এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের মধ্যে নেই। এইজন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে **বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের** সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।···

অতএব, যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতাশিক্ষা নয় ; স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয় ; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা ; বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে-সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক—তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

···বর্তমানকালে এখনি দেশে এইরকম তপস্যার স্থান, এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে, আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য নানা বিরুদ্ধ ভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ ব'লে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ— এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি— ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয়, আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।···

কেউ না মনে করেন, ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চার দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে শাখাটি যে দিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।···

এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিসের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদল-বদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য

ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে ; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক ক'রে নেবে ব'লে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি—একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা, কেবল মতবাদ-রূপে ছিল না ; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে ; এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এইজন্যেই ঝড় চিরদিন টিঁকতে পারে না, এইজন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এইজন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ৭৮—১০১

টীকা ঃ

সেকস্‌পীয়র (William Shakespeare)

ইংরেজ কবি ও নাট্যকার।

জন্ম—১৫৬৪, মৃত্যু—১৬১৬।

মিলটন (John Milton)

ইংরেজ কবি।

জন্ম—১৬০৮, মৃত্যু—১৬৭৬।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য, তপোবনের শিক্ষা, প্রকৃতি, জাতীয় শিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. শিক্ষা সংস্কার। ৩. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৪. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৫. অসন্তোষের কারণ। ৬. আকাঙ্ক্ষা। ৭. প্রাক্তনী (২নং। ৮. বিশ্বভারতী ৪নং। ৯. পূর্ববঙ্গ বক্তৃতা। ১০. জনৈক অধ্যাপকের চিঠি। ১১ কলাবিদ্যা। ১২. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ১৪. শিক্ষার সার্থকতা। ১৫. শিক্ষার আদর্শ। ১৬. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৭. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১৮. বিশ্বভারতী ১৭নং। ১৯. বিশ্বভারতী ১৮নং। ২০. শিক্ষাসমস্যা। ২১. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ২২. বিশ্বভারতী ১০নং। ২৩ বিশ্বভারতী ১৪নং। ২৪. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ২৫. The School Master. ২৬. A Poet's School. ২৭. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ২৮. ছাত্র শাসনতন্ত্র। ২৯. বিশ্বভারতী ১নং। ৩০. বিশ্বভারতী ২নং। ৩১. তপোবন ২নং ইত্যাদি।

১৭। অঘোরনাথ অধিকারীকে পত্র

(আনুমানিক ১৯১০)

···শিক্ষাপ্রণালী জড়যন্ত্রের মত একই পন্থা ধরিয়া এক প্রণালীতেই চিরকাল চলিতে বাধ্য, ইহাই আমাদের দেশের অধ্যাপন-ব্যবসায়ীদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তা ছাড়া, শিশুর মনকে তাঁহারা মন বলিয়াই গণ্য করিতে চান না। এইজন্য শিশুশিক্ষা কার্যে কোনো প্রকার যোগ্যতা বা বিবেচনাশক্তির প্রয়োজন নাই মনে করিয়াই আমাদের দেশে শিক্ষকতার কাজ চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে যে কেবল সময় ও চেষ্টার ব্যর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা নহে, ইহাতে বালকদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে।···

টীকা :

অঘোরনাথ অধিকারী—'বিদ্যালয়-বিধায়ক বিবিধ বিধান' পুস্তকের রচয়িতা। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষাপ্রণালী

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. শিক্ষা সংস্কার।
২. শিক্ষাবিধি।
৩. অসন্তোষের কারণ।
৪. জগদানন্দ রায়কে পত্র।
৫ শিক্ষার বিকিরণ।
৬. **A Poet's School.** ইত্যাদি।

১৮। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ (১৯১১)]

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে একথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে। কিন্তু এখন মিলিবার বাধা সকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।...

...এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।..

...আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান,

একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আহ্নিকতর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড়ো আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসংগত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বারবার করিয়া কেবলই আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনোই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামতো যিনি যতবড়ো খুশি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে।

এ পর্যন্ত আমরা পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রসকলকে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে; কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই—এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন; কোনো দেবতা আয়ুর্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন—কোনো দেবতার মুখ-হস্ত-পদ হইতে

একেবারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে—সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারও কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেই জন্যেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জা বোধ হয় না—শিক্ষিত লোকেদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই—কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসংগত। কেননা কার্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এইজন্য সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ, শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমশায় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায় এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসংগত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা স্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এই জন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়—অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে—অন্য জায়গায় বড়ো জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কে এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।...

...শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড়ো একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষত এতদিন আমরা আমাদের যাহা কিছু সমস্তকেই নির্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—আজ তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান করি, কিন্তু তাহা নির্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কখনোই চিরদিন টিকিতে পারে না—এই প্রতিক্রিয়ার ঘাত প্রতিঘাত শান্ত হইয়া আসিবেই—তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।...

...একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর

দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল ; যাহা শ্লোক সংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মতো একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না ;—বৌদ্ধ যে সমাজের অংগ, জৈন যে সমাজের অংশ ; মুসলমান ও খ্রীস্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত ; যে সমাজের এক মহাপুরুষ একদা অনার্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক মহাপুরুষ কর্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়াছিলেন এবং ধর্মকে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পথে সর্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন ; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না ;— যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি ;—প্রাণের ধর্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ বর্জনের ধর্ম।

এই জন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্‌যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত ? কিন্তু সেই আশঙ্কামাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না।…

…জাগরণের প্রথম মুহূর্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারিদিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই—সেই জাগরণই চারিদিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজেকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব।…

র। ১৩। ১৭৯-৮৯

টীকা :

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন উত্থাপিত হয়, এই উত্থাপন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশন উপলক্ষে রিপন কলেজ হলে ২৯শে অক্টোবর ১৯১১ (১৩১৮) সালে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

জাতীয় শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. তপোবন। ৩. ছাত্রশাসনতন্ত্র। ৪. বিশ্বভারতী ১নং। ৫. বিশ্বভারতী ২নং। ৬. বিশ্বভারতী ৬নং। ৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. অজিত চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি ২নং। ১০. বিদ্যাসমবায়। ১১. শিক্ষার মিলন। ১২. বিশ্বভারতী ৪নং। ১৩. বিশ্বভারতী ৫নং। ১৪. বিশ্বভারতী ১০নং। ১৫. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৬. বিশ্বভারতী ১৭নং। ১৭. My Educational Mission ইত্যাদি।

১৯। বাংলাশিক্ষার অবসান

জীবনস্মৃতি, ১৯১১

…শিক্ষা জিনিষটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখ বিবরের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে-পাক-করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎ শক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।……

[জীবনস্মৃতি থেকে, বিশ্বভারতী ১৩৬৬, পৃঃ ৩৩]

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

মাতৃভাষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ন্যাশনল ফন্ড। ২. শিক্ষার হেরফের। ৩. প্রসঙ্গকথা (তিনখানি পত্র)। ৪. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি। ৫. ইংরেজি শেখা। ৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৮. শিক্ষার বাহন। ৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। ১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। ১১. ছাত্রসম্ভাষণ। ১২ বাংলা শিক্ষার প্রণালী ইত্যাদি।

২০। পিতৃদেব

জীবনস্মৃতি, ১৯১১

…শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা – বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি ; যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিসটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব-একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড় দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না তখন প্রচুর-ছবি-ওয়ালা একখানি **Old Curiosity Shop** লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো-আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়া-গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম ; পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া ততবড়ো শূন্য হয় নাই।…

[জীবনস্মৃতি থেকে, বিশ্বভারতী ১৩৬৬, পৃ ৪১]

টীকা ঃ

Old Curiosity Shop.

চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস, ১৮৪০—৪১।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. শিক্ষাবিধি। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫ নং। ১০. অসন্তোষের কারণ। ১১. বিশ্বভারতী ২ নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬ নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭ নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং ইত্যাদি।

২১। ধর্মশিক্ষা

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৩১৮ (১৯১২)]

বালক-বালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এ তর্ক আজকাল খৃস্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে।…

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাঁহা জীবনযাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বসিয়া যতই মন্ত্রণা করুক-না কেন, ধর্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।…

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল। তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা

ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না; তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ; শিক্ষার্থীও ছিল অল্প, এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে; সেই সঙ্গে বিদ্যার শাখাপ্রশাখাও চারি দিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্মযাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, সমস্ত য়ুরোপ-খণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদসাধনের জন্য তুমুল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না, কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ, বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারি দিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে; উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত, তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশুদ্ধ দৈববাণী, এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার সীলমোহরের স্বাক্ষর আছে, এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে, আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে—উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেঁকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

…এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্রপ্রকৃতিগত।

…আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, 'অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব,' বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো। তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে ; যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গ-রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্‌বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিসটিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো-একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে, তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানবসমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল ; সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই, তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

…কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না, এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে ; কারণ, আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো-একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নসুলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাহার স্থূল দেহের ঐক্য আছে, এ কথা আমি বারম্বার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম জায়গাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ ; তাহা বাসনার দিকে নয়, সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদিবা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে ; সে আপনাকে যদিবা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইতে চাহিতেছে ; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের ঊর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু, কেনই বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব ? কেনই বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব ?

এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে, যে ভাবটি ভরিয়া উঠে, তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ শুদ্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি ; তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারি একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য, এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া ? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমা-লিপ্ত আকাশের নীচে জন্মগ্রহণ করি নাই ; শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে তো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বদ্ধ করে নাই ; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে ; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না ; সূর্যোদয় যে ভক্তির পুজাঞ্জলির মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয় ; কী উদার নদীর ধারা, কী নির্জন গম্ভীর তাহার প্রসারিত তট ; অবারিত মাঠ রুদ্রের যোগাসনের মতো স্থির হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মতো তাহার দিগন্তজোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না ; এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্ত বায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশে এ-সমস্তই যে সত্য; চিরকালের সত্য। পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই-সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল, তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না ? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে ? আমরাই তো জগৎপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভু, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি আছে যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে ; সেইজন্যই অনন্তের বাঁশির সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পেঁৗছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্নানে আহারে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে, আমাদের কাব্যপুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে ; সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। নাহয় আজ যে কালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন ? নাহয়

আমরা কয়জন এই শহরের পোষ্যপুত্র হইয়া তাহার পাথরের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি, কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

…আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনোপ্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন-সকল আশ্রমের প্রয়োজন যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে, যেখানে বালকগণের অধিকার **কেবলমাত্র** খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে—তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ১০২—১২৩

টীকা :

ধর্মশিক্ষা

১১ই পৌষ ১৩১৮ সালে কলকাতায় সিটি কলেজে একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা ও অনুশীলন

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. জগদীশচন্দ্র বসুকে পত্র। ২. শিক্ষাসমস্যা। ৩. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৪. শিক্ষার আদর্শ। ৫. ধারাবাহী। ৬. আশ্রমের শিক্ষা। ৭ বিশ্বভারতী ১নং। ৮. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ৯. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১০ শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ১১. শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ১২. বিশ্বভারতী ১৮ নং। ১৩. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

২২। জগদানন্দ রায়কে পত্র ১নং

[রচনা—১০ আশ্বিন ১৩১৯
প্রকাশ—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪১ পৃঃ ৪—৫]

আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটা বড় জিনিষ লাভ করছে যেটা ক্লাশের জিনিষ নয়—সেটা হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে আনন্দ-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা করে না কিন্তু জীবনকে সার্থক করে। আমাদের ছেলেরা বৃষ্টিতে ছুটে বেড়ায়, জ্যোৎস্নারাত্রিতে আনন্দ ভোগ করে, তারা রৌদ্রকে ডরায় না; তারা গাছে চড়ে বসে পড়া করে, এগুলোকে আমি সামান্য জিনিষ মনে করিনে। চারিদিকের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া, আনন্দের ছোট বড় নানা যাতায়াতের পথ খুলে দেওয়া যে কত বড় লাভ তা বলে শেষ করা যায় না। এ যেন জগৎকে দান করা। আমরা হতভাগ্যরা বিদ্যাসাধ্য খ্যাতিমান টাকাকড়ি যত সহজে পাই জগৎকে তত সহজে পাইনে—আমরা যার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছি তাকেই হারিয়ে বসেছি—ঈশ্বর যা আমাদের দিয়ে বসেছেন তা আমাদের তুলে নেবার শক্তি নেই—এই অসাড়তাটার খোলস ভেঙে ফেলে ছেলেদের মন যাতে মুক্ত জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এখানকার মাটিতে জলেতে আলোতে অবাধে সঞ্চরণ করবার অধিকার লাভ করে এইটে আমি একান্ত মনে কামনা করি। বোলপুরের মাঠে আমাদের ছেলেরা এই জিনিষটা পাচ্ছিল—তারা নিজের ছোট ছোট মুঠো তুলে ভগবানের এই দক্ষিণ হস্তের দান গ্রহণ করছিল। তোমরা দেখো আমাদের বিদ্যালয়ে এই জিনিষটার যেন ব্যাঘাত না হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ের প্রত্যহ অব্যবহিত যোগই আমাদের বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড় বিশেষত্ব। এইটেকে কোনোমতে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে দেওয়া চলবে না।...

টীকা ঃ

জগদানন্দ রায়

জগদানন্দ রায়ের রচিত 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদানন্দের পরিচয় ঘটে। জগদানন্দ ১৩০৮ সালে বোলপুরে আসেন। সমগ্র জীবনই শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। বিজ্ঞান বিষয়ে এবং প্রাকৃতিক বিষয়েও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন—'গ্রহনক্ষত্র', 'প্রাকৃতিকী', 'বৈজ্ঞানিকী', 'পোকামাকড়', 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার', 'বাংলার পাখী' ইত্যাদি। জগদানন্দ রায় ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ১৯২১ সালে প্রথম সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। জন্ম—৩রা আশ্বিন ১২৭৬। মৃত্যু—১১ই আষাঢ় ১৩৪০।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

প্রকৃতি

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষাসমস্যা। ২. তপোবন। ৩. অজিত **তকুমারকে** পত্র ২নং। ৪. বিশ্বভারতী ৪নং। ৫. বিশ্বভারতী ১০নং। ৬. বিশ্বভারতী ১৪ নং। ৭. বিশ্বভারতী ১৭নং। ৮. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ৯. The School Master. ১০ A Poet's School ইত্যাদি।

২৩। শিক্ষাবিধি

[রচনা—৩১শে শ্রাবণ ১৩১৯, চ্যালফোর্ড
প্রকাশ—প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৯ (১৯১২)]

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইব, শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কি না তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত ; আর-এক দল বলিতেছে,

ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ; আর-এক দল বলিতেছে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত, এ দ্বন্দ্ব কোনোদিনই মিটিবে না, কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য—সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয় ; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই ; এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। এ কথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ, জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না—অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না ; অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থানপরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা ; এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ, আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে, কখনো শান্তি আসে ; কখনো ধনসম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয় ; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মানুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সৎশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাৎ হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।

অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো এক জন বা এক দল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো? যেমন নদী সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঁধা ঘাট একই জায়গায় আছে; খেয়ানৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। সুতরাং, ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, সুতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই; একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই; এখানে সে মানুষকে বলিতেছে, 'ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।' যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই, মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। তপস্যার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধূলিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল-সমেত মানিতেই হইবে, অথচ পাখিটা মরিয়া গেছে। দানাপানি নিয়ত জোগাইতেছি, অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিষ্যকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না এবং গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে—শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি।

এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে 'ব্যবহারত যথেচ্ছাচার করো কিন্তু প্রকাশ্যত তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই'। এমনতর মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার শ্রদ্ধা অন্য পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে সমাজের পনেরো আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জাবোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প; অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্যরূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়—মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে, অথচ সেই মুহূর্তেই অম্লানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্যবিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশুল কত অসাধ্যরূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতন কালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বন্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে—তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না, ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা

প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলংঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্য স্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিও, কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন, ডেভিড হেয়ার, ইঁহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না, তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া-প্রবেশের উপায় ছিল; তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পন্থায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সব চেয়ে প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই 'জাতীয়' বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না; তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়: তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য

সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকিতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় **গুরুকে** পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সংগে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃ: ১২৪-১২৯

টীকা :

শিক্ষাবিধি :

১৯১২ সালে ইংলণ্ড-প্রবাস কালে রচিত পত্র।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষাপ্রণালী, সর্বজনীন শিক্ষা

তুলনীয় প্রসংগ :

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসংগ কথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্ব-প্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪ শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭ পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং। ১০. অসন্তোষের কারণ। ১১. বিশ্বভারতী ২নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬ নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববংগে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০ শিক্ষার বিকিরণ। ২১ বিশ্ব-ভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ২৮. অজিত কুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ২৯. বিদ্যাসমবায়। ৩০. শিক্ষার মিলন। ৩১. বিশ্বভারতী ৪নং। ৩২. বিশ্ব-ভারতী ৫নং। ৩৩. বিশ্বভারতী ১০নং। ৩৪. বিশ্বভারতী ১৫নং। ৩৫. My Educational Mission ইত্যাদি।

২৪। জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং

[রচনাকাল—১০ ভাদ্র ১৩১৯ (১৯১২)
প্রকাশকাল—বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ পৃ—২৫৯]

……ছেলেদের মনকে চারিদিক থেকে উদ্বোধিত করে তোল। তাদের চিন্তার জড়ত্ব মোচন করে দাও। এইটেই সবচেয়ে দরকার। আমাদের মন ছেলেবেলা থেকে কোন খাদ্যই পায় না বলে চিরদিনের মত তাদের **ক্ষুধা** মরে যায়। আমাদের ছেলেদের মন যেন উপবাসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। তারা কেবল কলের শিক্ষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরবে এইদিকেই তোমাদের অধিকাংশ চেষ্টা প্রয়োগ করো না। মনের ভিতর দিয়ে জীবনের ভিতর দিয়ে তারা জগৎটাকে গ্রহণ করিতে পারে এমন শক্তি এমন আনন্দ তাদের মনে সঞ্চারিত করে দাও।……

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও জীবন

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষার হেরফের।
২. আকাঙ্ক্ষা।
৩. বিশ্বভারতী ৪নং।
৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং।
৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং।
৬. শিক্ষার সার্থকতা।
৭ আবরণ।
৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি।

২৫। লক্ষ্য ও শিক্ষা

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ (১৯১২)]

…যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী? সে কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে? তাহার আশা-তাপমানযন্ত্রে দুরাশার উচ্চতম রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে চক্ষুষ্মান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়।…

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই; কিন্তু সমাজে যতগুলি লোক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তি-সম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই ঐশ্বর্য।

এই পাশ্চাত্ত্য দেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্য সকলেই আপনার ধনুক-বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যাজ্ঞসেনীকে পাইবে, এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুলিতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে' তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতি-হীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে।

আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না; ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁওয়ার কতকগুলা কৃত্রিম নিরর্থক নিয়ম-পালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্য।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবত মনেই আসে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্যের অনুকরণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই'। পাখির ছানা তো বি. এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে; সে নিশ্চয় জানে তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বাসের সমতুল্য কীর্তি করিয়াছি।'

'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।...

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইস্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার

বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সংগে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়? কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই; পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপসে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমা-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অনুকূল অবস্থা মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে যাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়; এক দিকে যাহার ভাগে বেশি পড়ে অন্য দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোট বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক-না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে।…

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; এমন-কি, সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে।…

বর্তমানের ইতিহাসকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজন্য যখন আলোক আসন্ন তখনও অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু আমি তো স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাঁচিতেই হইবে; সেই আমাদের দুর্জয় প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিদ্র পাইতেছে সেইখান দিয়াই এখনি আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্রপ্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে।

...আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে—এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ১৩০-১৩৬

টীকা ঃ

লক্ষ্য ও শিক্ষা

ইংলন্ড-প্রবাস-কালে রচিত পত্র। চ্যালফোর্ড, গ্লস্টরশিয়র, ১৯শে অগস্ট ১৯১২।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য

শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও জীবন

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি ৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং। ১০. অসন্তোষের কারণ। ১১. বিশ্বভারতী ২নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১ নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭ নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪ The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২৮. তপোবন। ২৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৩০. প্রাক্তনী। ৩১. বিশ্বভারতী ৪ নং। ৩২. কলাবিদ্যা। ৩৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২ নং। ৩৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ৩৫. শিক্ষার সার্থকতা। ৩৬. শিক্ষার আদর্শ। ৩৭. বিশ্বভারতী ১৫ নং। ৩৮. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ৩৯ বিশ্বভারতী ১৮ নং। ৪০. শিক্ষার হেরফের। ৪১. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২ নং ইত্যাদি।

২৬। জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং

[রচনা—তারিখহীন (১৩২০, ১৯১৩ আনুমানিক),
প্রকাশ—বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬, পৃঃ ২৭৫-৭৬]

…একদিন আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তার মূল আশ্রয় ছিল পরাবিদ্যা—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনকেই মুখ্য লক্ষ্য করে সমস্ত বিদ্যাকে তার উপযুক্ত স্থান দেওয়া হত। মানুষের জ্ঞানকে ভক্তিকে শুভ বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করা হত না। অবশ্য তখন জ্ঞানের উপকরণ এত বহুবিস্তৃত ছিল না। এখন অনেক শিখতে হয় বলে শিক্ষা ব্যাপারকে ভাগ করতে হয়েছে ; কিন্তু মানুষের প্রকৃতিকে ত ভাগ করে ফেলা যায় না—হাতের দরকার বেড়েছে বলেই ত পাকে শুকিয়ে ফেল্লে চলে না। বিদ্বান মানুষ বা ব্যবসায়ী মানুষেরই খাতিরে পরম মানুষের চরম লক্ষ্যকে ত কোনো একটা মধ্যযুগের জীর্ণ বস্তার মধ্যে অনাবশ্যক ছাপ মেরে ফেলে রাখা যায় না। এই জন্যে আশ্রমেই মানুষকে শিক্ষা করতে হবে ইস্কুলে নয়। তার মুখ্য প্রয়োজনের সঙ্গেই তার গৌণ প্রয়োজনকে মিলিয়ে দেখতে হবে—বিচ্ছিন্ন করতে গেলেই মানুষের মর্মে আঘাত দেওয়া হবে—তাতে এমন সকল সমস্যার সৃষ্টি হবে কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা যার সমাধান সম্ভবপর হতে পারে না। এখনকার ইস্কুল বিদ্যাশিক্ষার কল কিন্তু কলের মধ্যে ত জীবনের সৃষ্টি হয় না,—মানুষের জীবনের প্রবাহকে চির জীবনের পথে পরিপূর্ণ করে তোলাই হচ্চে শিক্ষার লক্ষ্য।…

উল্লেখযোগ্য বিষয়/ মন্তব্য :

শিক্ষার লক্ষ্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. শিক্ষাসংস্কার। ৩. তপোবন। ৪. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৫. অসন্তোষের কারণ। ৬. আকাঙ্ক্ষা। ৭ প্রাক্তনী। ৮. বিশ্বভারতী ৪নং। ৯. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১০. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১১. কলাবিদ্যা। ১২. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ১৪. শিক্ষার সার্থকতা। ১৫. শিক্ষার আদর্শ। ১৬. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৭. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১৮. বিশ্বভারতী ১৭নং। ১৯. বিশ্বভারতী ১৮নং ইত্যাদি।

২৭। জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং

[রচনা—তারিখহীন (আনুমানিক ১৩২০, ১৯১৩),
প্রকাশ—বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ পৃঃ—২৭৮]

…মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ মুক্তিদান করতে যারা ভয় করে তারা মনুষ্যত্বের চরম সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।… আমরা ইস্কুলেই কি আর সমাজেই কি সকল ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে তাকে পঙ্গু করে কাজ চালাতে-চাই [।] সেইজন্যেই সেই রকম খুঁড়িয়ে চলা কাজও পেয়ে থাকি।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও স্বাধীনতা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।
২. জাতীয় বিদ্যালয়।
৩ প্রাক্তনী।
৪. বিশ্বভারতী ১০ নং।
৫. ধারাবাহী।
৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান।
৭. A Poet's School.
৮ The School Master ইত্যাদি।

২৮। জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং

[রচনা—তারিখহীন, ১৩২০/১৯১৩ ?
প্রকাশ—বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ পৃঃ ২৮১-৮২]

…আমরা একদিকে যেমন ইংরেজি সোপান, সংস্কৃত প্রবেশ, প্রভৃতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে থাকে থাকে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করি তেমনি সেই সঙ্গে উচিত অনেকগুলি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ একেবারে হুহু করে ছেলেদের পড়িয়ে যাওয়া। সেগুলো খুব তন্ন তন্ন করে পড়াবার একেবারেই দরকার নেই—তাড়াতাড়ি কোনোমতে

কেবলমাত্র মানে করে এবং আবৃত্তি করে পড়ে যাওয়া মাত্র। এ রকম করে পড়ে গেলে সব যে ছেলেদের মনে থাকে তা নয় কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাষার পরিচয়টা মনের ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠতে থাকে।…যেটুকু পড়বে সেটুকু সম্পূর্ণ পাকা করে পড়ে' তারপরে এগোতে দেওয়ার যে প্রণালী আছে, সেটা স্বভাবের প্রণালী নয়। স্বভাবের প্রণালীতে আমাদের মনের উপর দিয়ে পরিচয়ের ধারা দ্রুতবেগে বহে চলে যাচ্ছে, কিছুই দাঁড়িয়ে থাকছে না। কিন্তু সেই নিরন্তর প্রবাহ ভিতরে ভিতরে আমাদের অন্তরের মধ্যে পলি রেখে যাচ্চে। ছেলেরা মাতৃভাষা একটু ক'রে বাঁধ বেঁধে বেঁধে পাকা করে শেখে না—তারা যা জেনেছে এবং যা জানে না সমস্তই তাদের মনের উপরে অবিশ্রাম বর্ষণ হোতে থাকে—হোতে হোতে কখন যে তাদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়ে ওঠে তা টেরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতির প্রণালীর গুণ হচ্চে এই যে প্রকৃতি তার শিক্ষাকে কিছুতেই বিরক্তিকর ক'রে তোলে না। জীবন জিনিষটা চলতি জিনিষ—তাকে জোর করে একজায়গায় দাঁড় করাতে গেলেই তাকে পীড়ন করা হয়। আমি এটা বেশ বুঝতে পেরেছি ছেলেদের মনকে কোনো একটা জায়গায় ধরে রাখবার চেষ্টা করাই জড় প্রণালী—শিক্ষা ব্যাপারটাকে বেগবান করতে পারলে তবেই জীবনের গতির সঙ্গে তার তাল রক্ষা হয় এবং তখনই জীবন তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। এই জন্যে অসম্পূর্ণ পড়াকে ভয় করলে চলবে না, আসলে বিলম্বিত পড়াটাই পরিহার্য। মুস্কিল এই যে, আমরা প্রতিদিন পদে পদে পরীক্ষার দ্বারা ফল দেখে দেখে তবেই আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর সফলতার বিচার করি কিন্তু জীবন ব্যাপারের বিকাশ নিত্য দেখা যায় না—তার যে ফলটা অগোচর সেইটেই তার বড়ো সম্পদ—সেটা ভিতরে ভিতরে জমতে জমতে কাজ করতে করতে একদিন বাইরে অপর্যাপ্তভাবে বিকশিত হয়ে **ওঠে**।…

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষাপ্রণালী

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮ শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. অসন্তোষের কারণ। ১১. বিশ্বভারতী ২নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭ নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং ইত্যাদি।

২৯। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ১ নং

[রচনা—আরবানা ইলিনয়েস, ২৪ পৌষ ১৩১৯ (১৯১৩)
প্রকাশ—'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৭ প, ১৩৯]

…মানুষকে শ্রদ্ধা করাই হচ্চে মানুষের সকলের চেয়ে বড় সেবা।… আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের চিত্তকে এই শ্রদ্ধার দ্বারা জাগ্রত করতে চাই। কেননা মানুষের প্রত্যেকের মধ্যেই এই শ্রদ্ধার সামগ্রী আছে—সেই দেবতার পূজা করলেই সে দেবতা দর্শন দেন। ছেলেদের যদি আমরা শ্রদ্ধা করি তবে তাদের যেটি শ্রদ্ধেয় সেইটেই বড় হয়ে ওঠে। তারা পারবে না, তারা ফাঁকি দেবে এ কথাটা গভীরভাবে সত্য নয়—…ভিতরে শক্তি আছে তাকে তাগিদ করলে তবে সে দেখা দেয়—আমরা অনেক সময়ে কেবল তার উল্টোই করি—বিশেষত ছেলেদের উপর আমাদের জোর খাটে বলেই আমরা অল্প কারণে এবং নির্বিচারে তাদের অপমান করি—এই অপমানের দ্বারা তাদের মন্দকে আমরা যত আঘাত করি তার চেয়ে তাদের ভালোকে আমরা ঢের বেশি আঘাত করে থাকি। ছেলেদের আমরা দান করব তারা আমাদের কাছে গ্রহণ করবে এই আমাদের সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধ অনুসারে ছেলেরা আমাদের নীচে দাঁড়ায় বলেই তাদের সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার—এই জন্যেই শাস্ত্রে বিশেষ করে বলেছেন, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্—কেননা দাতার উচ্চ ভূমিটা দাতার পক্ষে বিপৎজনক—অশ্রদ্ধা সহজে এসে পড়ে। যারা আমাদের চেয়ে দুর্বল এবং অক্ষম তাদের সঙ্গে সর্বদা ব্যবহার করা যাদের কাজ অনেক সময়েই তারা বড়ত্বের অধিকারের চাপে আপনাকে খাটো করে ফেলে। আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতিদিন বিদ্যাদান করবার সময় মনে রাখব শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। বালকের মধ্যে যে বড়টি আছে, তার বাহ্য আকৃতি আপাতত ছোট বলে তাকে দেখবার দৃষ্টি যেন না হারাই।…

টীকা :

অজিতকুমার চক্রবর্তী

১৯০৪ সালে অজিত চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রূপায়ণে তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাখ্যাকার ছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্যপরিক্রমা' গ্রন্থ দুটি রচনা করেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের অংশবিশেষ এবং ক্ষিতিমোহন সেনের রচিত বাউলগানেরও ইংরাজি অনুবাদ করেন।

জন্ম—১৮৮৬, মৃত্যু—১৯১৮।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শ

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. জাতীয় বিদ্যালয়।
২. বিশ্বভারতী ১১ নং।

৩. বিশ্বভারতী ১৫ নং।
৪. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি।
৫ বাঁকুড়ায় ছাত্রদের উদ্দেশে ইত্যাদি।

৩০। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং

[রচনা—শিকাগো, তারিখহীন, (১৯১৩ ?)
প্রকাশ—'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৭, পৃ ১৪৩]

…আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ড যোগে আমরা ছেলেদের মানুষ করতে চাই। কতকগুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয় কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এটা যে কত বড় জিনিস তা এদেশে এলে আমরা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাইনে। আমাদের দেশে মানুষের যেমন একটা সামাজিক জাতিভেদ আছে—এদের দেশে তেমনি মানুষের চিত্তবৃত্তির একটা জাতিভেদ দেখতে পাই।… মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যোগ সাধনার প্রবর্তন করতে পারব না ? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না ?…

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

সর্বজনীন শিক্ষা, প্রকৃতি

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ২. শিক্ষাবিধি। ৩ বিদ্যাসমবায়। ৪. শিক্ষার মিলন। ৫. বিশ্বভারতী ৪ নং। ৬. বিশ্বভারতী ৫ নং। ৭. বিশ্বভারতী ৬ নং। ৮. বিশ্বভারতী ১০ নং। ৯ পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১০. বিশ্বভারতী ১৫ নং। ১১. বিশ্বভারতী ১৭ নং। ১২. My Educational Mission. ১৩. শিক্ষা-সমস্যা। ১৪. তপোবন। ১৫. জগদানন্দ রায়কে পত্র ১নং। ১৬. বিশ্বভারতী ১৪ নং। ১৭. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ১৮. The School Master. ১৯. A Poet's School ইত্যাদি।

৩১। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ১নং

[রচনা—আরবানা ইলিনয়েস, তারিখহীন, (১৯১৩ ?)
প্রকাশ—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৪৯ পৃ, ২৮৯]

...তোমাদের ছেলেরা **সব্‌জির** বাগান করেছে এ খবরটি পেয়ে আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি যখন ফিরে যাব তখন আশা করচি আমি দেখতে পাব আমাদের বিদ্যালয়ের চারিদিকের ভূমি প্রসন্ন এবং গাছপালা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে—তখন আশ্রমের কোথাও কোনো অনাদরের চিহ্ন দেখতে পাব না। ততদিনে তোমাদের রাস্তাগুলি পরিপাটি এবং গাছের তলা **পরিষ্কৃত** হয়ে গেছে। সব চেয়ে আমি আশা করে আছি আমাদের আশ্রমবাসিদের সমস্ত দৈনিক কর্তব্যগুলি সুবিহিত সুশৃঙ্খল হয়ে এসেছে। ছাত্ররা যাতে নিজের চেষ্টায় সমস্ত কর্মকে প্রণালীবদ্ধ করে তুলতে পারে সেইদিকে তাদের উৎসাহিত কোরো। বাইরের শাসনে নয় কিন্তু নিজের কর্তৃত্বে তারা সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা উদ্ভাবন করবে এইটেই সব চেয়ে প্রার্থনীয়। কি করলে সবচেয়ে সুব্যবস্থা হতে পারে এই সমস্যা সমাধানের ভার তাদের উপরেই দাও এবং তাদের ব্যবস্থামত চলবার জন্যে তোমরাও প্রস্তুত হও। সমস্ত জিনিষ গড়ে তোলবার ভার তাদের হাতে দিতে থাক—কেননা এই গড়ে তোলাই যে একটা মস্ত শিক্ষা এবং এটা বিশেষভাবে ছাত্রদেরই জন্যে আবশ্যক। এ সম্বন্ধে মনে তোমরা কোনো সংকোচ রেখো না—এই ছাত্ররাজক শাসনপ্রণালীকে যদি তোমরা পাকা করে তুলতে পার তবে সে একটি মস্ত জিনিষ হবে।...

টীকা ঃ

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের অন্তরংগ সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। পরে আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। ১৯১০ সালে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনের পূর্ব প্রান্তে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের তত্ত্বাবধানে 'শিক্ষাসত্র' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়।

জন্ম—১৮৮৬। মৃত্যু—১৯২৬।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও গঠনমূলক আদর্শ

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১. অজিত চক্রবর্তীকে পত্র ৩নং।
২ শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি।
৩. আশ্রমের শিক্ষা ইত্যাদি।

৩২। স্ত্রীশিক্ষা

[সবুজপত্র, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২ (১৯১৫)]

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই—

এক দল লোক বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়া সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর-এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘরসংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে, তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার, যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন, তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পংক্তিতে পড়েন না ; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব, গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন ; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।—

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা; অহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে—শুদ্ধ কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিম্বা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানবপ্রকৃতিকেই দুর্বল করি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল, এ কথা জানিলে পুরুষের পৌরুষ কমে না। তেমনি, বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে, মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই-যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিম্বা টেক্স্ট্বুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি বা কাণ্ট্ হেগেল্ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে

হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী ?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের কর্ম যেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা **বলেন,** পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই-যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব ; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিঁকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই ; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু, সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও

তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালো বাসুক আর না-বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে, সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর-কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে, বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্যন্তই যাক, সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার 'সংকটে সুহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন'।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ১৩৭-১৪১

টীকা ঃ

লীলা মিত্র

রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহধর্মিণী।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

স্ত্রীশিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।
২. ভক্তি দেবীকে পত্র ইত্যাদি।

৩৩। শিক্ষার বাহন

সবুজপত্র, পৌষ ১৩২২ (১৯১৫)]

...দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই-যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়, সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক; কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ—যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যা-বিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি।...বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পণ্ড এবং কুনো, পশ্চিমেও পেডান্‌ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা; যে

দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু এ কথা মানিতে হইবে, তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষি কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক, সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেঁচ পাইত। সুতরাং, এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্, ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু, আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোট্‌বুকেই আছে, সে কি চিন্তায়, কি কাজে, ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত, যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয়, এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন, কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই, তার চলা-ফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না।…

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর-কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সে দিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে 'নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে' তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি অনিষ্টকর। 'জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না' এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।…

বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফ্‌তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আট্‌কা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাতে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি ঃ আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা

বাংলাভাষায় দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে 'গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্' ।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে ? ভরসা করিয়া এটুকু কোনো-দিন বলিতে পারিব না যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে ? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ, জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, স্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলাভাষার প্রবেশ-নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতেই সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স, তার উপরে দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই-যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে ? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল ? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র ? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না ? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই ?

বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই, শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল

ইংরেজি কেন, ফরাসি জর্মন শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিম্বা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্ মুখে বলা যায় ?···

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা এক্‌জামিন পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙোটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে।···

আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আমদরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী ? আহূত যারা তারা ভিতর-বাড়িতেই বসুক, আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাতিয়া বসিয়া যাক্‌-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল নাহয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী ? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে ? অভিশাপ লাগিবে না কি ?

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলাভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর-একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি, এক দল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনোমতে এন্‌ট্রেন্‌সের দেউড়িটা তরিয়া যায়, উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই ; ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয় ; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানেরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়, কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ

মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আন্দামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলন্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মুলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত, কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হোক, ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাওড়ার পুলটাই নাহয় দুফাঁক হইল, কিন্তু কোনো রকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? স্টীমার না হয় তো পানসি?

ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত এক রকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায়, তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশী লোক ঝুঁকিবে তা জানি এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তা হোক, বাংলাভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না, কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন? ...

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিম্বা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয়

তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দু পা ও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা-তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?…

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অংকুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে!

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এসত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায় যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না তার প্রধান কারণ, আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না; আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপুর্তি করে না।

সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়গোছের সীলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ।

মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালের ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে-ঢালাই-করা রীতিনীতি চাল-চলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই ; ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়, কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিম্বা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলাবিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয়, যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলাভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দু দিন না যাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা-সাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল—তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল—কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয় ; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ, বাংলাসাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই-সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রীখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে। এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে, এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া, বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁওয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস আদালত, পুলিশের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক্-না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে, ছায়া চাহিতেছে, সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি-না কেন? গুরুর চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা-তক্ষশিলা, ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল-চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীব-লোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্-না কেন? ...

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭০, পৃঃ ১৪২-১৫৭

টীকা ঃ

শিক্ষার বাহন

অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সালে রামমোহন লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

মাতৃভাষা, শিক্ষার বিকিরণ, বিশ্ববিদ্যালয়।

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. ন্যাশনল ফন্ড। ২. শিক্ষার হেরফের। ৩. প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৪. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি। ৫. বাংলা শিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)। ৬. ইংরেজি শেখা। ৭. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৮. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। ১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। ১১. ছাত্রসম্ভাষণ। ১২. পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি। ১৩. রাশিয়ার চিঠি। ১৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ১৫. পল্লীসেবা। ১৬. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১৭. বাংলা শিক্ষার প্রণালী ইত্যাদি।

৩৪। ছাত্রশাসনতন্ত্র

[সবুজপত্র, চৈত্র ১৩২২ (১৯১৬)]

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়। আর-একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।···

কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতরো ঘটনা বিশেষ ভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটা খাপছাড়া খেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্রবের জোর তার 'পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সংগপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যই আমাদের দেশে বলে : প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরাপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে, কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এইজন্যই সকল দেশেই য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সে সুযোগে তাদের জীবনের 'পরে মানব-সংস্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্ম-সম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে। যেখানে

ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয় ; কেননা, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। **মিশনারি** কলেজের বিধাতা-পুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্‌বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারও বাধে না ; কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না ; কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দারি যে করে সে মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটিমাত্র সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফর্মাশ তার উপরে। সুতরাং, সেই কলের হিসাবে যে-কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না ; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে ; তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরি কলেজের ওঝাটির মতো ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, চীৎকার করিয়া, তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না ; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে ; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেণ্ট্‌ বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের

ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন ; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা ; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃস্ট বলিয়াছেন, 'শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।' তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা, শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে ; বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড়ো কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে ; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই ; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই জনই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বের দিকে উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণমনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল ; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাত-**প্রতিঘাতের** ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এইজন্যই চারিদিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানবস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকলপ্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনোই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষে বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে ? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি

তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই ; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম ভাষা আচার সমস্তই স্বতন্ত্র। তার উপরে, এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তার সংগে সংগেই চলিতে থাকে ; এজন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব, একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত-উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন—এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, 'তুমি এই পর্যন্ত আসিবে তার ঊর্ধ্বে নয়', তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে, 'তোমরা হঠো, হঠো, আরো হঠো।'

তাই বলিতেছি এ কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে যে, নানা অনিবার্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্‌ব্রিজে অক্‌স্‌ফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কী! সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত আছে সেখানে শাসনের ইঁটপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এইজন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, 'বাপু, তোমরা কোনোমতে এগ্‌জামিন পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকো, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।'

এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না ; মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে ; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কাঁচা তারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেঁকে না।

অতএব, স্বভাবকে যদি কেবল এক পক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয়, সেই এক-তরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে।

তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয় ; যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েত তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না ; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, 'কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, স্টীম্‌রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি করো।'

কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝিঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তার পরে লোহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইস্‌টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুমরুতে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকামরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তার পরে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম 'জীবন সার্থক হইল'। জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেঁকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু টিঁকিল না। তার কারণ, আমরা তো কেবলমাত্র খৃষ্টানকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্যব্রতধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলন্‌ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা তো বন্ধ্যা নহে, নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তার পরে সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অন্নপানীয়ের দাবি করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।...

ইংলন্‌ড্‌ যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্‌সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি নোট কুড়ানোর উঞ্ছবৃত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবেই ; আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না ; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরও বেশি করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলন মাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড়ো কথা আছে, সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও

বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্য-সভ্যতাও যেমন সত্য দ্রাবিড়সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দুও যত বড়ো মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্পসংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মতো ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন 'আমি'র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্ফটিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্তিহীন; আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নীচে, এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে; তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মতো একটা সর্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য আছে দ্রাবিড় আছে, যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে, তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ইতিহাসের এই-সমস্ত অংশগুলি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো-একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই, ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাববশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই; তাহা কোনো এক-জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই-যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশ ইংলন্ড্ নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়, সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাত। ও-সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজেরা ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনৈক্য লইয়াই প্রথম হইতে শুরু করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই লইয়াই আমরা কী করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব, স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা; বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব, স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।…

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্‌বোধিত করে।

সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।…

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালি ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কী, একদিন ইংলন্ডে থাকিতে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন ; প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন-কি, তাঁর মনে হইল ইংলন্ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি। য়ুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম, আমি বাংলাদেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্মই যে বাংলাদেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্ সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু, যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে 'নিদারুণ'। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।…

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালি ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবযুগের বাঙালি যুবক ইংরেজজাতির 'পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যে ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজ গুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে।…

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ১৫৮—১৭০

টীকা :

ছাত্রশাসনতন্ত্র

হিন্দু হস্টেলের প্রতিষ্ঠাদিবসে ওটেন (Edward Farley Oaten) সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণকে উপলক্ষ্য করে তরুণ ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয় এবং কয়েকজন ছাত্র ওটেনকে আক্রমণ করেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর নামও শোনা যায়। তবে ঘটনাকালে

তাঁর উপস্থিতির বিষয় সন্দেহের অবকাশ আছে। এইরূপ আক্রমণের জন্য ছাত্রদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ (১৯১৬) সালে 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধটি রচনা করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

জাতীয় শিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।
২. তপোবন।
৩. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. বিশ্বভারতী ১নং।
৫. বিশ্বভারতী ২নং।
৬. বিশ্বভারতী ৬নং।
৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা ইত্যাদি।

৩৫। তোতাকাহিনী

[সবুজপত্র, মাঘ ১৩২৪]

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত ; জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'…

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

.. দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না ; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই ; কেবল রাশি রাশি পুঁথি

হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

লিপিকা, পৃঃ ৯৫-১০১

টীকা ঃ

তোতাকাহিনী

'লিপিকা'য় রূপক-জাতীয় গল্প আকারে সংকলিত রচনার অংশ।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী

তুলনীয় প্রসঙ্গ

১. মেঘনাদবধকাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্ব-প্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫ নং। ১১ অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪ আকাঙ্ক্ষা। ১৫. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৬. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. আলোচনা। ২১. শিক্ষার বিকিরণ। ২২. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২৩. আশ্রমের শিক্ষা। ২৪. A Poet's School. ২৫. The School Master. ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং ইত্যাদি।

৩৬। **প্রাক্কনী (৫)**

[৮ পৌষ ১৩২৫ এর ভাষণ

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, পৌষ ১৩৪৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩৬৮, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৮১১—১২]

…প্রত্যেক দেশেরই নিজের শিক্ষাবিধি পরিচালনা করবার অধিকার আছে—সে বিষয়ে আমাদের খর্বতা দেখে গ্লানি অনুভব না করে থাকতে পারি না। আমাদের শিক্ষায় বাইরের দিক থেকে চাপ পড়েছে, বিদেশী যে বুলি বলাচ্ছেন তাই বলছি। কথা হতে পারে, বিদ্যার তো বিশেষ একটা জাতীয়তা নেই, অতএব আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির কোনো দোষ নেই। কিন্তু মনকে তো স্বাধীন রাখতে পারা চাই। বাল্যকাল

থেকে যা শিখছি যা শুনছি, তাই ঘাড় পেতে নিচ্ছি—বাইরের আত্মকর্তৃত্ব এবং অন্তরে শক্তির অভাবে জীবনে আমাদের গভীর অবসাদ এসেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের দেশে অনেক এন্‌জিনিয়র অনেক উকিল হয়েছে, কিন্তু মাথা হেঁট হয় যখন ভাবি, খালি মুখস্থ করেছি এবং ডিগ্রি পেয়েছি কিন্তু পৃথিবীকে কিছুই দিই নি।...

টীকা ঃ

প্রাক্তনী

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। উক্ত ভাষণটি শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় ৮ই পৌষ, ১৩২৫ সালে প্রদত্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও স্বাধীনতা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।
২. জাতীয় বিদ্যালয়।
৩. বিশ্বভারতী ১০নং।
৪. ধারাবাহী।
৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান।
৬. The School Master.
৭. A Poet's School.
৮. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং।
৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৩নং ইত্যাদি।

৩৭। মৈসুরের কথা

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৬ (১৯১৯) পৃঃ ৩]

…আমাদের দেশে বর্তমানে দুইরকমের ভীরুতা দেখা যায়। কাহারো ভীরুতা দেশী প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে, কাহারো ভীরুতা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে। যাঁহারা এই দুই ভীরুতাকেই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই ভারতবর্ষকে বাঁচাইবেন।…

টীকা ঃ

মৈসুরের কথা

মহীশূরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে রচিত।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. তপোবন।

২. শিক্ষার মিলন ইত্যাদি।

৩৮। ইংরেজী শেখা

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৬ (১৯১৯) পৃঃ ৪]

যে বয়সে আমরা মাতৃভাষা শিখি সেই নিতান্ত শিশুবয়সে সহজবোধই আমাদের একমাত্র সম্বল। এই সহজবোধের শক্তি যে কত প্রবল তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, এই সহজবোধের সাহায্যে শিশু চার পাঁচ বছরের মধ্যে তার সংসারজ্ঞানের ভিত্তি এবং জীবনযাত্রার সমস্ত অভ্যাসগুলির মূল পত্তন করিয়া লয়। অথচ এজন্য তাহাকে কোনো প্রয়াস করিতে হয় না।

শিশুর পক্ষে এই সহজবোধের প্রবলতার কারণ এই যে, কোনো পূর্বসংস্কার তাহার এই বোধকে বাধা দেয় না। মনে একবার যখন সংস্কার জন্মিয়াছে তখন সেই সংস্কারের সঙ্গে বোঝাপড়া না করিয়া আর আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। তখন হইতে নূতন জ্ঞানের বিষয় আমাদের সম্মুখে আসিলে, হয় আমাদের পূর্বসংস্কার পাকা হইতে থাকে, নয় তাহার পরিবর্তন ঘটে।…

আমরা মাতৃভাষা যখন শিখি তখন কোনো ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংস্কারই নাই। এই কারণে এই শিক্ষার প্রণালীই বিশুদ্ধ অপরোক্ষপ্রণালী। তাহার পরে আমাদের সাত বা আট বছর বয়সে যখন বিদেশী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি

তখন ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মনের সংস্কার পাকা হইয়া গেছে। তখন সেই পূর্ব-সংস্কার আমাদিগকে পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না।

নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের সংস্কারের পরিবর্তন বা বিস্তার ঘটিতে থাকে, তখন তাহাতে মনের ভার বৃদ্ধি করে না।

কিন্তু ভাষার সংস্কার এ জাতের নয়। মাতৃভাষার এবং ইংরেজি ভাষার সংস্কার চিরদিনই পাশাপাশি বিরুদ্ধ হইয়া বাস করিবে—একটা আর-একটাকে আত্মসাৎ করিয়া লইবে না। এইজন্যই পরভাষা শেখা এবং তাহাকে ব্যবহার করা এত দুঃখ।

এমন স্থলে আমাদের মন কি করে? দুইকে যখন সম্পূর্ণ এক করিয়া দিয়া সে ভার লাঘব করিতে না পারে তখন দুই স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ঘটাইতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধকে বলিব তুলনার সম্বন্ধ। যে ভাষা শিখিতেছি সে ভাষা আমার মাতৃভাষার সঙ্গে কোন্‌খানে মেলে এবং কোন্‌খানে মেলে না ইহাই স্পষ্ট করিয়া জানার দ্বারাই নূতন ভাষা আয়ত্ত করা স্বাভাবিক প্রণালী। যাহা জানি তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়াই, যাহা জানিতেছি তাহাকে আমরা জ্ঞানের অঙ্গ করিয়া লই।

সাত আট বছর বয়সে যে বাঙ্গালীর ছেলে ইংরেজি শিখিতেছে তাহার পক্ষে ওই ভাষা একটা বিষম উৎপাত। ওই বয়সের ইংরেজের ছেলের পক্ষে ফরাসী বা জার্মান ভাষা তেমন উৎপাত নহে। ইংরেজি শিক্ষাতত্ত্ব গ্রন্থে Foreign language শিক্ষা বলিয়া যে আলোচনা আছে তাহা ইংরেজের পক্ষে য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা। সে আলোচনা যে আমাদের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে না, সে কথা মনে রাখা দরকার। আমরা যখন হিন্দি শিখি তখন সেই পরিচ্ছেদের পরামর্শ গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। ইংরেজি ভাষাকে সম্পূর্ণ অপরোক্ষ প্রণালীদ্বারা শিক্ষা দিতে গেলে বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে যে প্রভুত সময়ের প্রয়োজন হয় সে সময় দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব।...

তাই আমরা মনে করি যতদূর সম্ভব মাতৃভাষার সঙ্গে বার বার তুলনা করিতে করিতে বাঙ্গালীর ছেলেকে ইংরেজি শেখানো উচিত—অর্থাৎ যে ভাষা সে জানে সেই ভাষারই পটভুমিকার উপরে অন্য ভাষাটাকে নিক্ষেপ করিয়া দেখাইলে তাহার চোখে অন্য ভাষাটা ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।...

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

মাতৃভাষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ন্যাশনল ফণ্ড।
২. শিক্ষার হেরফের।
৩. প্রসঙ্গকথা (তিনখানি পত্র)।
৪. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

৫. বাংলা শিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)।
৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।
৮. শিক্ষার বাহন।
৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ।
১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ।
১১. ছাত্রসম্ভাষণ।
১২. বাংলা শিক্ষার প্রণালী ইত্যাদি।

৩৯। বিশ্বভারতী ১নং

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৬ (১৯১৯)]

…সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেই একচেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা

ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই-সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানেই স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে; সেই উৎসধারার নির্ঝরিণী-তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে-প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবন-যাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

বিশ্বভারতী (১৯৬৩), পৃঃ ৭-১০

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ১নং

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রিত হয়ে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় (১৩২৬, বৈশাখ) উক্ত আদর্শ সংক্ষিপ্তাকারে 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়। (১) সংখ্যক রচনাটি উক্ত রচনারই অপরিবর্তিত রূপ।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

সার্থক শিক্ষা, শিক্ষা ও অনুশীলন, জাতীয় শিক্ষা, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা, শিক্ষা ও জনজীবন।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ধর্মশিক্ষা। ২. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ৩. শিক্ষার আদর্শ। ৪. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ৫. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ৭. বিশ্বভারতী ১৮ নং। ৮. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ৯. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ১০. তপোবন। ১১. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ১২. ছাত্রশাসনতন্ত্র। ১৩. বিশ্বভারতী ২নং। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. আশ্রমের শিক্ষা। ১৬ শিক্ষার সার্থকতা। ১৭. The School Master ইত্যাদি।

৪০। অসন্তোষের কারণ

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (১৯১৯) পৃঃ ৫]

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অসন্তোষ জন্মিয়াছে। কেন সেই অসন্তোষ? দুইটি কারণ আছে; একটা বাহিরের, একটা ভিতরের।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা। অনেক দিন হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতকাল ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সে দিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারে অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি।

এই তো গেল বাহিরের দিকে নালিশ। ভিতরের দিকের নালিশ এই যে, এত কাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না। বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান-পানের

উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা কোনো নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিহীনতা আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।

অথচ, বুদ্ধির এই কৃশতা নির্জীবতা যে আমাদের প্রকৃতিগত নয় তার বর্তমান প্রমাণ : জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ব্রজেন্দ্র শীল। আমাদের শিক্ষার একান্তদীনতা ও পরবশতা-সত্ত্বেও ইঁহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা বিশ্বজ্ঞানের মহাকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, অতীত কালের একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নানা শাখায় প্রশাখায়, নানা পরীক্ষায় ও উদ্ভাবনায় বিচিত্র বৃহৎ ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরের-ইস্কুলে-শেখা চিকিৎসাবিদ্যায় আজ আমাদের এত ক্ষীণতা ও ভীরুতা কেন!

ইহার প্রধান কারণ, ভাণ্ডারঘর যেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমনি করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহার্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ভাণ্ডারঘর যাহা-কিছু পায় হিসাব মিলাইয়া সাবধানে তাহার প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেষ্টা করে। দেহ যাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে অঙ্গীকৃত করিবার জন্য। তাহা গোরুর গাড়ির মতো ভাড়া খাটিয়া বাহিরে বহন করিবার জন্য নহে, তাহাকে অন্তরে রূপান্তরিত করিয়া রক্তে মাংসে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য। আজ আমাদের মুশকিল হইয়াছে এই যে, এই এত বছরের নোটবুকের বস্তা-ভরা শিক্ষার মাল লইয়া আজ আমাদের গোরুর গাড়িও বাহিরে তেমন করিয়া ভাড়া খাটিতেছে না, অথচ সেটাকে মনের আনন্দে দিব্য পাক করিয়া ও পরিপাক করিয়া পেট ভরাই সে ব্যবস্থাও কোথাও নাই। তাই আমাদের বাহিরের থলিটাও রহিল ফাঁকা, অন্তরের পাকযন্ত্রটাও রহিল উপবাসী।...

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই, নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এত দিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।

অনেক কাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।

শিক্ষাকে কেমন করিয়া সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যায়, সেই কথার আলোচনা যথাসাধ্য ক্রমে ক্রমে করা যাইবে।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৩ পৃঃ ১৭১-৭৩

টীকা :

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রখ্যাত রসায়নবিদ। ভারতবর্ষে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় স্থপয়িতা। আচার্য পি. সি. রায় নামে সমধিক পরিচিত।

জন্ম—১৮৬১, মৃত্যু—১৯৪৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

বিখ্যাত দার্শনিক। ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি হন। জন্ম—১৮৬৪, মৃত্যু—১৯৩৮।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাপ্রণালী

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. বিশ্বভারতী ২নং। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৫ নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২৮. তপোবন। ২৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৩০. প্রাক্তনী ২নং। ৩১. কলাবিদ্যা। ৩২. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ৩৩. শিক্ষার সার্থকতা। ৩৪. শিক্ষার আদর্শ। ৩৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ৩৬. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ৩৭. বিশ্বভারতী ১৭ নং। ৩৮. বিশ্বভারতী ১৮ নং ইত্যাদি।

৪১। বিশ্বভারতী ২নং

[ভাষণ ১৮ আষাঢ় ১৩২৬,
শান্তিনিকেতন পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬ (১৯১৯)]

…আমার মনে এই কথাটি ছিল যে পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে ; সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশরকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে ; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে—সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো-একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি তা হলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।

সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ-লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমন-কি তখনকার কোনো কোনো পুরনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন।

তারপরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে, তবু কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষার কপালে—পিঠে এখনও অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবর্দস্তি আছে বলেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে—আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব-ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, তা হলেও, সেটাও কেমনতরো বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচেনি; কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর করে তুলেছি।

যাই হোক, মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। …

আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার ওপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে।

বিশ্বভারতী ১৯৬৩ পৃঃ ১১-১৭

টীকা :

বিশ্বভারতী ২নং

বিশ্বভারতীর প্রারম্ভোৎসবের দিনে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ প্রদান করেন, 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩২৬) 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়। ২ সংখ্যক রচনাটি উক্ত রচনার পুনর্মুদ্রিত রূপ।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাপ্রণালী, জাতীয় শিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিদ্যার যাচাই। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ১নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮ জনৈক **অধ্যাপককে পত্র** ; ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০ শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতা-কাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২৮. তপোবন। ২৯. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ৩০. ছাত্রশাসনতন্ত্র। ৩১. বিশ্বভারতী ৬নং ইত্যাদি।

৪২। বিদ্যার যাচাই

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ় ১৩২৬ (১৯১৯) পৃঃ ৩]

আমার মনে আছে, বালককালে একজনকে জানিতাম তিনি ইংরেজিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষভাগের ছাত্র। ডিরোজিয়ো প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন। তিনি জানি না কী মনে করিয়া কিছুদিন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে তিনি মনে একটা শ্রেণীবিভাগ-করা ফর্দ লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার মধ্যে পয়লা দোসরা এবং তেসরা নম্বর পর্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্দ তিনি আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া মুখস্থ করিতে বলিলেন। তখন আমাদের যেটুকু ইংরেজি জানা ছিল তাহাতে পয়লা নম্বর দূরে থাক্‌ তেসরা নম্বরেরও কাছ ঘেঁষিতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হইতেই আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেওয়াতে দোষ ছিল না। কেননা, রুচিরসনা দিয়া রসবিচার ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নহে। যেহেতু আমাদিগকে চাখিয়া নহে কিন্তু গিলিয়া খাইতে হইবে, কাজেই কোন্‌টা মিষ্ট কোন্‌টা অম্ল সেটা নোটবুকে লেখা না থাকিলে ভুল করার আশঙ্কা আছে।...

আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদিগকে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়। যে কবির যে দর আধুনিক বাজারে প্রচলিত আছে তাহার উল্টা বলিলেই আহাম্মক বলিয়া দাগা পড়ে, এইজন্য বিদেশের সাহিত্যের বাজার-দরটা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। নহিলে আমাদের ইস্কুল-মাস্টারি চলে না, নহিলে মাসিকপত্রে ইব্‌সেন মেটার্লিঙ্ক্‌ ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়িবার বেলা লজ্জা পাইতে হয়। শুধু সাহিত্য নহে, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্তনশীল বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অবিকল তাল মিলাইয়া যদি না চলি; যদি জন স্টুয়ার্ট মিলের মন্ত্র কার্লাইল-রাস্কিনের আমলে আওড়াই, বিলাতে যে সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাওয়া বদল হইয়াছে সেই সময় বুঝিয়া আমরাও যদি সংঘবাদের সুরে কণ্ঠ না মিলাই, তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কুলের মাস্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘ কাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারিদিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে ; তার কারণ যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে। এইজন্য

মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে; এইজন্য নিজের হিসাব-মত সে মূল্য দেয় এবং কোন্‌টা লইবে কোন্‌টা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই, জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের 'পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এইজন্যই ইস্কুলমাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এতকাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩ পৃঃ ১৭৪-৭৫

টীকা ঃ

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (Henry L.V. Derozio)

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। প্রখর যুক্তিবাদী; স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা; ভারতপ্রেমিক, হিন্দুকলেজের খ্যাতনামা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অধ্যাপক। তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের জন্য পরে তিনি হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

জন্ম—১৮০৯, মৃত্যু—১৮৩১।

ইবসেন (Ibsen Henrik)

নরওয়ের কবি ও নাট্যকার।

জন্ম—১৮২৮, মৃত্যু—১৯০৬।

মেটারলিঙ্ক (Maeterlinck Maurice)

বেলজিয়ামের কবি, নাট্যকার ও প্রবন্ধলেখক।

জন্ম—১৮৬২, মৃত্যু - ১৯৪৯।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)

ইংরেজ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ্‌।

জন্ম—১৮০৬, মৃত্যু—১৮৭৩।

রাস্কিন (Ruskin John)

ইংরেজ শিল্পসমালোচক ও সমাজতত্ত্ববিদ।

জন্ম —১৮১৯, মৃত্যু—১৯০০।

কার্লাইল (Carlyle Thomas)

ইংরেজ প্রবন্ধলেখক ও ঐতিহাসিক।

জন্ম—১৭৯৫, মৃত্যু—১৮৮১।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষা ও মৌলিকতা, বিদ্যার যাচাই

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬ আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং ইত্যাদি।

৪৩। বিদ্যাসমবায়

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬ (১৯১৯) পৃঃ ২]

এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে 'রিভার' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তাহার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনো দিন সে কোনো রিভার দেখিয়াছে কি না, তখন গঙ্গাযমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, 'না, আমি দেখি নাই।' অর্থাৎ এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া, পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন

জিনিস নয়, তাহা বহুদূরবর্তী ; অথবা তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফি বিদ্যা হইতে বাদ দিয়াছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে এ শিখিয়াছিল যে, যে দেশে তাহার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলবিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার রিভারও রিভার্। কিন্তু মনে করা যাক, তার বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যন্ত এই খবরটি সে পায় নাই—শেষ পর্যন্তই সে জানিয়াছে যে আর-সকল জাতিরই দেশ আছে, কেবল তারই দেশ নাই—তবে কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর জিয়োগ্রাফি অস্পষ্ট ও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, তাহার মনটা অন্তরে অন্তরে গৃহহীন গৌরবহীন হইয়া রহিবে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফি-পণ্ডিত আসিয়া কথাচ্ছলে তাহাকে বলে যে 'তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড়ো দেশ আছে, তার হিমালয় প্রকাণ্ড বড়ো পাহাড় তার সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রকাণ্ড বড়ো নদী', তখন হঠাৎ এই-সমস্ত খবরটায় তাহার মাথা ঘুরিয়া যায় ; নূতন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করিতে পারে না ; অনেক কালের অগৌরবটাকে একদিনে শোধ দিবার জন্য সে চীৎকারশব্দে চার দিকে বলিয়া বেড়ায়, 'আর-সকলের দেশ দেশমাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।' একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে 'পৃথিবীতে আর-সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই' তখনও বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞানকৃত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল ; আর আজ যখন সে মাথা তুলিয়া অসংগত তারস্বরে হাঁকিয়া বেড়ায় যে 'আর-সকলের দেশ আছে, আর আমাদের আছে স্বর্গ" তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সুতরাং তাহা মার্জনীয় ; এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং তাহা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত, ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব-পিছনে ; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর-সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশবিবর্জিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন্ ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না ; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। অহংকারের আঁধি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন, এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল

ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে,
সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই
নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদীই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া
সলিটারি সেলে থাকে। সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই
সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গৌরবের
কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম
করিয়া একঘরে করা যায়—এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই
ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। ··

শিশু যে সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা
করিয়াই মানুষ করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভৃত, তাহার দোলাটি নিরাপদ।
কিন্তু, তাহাকে যদি চিরদিনই ঢাকাঢুকি দিয়া ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল করিয়া
রাখি তাহা হইলে উলটা ফল হয়। অর্থাৎ, যে শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও
সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার
নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া উঠে। শুঁটির মধ্যে যে
বীজ লালিত হইয়াছে খেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চীন পারসিক মিশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই
ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ
সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত
বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যা-
সমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা
কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার
আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার
ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র
করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার
সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের
জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি
শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে নদী
চলিতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের
গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন
ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া
আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের
ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি

য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে ; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ-বশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে ; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ —ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্ শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও ; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩ পৃঃ ১৭৬-৭৯

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

বিশ্বভারতীর আদর্শ, সর্বজনীন শিক্ষা, বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যের উত্তরণ ও শিক্ষার মিলন

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।
২. শিক্ষাবিধি।
৩. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং।
৪ শিক্ষার মিলন।
৫ বিশ্বভারতী ৪নং।
৬. বিশ্বভারতী ৫নং।
৭. বিশ্বভারতী ৬নং।

৮. বিশ্বভারতী ১০নং।
৯. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা।
১০. বিশ্বভারতী ১৫নং।
১১. বিশ্বভারতী ১৭নং।
১২. My Educational Mission ইত্যাদি।

৪৪। আকাঙ্ক্ষা

[শ্রীহট্ট কলেজ হস্টেলে ছাত্রদের আহ্বানে বক্তৃতার সারমর্ম। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ ১৩২৬ (১৯১৯) পৃঃ ৮-৯]

…বৃদ্ধ সেজে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনে। আমি কেবলমাত্র তোমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তোমরা নবীন।…এই পৃথিবী থেকে সকল প্রকার জীর্ণতাকে তোমরা সরিয়ে দিতে এসেচ ; কেননা জীর্ণতাই আবর্জনা, জীর্ণতা যাত্রাপথের বাধা। এই জীর্ণতাকে যারা আপন বলে' মমতা করে তারাই সত্যকার বৃদ্ধ।…তোমরা নবীন, তোমাদেরই হাতে পৃথিবীর ভার নূতন করে পড়েচে, তোমাদের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন হতে দিয়োনা, পথ পরিষ্কার কর।

কোন্ পাথেয় নিয়ে তোমরা এসেছ? মহৎ আকাঙ্ক্ষা। তোমরা বিদ্যালয়ে শিখবে বলে ভর্ত্তি হয়েচ। কি শিখতে হবে ভেবে দেখো। পাখী তার মা বাপের কাছে কি শেখে? পাখা মেলতে শেখে, উড়তে শেখে। মানুষকেও তার অন্তরের পাখা মেলতে শিখতে হবে ; তাকে শিখতে হবে কি করে বড় আকাঙ্ক্ষা করতে হয়। পেট ভরাতে হবে, এ শেখবার জন্যে বেশি সাধনার দরকার নেই। কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এই শিক্ষার জন্যে যে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার দরকার তাকেই শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্যে মানুষের শিক্ষা।

এই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে য়ুরোপ শিক্ষকতার ভার পেয়েছে। কেন পেয়েছে? গায়ের জোরে আর সব হতে পারে কিন্তু গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না। যে মানুষ গৌরব পায় সেই গুরু হয়। যার আকাঙ্ক্ষা বড় সেইত গৌরব পায়। য়ুরোপ বিজ্ঞান ভুগোল ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশি খবর রেখেছে বলেই আজকের দিনে মানুষের গুরু হয়েছে এ-কথা সত্য নয়। তার আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ, তার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ; তার আকাঙ্ক্ষা কোনো বাধাকে মানতে চায় না, মৃত্যুকেও না। মানুষের যে

বাসনা ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে, সেটাকে বড় করে তুলে মানুষ বড় হয় না; ছোটই হয়ে যায় ; সে যেন খাঁচার ভিতরে পাখীর ওড়া, তাতে পাখার সার্থকতা হয় না। কিন্তু জ্ঞানের জন্যে আকাঙ্ক্ষা, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে' তাকে মানুষের অধিকারে আনবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা, যাতে মানুষ মরুকে জয় করে ফসল পায়, রোগকে জয় করে স্বাস্থ্য পায়, দূরত্বকে জয় করে নিজের গতিপথ অবারিত করে,—তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, তাতেই প্রমাণ হয় যে মানুষের জাগ্রত আত্মা পরাভবকে বিশ্বাস করে না ; কোনো অভাব দুঃখ দুর্গতিকেই সে অদৃষ্টের হাতের চরম মার মনে করে মাথা পেতে নিতে অপমান বোধ করে ; সে জানে যে তার দুঃখমোচন তার নিজেরই হাতে, তার অধিকার প্রভুত্বের অধিকার। য়ুরোপ এমনি করে আপন আকাঙ্ক্ষার পাখা বড় করে মেলতে পেরেছে বলেই, আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেবার অধিকার সে পেয়েছে। সেই শিক্ষাকে আমরা যদি পুঁথির বুলি শিক্ষা; কতকগুলি বিষয় শিক্ষা বলে ক্ষুদ্র করে দেখি তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করলুম। মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরমশিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীনে। এই মনুষ্যত্ব হচ্ছে আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য ; আকাঙ্ক্ষার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, মহৎ সংকল্পের দুর্জয়তা।

য়ুরোপের লোকালয়ে য়ুরোপের মানুষ বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে নিয়তই নানা ক্ষেত্রে প্রকাশ করছে এবং জয়ী করছে, সেই দেশব্যাপী মহৎ উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা। তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং তাদের জীবনের শিক্ষা একেবারে পাশাপাশি সংলগ্ন। এমন কি যে বিদ্যা তারা শিক্ষকদের হাত থেকে গ্রহণ করেছে সে বিদ্যা তাদের আপন দেশেরই সাধনার ধন, তার মধ্যে শুধু ছাপার অক্ষর নেই। তাদের আপন দেশের লোকের কঠিন তপস্যা আছে। এই কারণে সেখানকার ছাত্র সুধু যে কেবল শিক্ষার বিষয়কে বইয়ের পাতায় দেখছে আর গ্রহণ করছে তা নয়, মানবাত্মার কর্তৃত্ব, তার দাতৃত্ব, স্রস্টৃত্ব চারিদিকেই দেখছে। এতেই মানুষ আপনাকে চেনে এবং মানুষ হতে শেখে।

যে দেশে বিদ্যালয়ে কেবল দেখতে পাই, ছাত্র নোটবুকের পত্রপুট মেলে ধরে বিদ্যার মুষ্টি ভিক্ষা করছে, কিম্বা পরীক্ষার পাসের দিকে তাকিয়ে টেক্‌স্‌ট্‌ বইয়ের পাতায় পাতায় বিদ্যার উঞ্ছবৃত্তিতে নিযুক্ত ; যে দেশে মানুষের বড় প্রয়োজনের সামগ্রী মাত্রেই পরের কাছে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করা হচ্ছে, নিজের হাতে দেশের লোকে দেশকে কিছুই দিচ্ছে না—না স্বাস্থ্য, না অন্ন, না জ্ঞান, না শক্তি ; যে দেশে কর্মের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কর্মের চেষ্টা দুর্বল, যে দেশে শিল্পকলায় মানুষ আপন প্রাণ মন আত্মার আনন্দকে নব নব রূপে সৃষ্টি করছে না ; যে দেশে অভ্যাসের বন্ধনে সংস্কারের জালে মানুষের মন এবং অনুষ্ঠান বাধাবিজড়িত ; যে দেশে প্রশ্ন করা, বিচার করা, নূতন করে চিন্তা করা, ও সেই চিন্তা ব্যবহারে প্রয়োগ করা কেবল যে নেই তা নয় সেটা নিষিদ্ধ এবং নিন্দনীয়, সেই দেশে মানুষ আপন সমাজে আত্মাকে দেখতে পায় না, কেবল হাতের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি এবং মৃতযুগের আবর্জনা-রাশিকেই চারিদিকে দেখতে পায়, জড় বিধিকে দেখে, জাগ্রত বিধাতাকে দেখে না।

যদি মূলের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখব আমাদের যে দারিদ্র্য সে আত্মারই

দারিদ্র্য। মানবাত্মারই অপমান চারিদিকে নানা অভাব নানা দুঃখরূপে ছড়িয়ে রয়েছে। নদী যখন মরে যায় তখন দেখতে পাই গর্ত এবং বালি ; সেই শূন্যতার সেই শুষ্কতার অস্তিত্ব নিয়ে বিলাপ করবার কথা নেই, আসল বিলাপের কারণ নদীর সচল ধারার অভাব নিয়ে। আত্মার সচল প্রবাহ যখন শুষ্ক তখনি আচারের নীরস নিশ্চলতা।…

আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে শিশুকাল থেকেই কোমর বেঁধে আমরা খর্ব করি। অর্থাৎ সেটাকে কাজে খাটাবার আগেই তাকে খাটো করে দিই। অনেক সময়ে বড় বয়সে সংসারের ঝড়ঝাপটের মধ্যে পড়ে' আমাদের আকাঙ্ক্ষার পাখা জীর্ণ হয়ে যায়, তখন আমাদের বিষয়বুদ্ধি, অর্থাৎ ছোট বুদ্ধিটাই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, শিশুকাল থেকেই আমরা বড় রাস্তায় চলবার পাথেয় ভার হালকা করে দিই। নিজের বিদ্যালয়ে ছোট ছোট বালকদের মধ্যেই সেটা আমি অনুভব করি। প্রথমে কয় বৎসর একরকম বেশ চলে কিন্তু ছেলেরা যেই থার্ডক্লাসে গিয়ে পেঁছিয় অমনি বিদ্যা অর্জন সম্বন্ধে তাদের বিষয়বুদ্ধি জেগে ওঠে। অমনি তারা হিসাব করে শিখতে বসে। তখন থেকে তারা বলতে আরম্ভ করে, আমরা শিখব না, আমরা পাস করব। ·অর্থাৎ যে পথে যথাসম্ভব কম জেনে যতদূর সম্ভব বেশি মার্কা পাওয়া যায় আমরা সেই পথে চলব।

এইত দেখিচ শিশুকাল থেকেই ফাঁকি দেবার বুদ্ধি অবলম্বন। যে-জ্ঞান আমাদের সত্যের দিকে নিয়ে যায় গোড়া থেকেই সেই জ্ঞানের সঙ্গে অসত্য ব্যবহার। এর কি অভিশাপ আমাদের দেশের উপর লাগছে না? এই জন্যেই কি জ্ঞানের যজ্ঞে আমরা ভিক্ষার ঝুলি হাতে দূরে বাইরে বসে নেই? আপিসের বড়বাবু হয়েই কি আমাদের এই অপমান ঘুচবে? আজকের দিনে দেশের লোকেরা যুবকেরা পর্যন্ত যে বলছে যে ঋষিরা যা করে গেছেন তার উপরে আমাদের আর কিছুই ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই, এর মানে বুঝতে পেরেছ? এইটেই ঘটেছে আমাদের কর্তৃত্ব-প্রবঞ্চিত বিদ্যাদেবীর অভিশাপে। যে সমাজে কিছুই ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই; সমস্তই ধরাবাঁধা, সে সমাজ কি বুদ্ধিমান শক্তিমান মানুষের বাসের যোগ্য? সে সমাজ ত মৌমাছির চাক বাঁধবার জায়গা। দশ পনেরো বছর ধ'রে শিক্ষালাভ করে আপন চিত্তশক্তির পক্ষে এমন অদ্ভুত অপমানকর কথা অন্য কোনো দেশে এতগুলো লোক এত বড় নির্লজ্জ অহংকারের সঙ্গে বলতে পারে নি। সকল বড় দেশে যে বড় আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আপন শক্তিতে আপন ভাবনায় আপন হাতে সৃষ্টি করবারই গৌরব দান করে আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকেই কেবল যে বিসর্জন করছি তা নয়, দল বেঁধে লোক ডেকে বিসর্জনের ঢাক পিটিয়ে সেই তালে তাণ্ডব নৃত্য করছি।…

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষা ও জীবন, শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষার লক্ষ্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষার হেরফের। ২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৩. বিশ্বভারতী ৪নং। ৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ৬. শিক্ষার সার্থকতা। ৭. আবরণ। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. মেঘনাদবধ কাব্য। ১০. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ১১ পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ১২. শিক্ষাসংস্কার। ১৩. শিক্ষাসমস্যা। ১৪. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ১৫. শিক্ষাবিধি। ১৬. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১৭. অসন্তোষের কারণ। ১৮. বিশ্বভারতী ২নং। ১৯. বিদ্যার যাচাই। ২০. বিশ্বভারতী ৬নং। ২১. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ২২. আলোচনা। ২৩ পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ২৪. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র** ২৫: শিক্ষার বিকিরণ। ২৬. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২৭. আশ্রমের শিক্ষা। ২৮. A Poet's School. ২৯. The School Master. ৩০. তোতাকাহিনী। ৩১. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ৩২. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৩৩. তপোবন। ৩৪. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৩৫. প্রাক্তনী (৬নং)। ৩৬. কলাবিদ্যা। ৩৭. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ৩৮. শিক্ষার আদর্শ। ৩৯. বিশ্বভারতী ১৫নং। ৪০. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ৪১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ৪২ বিশ্বভারতী ১৮নং ইত্যাদি।

৪৫। প্রাক্তনী ৬নং

[শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত, পৌষ ১৩৪৩]

···আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলিত আয়োজন কঠিন ও কঠোর—ওষুধ যত তিক্ত হবে ততই উপকার হবে বলে সকলের বিশ্বাস—শিক্ষা যত কৃচ্ছ্রসাধ্য হবে ততই বুঝি অধিক ফল দান করবে। কিন্তু আনন্দের ভিতর দিয়ে, মুক্তির হাওয়ার মধ্যে শিশুচিত্ত যেমন বিকশিত হয়, তেমন আর কিছুতে হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে ফল পাওয়ার আশা অল্প। কাজেই যখন দেখলুম শিশুচিত্ত বিদ্যার নামে বন্দী হয়ে আছে তখন মন ব্যাকুল হল ; যাতে করে শিশুর দুঃখ দূর হয়, অধ্যাপকের স্নেহে কল্যাণে অভিষিক্ত হয়ে মুক্ত সমীরণে শিক্ষালাভ করতে পারে, এখানে তার ব্যবস্থা হল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিধির সঙ্গে আপসরক্ষা করে এর ভিতর একটা দ্বন্দ্ব রয়ে গেল। তবু এই যে বালকদের আনন্দ-কলধ্বনি প্রত্যহ আকাশকে মুখরিত করে, তাদের গানে শালবন আম্রকুঞ্জ ধ্বনিত হয়, এও সামান্য তৃপ্তির কথা নয়।

তবু এমন করে জ্ঞানের অন্নদানের মধ্যে যে কৃপণতা আছে সে নিয়তই অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে। সাংসারিক লাভের প্রতি দৃষ্টি না রেখে জ্ঞানের চর্চা করব, মানুষের মনুষ্যত্ব এইখানেই। তার জ্ঞানের ক্ষুধা প্রয়োজনের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়। অন্য-সকল দেশে যেমন অর্থকরী বিদ্যা আছে, তেমনি জ্ঞানকে বস্তু নিরপেক্ষ করবার ইচ্ছাও আছে ; কেবল ভারতবর্ষেই কি তা লোপ পাবে ? আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষা রাহুগ্রস্ত, বিদ্যাকে আমরা প্রয়োজনের সামগ্রী মনে করছি—যে সরষে ভূত ছাড়াবে তাকেই ভূতে পেয়েছে।…

[৮ পৌষ, ১৩২৬ শান্তিনিকেতন]

র, র, ১৪ খণ্ড, পৃঃ-৮১৪

টীকা ঃ

প্রাক্তনী ৬নং

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে ৮ই পৌষ ১৩২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। এই রচনাংশটি উক্ত ভাষণের প্রকাশিত রূপ থেকে নেওয়া।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. শিক্ষাসংস্কার। ৩. তপোবন। ৪. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৫. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৬. অসন্তোষের কারণ। ৭. আকাঙ্ক্ষা। ৮. বিশ্বভারতী ৪নং। ৯. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১০. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১১. কলাবিদ্যা। ১২. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ১৩ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ১৪. শিক্ষার সার্থকতা। ১৫। শিক্ষার আদর্শ। ১৬. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৭. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১৮. বিশ্বভারতী ১৭নং। ১৯ বিশ্বভারতী ১৮নং ইত্যাদি।

৪৬। শিক্ষার মিলন

[সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৮ (১৯২১)
প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৮ (১৯২১)]

…এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে ; মনে মনে ভাবি,. যে মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐ-ই আমাদের পেয়ে বসেছে ; সুযোগ এপর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পেঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পেঁছয় নি ? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে ? নিশ্চয়ই সে কোনো-একটা সত্যের জোরে।…

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয় ; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে— বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পেঁছতে পারে ব'লে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে ; আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল 'শুধু তো বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে' তা হলে বলতে হবে, ঐ শয়তানির যোগেই ওদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে ? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায়

তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটছে এ-সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে, অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে অনুরূপ শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে : মানব না, মানাব। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।

পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহ-শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ-উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ার্‌কে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য?' ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।' য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এইজন্যে, এই নিয়মের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না; তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়। এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।...

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব।

পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন?' তারা তখনি বললে, 'আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। সুতরাং, যে ক'রে হোক এরা একটা কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না।…

…এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।…

মানুষের বুদ্ধিকে ভুতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্যনক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাটিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবনপোষণ হয়, জীবনের সকলপ্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা; এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।…

…বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে বিদ্যা বাইরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। এ কথা অনেকে বলবেন, পশ্চিমদেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম প'রে মৃগয়া করত, তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাই নি? বস্ত্র জোগাই নি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এ পারে, ও পারে, দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত আমরা কি তখন স্বরাজ-শাসনবিধি আবিষ্কার করি নি? নিশ্চয় করেছি, কিন্তু কারণটা কী? আর তো কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলেম। পশুচর্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুনতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্য-চালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উলটে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই।

কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে যে চড়িয়ে দিয়েছে সে তো কোনো দৈব নয়, সে ঐ বিদ্যা। অতএব, আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সামলানো যাবে। এ কথার একমাত্র অর্থ, আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব শুক্রাচার্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম টাইট্যানিক্ ওয়েল্থ্। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে ব'সে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই।...

এ কথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম ক'রে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অন্তরে গান ব'লে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর-তালের চেষ্টা থাকে রসের সংযমরক্ষার; বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম ব'লে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যে রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা, অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম খেলা, তার বাসা আসবাব, তার শিষ্টাচার ধর্মানুষ্ঠান, সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয়, বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা।...

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ আনন্দময় মিল আছে।...এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে

পড়েছি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পেঁাচচ্ছে ?

...যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো ক'রে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে।...বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তারা যতই ফললাভ করে, ফললাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপু। রিপুর কর্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধন লাভ করে, বল লাভ করে, সুবিধাসুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক ; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক।...

...পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে এ কথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে; য়ুরোপে ব্যবহারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে। কেননা আচারই হোক আর ব্যবহারই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয় ; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।...

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌।

পশ্চিমসভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিসের ? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন : মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন করব না ? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে ; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কী ? সত্য হচ্ছে এই : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌। সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন।...

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম-মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নীচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামি করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি ক'রে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে

উপর-পানে মাথা তোলবার ফুরসত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া ; এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিমমহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে ; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের ক'রে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা ; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্বমহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে তাই পূর্বপশ্চিমের মিলন-মন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব ; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশংকা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজম্‌ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি ; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না ; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় **জাতিবিশেষের** মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তারাই প্রকাশ পেয়েছে, এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে ? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই

কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয় ? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি, মানুষের দল পর্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর, যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল ; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে ? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হুহু ক'রে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।… আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সামলে উঠতে পারছি নে। কেননা যারা কাছেও আসে, তফাতেও থাকে, তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তা হলে পদে পদে ঠকাঠক ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয়, অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয় যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন ? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডীর বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় ব'লেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা ধরে ; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে ; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে ; কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডী-দেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশী বলি জুটত ততদিন কোনো কথা ছিল না ; হঠাৎ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, একেই কি বলে ইষ্টদেবতা !…

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মনি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল ব'লে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি ?…

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।

যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য ক'রে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র।···

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'রে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা।···

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৩, পৃঃ ১৮০—১৯৮

টীকা ঃ

শিক্ষার মিলন

গান্ধিজীর অসহযোগনীতির প্রাসঙ্গিক চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি রচনা করেন। ১৫ই আগস্ট ১৯২১ সালে কলকাতায় ইনস্টিটিউট হলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে কবি-সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সভায় সভাপতি ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩২৮ সালে গৌড়ীয় বিদ্যায়তনে 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা, সর্বজনীন শিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা আধ্যাত্মিক শিক্ষা, শিক্ষায় ঐক্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. প্রসঙ্গ কথা (২)। ২. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ৩. লোক-শিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৪. ছাত্রসম্ভাষণ। ৫. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ৬. শিক্ষাবিধি। ৭. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ৮. বিদ্যাসমবায়। ৯. বিশ্ব-ভারতী ৪নং। ১০. বিশ্বভারতী ৫নং। ১১. বিশ্বভারতী ৬নং। ১২. বিশ্বভারতী ১০নং। ১৩. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৪. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৫. বিশ্বভারতী ১৭ নং। ১৬. My Educational Mission ইত্যাদি।

৪৭। ক্ষিতীশচন্দ্র দত্তকে পত্র

[১৭ ফাল্গুন ১৩২৮ (১৯২২), শান্তিনিকেতন]

…স্ত্রীলোক ও পুরুষের এক অংশে মিল আছে আর এক অংশে নাই।.. সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা উভয়েরই পক্ষে সমান আবশ্যক—ব্যবসায়িক শিক্ষা উভয়ের পক্ষে স্বতন্ত্র। সংসারে যেমন পুরুষের তেমনি মেয়েদেরও একটা ব্যবসায়িক দিক আছে সেখানে তাহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা চাই। বিশ্বভারতীতে সাধারণ শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনও প্রভেদ করা হয় নাই, এই জন্য তাহারা সে সকল ক্লাশে একসঙ্গেই শিক্ষালাভ করে। বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করিবার চেষ্টায় আছি—প্রধান বাধা উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গার্হস্থ্যতত্ত্ব স্বাস্থ্যতত্ত্ব রোগ-শুশ্রূষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে শুধু যে কার্যকুশলতা শেখা হয় তাহা নহে মেয়েদের মন ভ্রান্ত ও অন্ধ সংস্কার হইতে মুক্ত হয়। এইরূপ সংস্কারের **আবর্জনায়** আমাদের স্ত্রীপুরুষের মন ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে—ইহারই চাপে আমরা অন্তরে বাহিরে মরিতেছি। আমাদের পুরুষেরা বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াও মনের ভিতরে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই প্রত্যহ তাহার সহস্র প্রমাণ পাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বোঝা অত্যন্ত ভারী, অল্প ঠেলায় নড়ে না। অন্তঃপুরেও শিক্ষার প্রবেশ না ঘটিলে আমাদের মরণং ধ্রুবং। নিশ্চয় জানিবেন সাধ্যমত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লক্ষ্যপথে চলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার সামর্থ্য অল্প এবং আমার দেশের লোক আমার কাজে আজ পর্যন্ত আনুকূল্য করেন নাই, প্রতিকূলতা অনেক

সহিতেছি। আশা আছে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে পারিব। ইহা সত্য যাহা মনে আছে তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার মত সম্বল আমার নাই।

আপনি যে মনে করিতেছেন এখানে মেয়েরা কেবল ভাষাই শিখিতেছে তাহা সত্য নহে—তাহারা গানবাজনা চিত্রকলা শরীরতত্ত্ব শিখিতেছে, শীঘ্র তাঁতের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থাও হইবে। যাহাকে Domestic Science বলে তাহাও শিখাইব সংকল্প আছে।

উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ / মন্তব্য ঃ

স্ত্রীশিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. স্ত্রীশিক্ষা।
২. য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।
৩. ভক্তিদেবীকে পত্র ইত্যাদি।

৪৮। বিশ্বভারতী ৪নং

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯]

…আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়।…

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।…

এখানে [শান্তিনিকেতন আশ্রমে] ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শুধু এটাকেই চরম **লক্ষ্য** বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয়নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ

হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল।...

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তার পরে যখন অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার এক প্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন হল; বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।

আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয় ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইংরেজি বিদ্যালয়ের 'স্কুলবয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হয়নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থ-ক্ষেত্র গড়ে উঠবে।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনাক্ষেত্র আমাদের চাই তো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে।...

[রচনাকাল—২০ ফাল্গুন ১৩২৮, শান্তিনিকেতন]

বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃঃ ২৫—৩৩

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ৪নং

উক্ত রচনাটি 'আলোচনা : বিশ্বভারতীর কথা' নামে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯) প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর তৎকালীন কয়েকটি নবাগত ছাত্র রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছুক হওয়ায় তিনি যে কথা বলেছেন, তারই মর্ম উক্ত রচনায় লিখিত।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও জীবন, সর্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি, বিশ্বভারতীর আদর্শ

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষার হেরফের। ২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৩. আকাঙ্ক্ষা। ৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ৬. শিক্ষার সার্থকতা। ৭. আবরণ। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ১০. শিক্ষাবিধি। ১১. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ১২. বিদ্যাসমবায়। ১৩. শিক্ষার মিলন। ১৪. বিশ্বভারতী ৫নং। ১৫. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৬. বিশ্বভারতী ১০নং। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮ বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৯ বিশ্বভারতী ১৭নং। ২০. My Educational Mission ২১. শিক্ষা-সমস্যা। ২২. তপোবন। ২৩. জগদানন্দ রায়কে পত্র ১নং। ২৪. বিশ্বভারতী ১৪নং। ২৫. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ২৬. The School Master. ২৭. A Poet's School ইত্যাদি।

৪৯। বিশ্বভারতী ৫নং

[প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন, ৯ম খণ্ড ১নং, সেপ্টেম্বর ১৯২২]

…তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না।…

…সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন; তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত;

অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আজকের দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পেঁছিতে হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি? আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে? ··

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও জর্মনদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনও ঘটে নি।…

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরী হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে, এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়।…

[রচনাকাল—৪ ভাদ্র, ১৩২৯/১৯২২, কলিকাতা]

বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৭-৫৭

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ৫নং

১৯২২ সালে ২১ শে আগস্ট (১৩২৮, শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, ৬ সংখ্যক রচনাটি তারই অনুলিপি। 'প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে' নবম খণ্ডে (সেপ্টেম্বর ১৯২২) 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকায়' ভাদ্র, ১৩২৯ (১৯২২) সালে প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, জাতীয় শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ১নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪. আকাঙ্ক্ষা। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২৮. তপোবন। ২৯. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ৩০. ছাত্রশাসন-তন্ত্র। ৩১. বিশ্বভারতী ২নং। ৩২. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ৩৩. বিদ্যাসমবায়। ৩৪. শিক্ষার মিলন। ৩৫. বিশ্বভারতী ৪নং। ৩৬. বিশ্বভারতী ৫নং। ৩৭. বিশ্বভারতী ১০ নং। ৩৮. বিশ্বভারতী ১৫ নং। ৩৯. My Educational Mission ইত্যাদি।

৫০। বিশ্বভারতী ৬নং

[রচনাকাল—১ ভাদ্র ১৩২৯,
শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ ১৩২৯]

...বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করছে। কেন ? আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষলপর্ব কেন দেখা দিলে ? পূর্বে বলেছি, মানুষের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে ; জলে স্থলে দেশে দেশে যেসকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সে সব ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে। আজ আকাশপথে পর্যন্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশযানের

উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে দেশগত সীমানার কোনো অর্থই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান গেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে-সাধনার পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত যুগের জিনিস ; সুতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে-সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে—নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝেছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।...

বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃঃ ৩৯-৪০

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ৬নং

বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারকল্পে কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী নামে যে একটি সভা স্থাপিত হয়, তারই একটি অধিবেশনে ১৩২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। ৫ সংখ্যক রচনাটি সেই ব্যাখ্যারই অনুলিপি। উক্ত ব্যাখ্যাটি শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (পৌষ ১৩২৯) 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী ঃ লেভি সাহেবের বিদায়-সম্বর্ধনার পরে আলোচনা সভা' নামে প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

সর্বজনীন শিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।
২. শিক্ষাবিধি।
৩. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং।
৪. বিদ্যাসমবায়।
৫. শিক্ষার মিলন।
৬. বিশ্বভারতী ৪নং।
৭. বিশ্বভারতী ৬নং।
৮. বিশ্বভারতী ১০ নং।
৯. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা।
১০. বিশ্বভারতী ১৫ নং।
১১. বিশ্বভারতী ১৭ নং।
১২. My Educational Mission ইত্যাদি।

৫১। বিশ্বভারতী ১০নং

[রচনাকাল—৭ পৌষ ১৩৩০,
শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ ১৩৩০ (১৯২৩)]

…পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বয়কে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র ; তারা নূতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয় ; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে—সে মানুষ। আজকের দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি ব'লেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না—সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।

ভারতবর্ষ তার জাতরক্ষা করবার স্বপক্ষে কি পাশ্চাত্য দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি একথা ভুলে গেছি যে, য়ুরোপ ও আমেরিকা আপন আপন ন্যাশানালিজ্মের ভিত্তিপত্তন করে যে বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমাদের দেশে তেমন ভিত্তিপত্তন কখনও হয় নি। ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন।…

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত ক'রে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের—নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা ; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য—'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন

সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণ পরিচয় লাভ করেছে।…

বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃঃ ৮১-৮৪

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ১০নং

১০ সংখ্যক রচনাটি শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ ১৩৩০ সালে প্রদত্ত ভাষণের প্রবন্ধরূপ। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (মাঘ ১৩৩০) '৭ই পৌষ : দ্বিতীয় ব্যাখ্যান' আখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

সর্বজনীন শিক্ষা, প্রকৃতি; শিক্ষা ও স্বাধীনতা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ২. শিক্ষাবিধি। ৩. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ৪. বিদ্যাসমবায়। ৫. শিক্ষার মিলন। ৬. বিশ্বভারতী ৪নং। ৭. বিশ্বভারতী ৫নং। ৮. বিশ্বভারতী ৬নং। ৯. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১০. বিশ্বভারতী ১৪নং। ১১. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১২. My Educational Mission. ১৩. শিক্ষাসমস্যা। ১৪. তপোবন। ১৫. জগদানন্দ রায়কে পত্র ১নং। ১৬. বিশ্বভারতী ১৭নং। ১৭. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ১৮. The School Master. ১৯. A Poet's School. ২০. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২১. জাতীয় বিদ্যালয়। ২২. প্রাক্তনী (৫নং)। ২৩. ধারাবাহী। ২৪. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান। ২৫. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং। ২৬. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৩নং ইত্যাদি।

৫২। বিশ্বভারতী ১১নং

[রচনাকাল—১৭ ভাদ্র ১৩৩১,
প্রবাসী (যাত্রার পূর্বকথা) কার্তিক ১৩৩১ (১৯২৪)]

...আর যে একটি কথা অনেক দিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল সে হচ্ছে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। কখনও বেতন দিয়ে, কখনও ত্যাগের বিনিময়ে; কখনও-বা জবরদস্তির দ্বারা মানুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিয়ে রাখছে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য।...

বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃঃ ৮৯

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ১১ নং

দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীর নিকট যে ভাষণ দিয়েছিলেন ১১ সংখ্যক রচনাটি তারই প্রবন্ধরূপ। প্রবাসী পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩১) 'যাত্রার পূর্বকথা' শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শ

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. জাতীয় বিদ্যালয়।
২. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ১নং।
৩. বিশ্বভারতী ১৫নং।
৪. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি।
৫. বাঁকুড়ায় ছাত্রদের উদ্দেশে ইত্যাদি।

৫৩। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

[১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫, ক্রাকোভিয়া জাহাজ]

…আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রধান ও সাধারণ আবরণ হচ্ছে অভ্যাসের মোহ। এই অভ্যাসে চেতনায় যে-জড়তা আসে তাতে সত্যের অনন্তরূপ আনন্দরূপ দেখতে দেয় না। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে এই তত্ত্বটাকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছি। ছাত্রদের প্রতিদিন একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোর চেয়ে মনের জড়ত্বের কারণ আর কিছুই হতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রধানত যে বিতৃষ্ণা জন্মে শিক্ষার বিষয় কঠিন বলেই যে তা ঘটে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়; শিক্ষাবিধি অত্যন্ত একঘেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষের প্রাণ যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রকে আত্মীয় করতে পারে না; শিক্ষাকে যন্ত্র ক'রে তুললে তার থেকে কোনো বাহ্য ফলই হয় না তা নয়, কিন্তু সে-শিক্ষা আত্মগত হতে গুরুতর বাধা পায়।…

আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সংগে এই শিক্ষা-প্রবাহের তাল মেলে। বন্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজ জ্ঞানের পথে কঠিন বাধা।…

পরিশিষ্ট, র। ১০। ৫৯৮-৯৯

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষাপ্রণালী

তুলনীয় প্রসংগ :

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসংগ কথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪. আকাঙ্ক্ষা। ১৫. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববংগে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং ইত্যাদি।

৫৪। আলোচনা

শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩২ (জুলাই ১৯২৫)]

...ছাত্রদের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা অল্প কথায় শেষ করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে যে কথাটা আমার কাছে সকলের চেয়ে গুরুতর ব'লে মনে হয় সেইটিমাত্র আমি লিপিবদ্ধ করতে ইচ্ছা করি।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণত পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই ক'রে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি। পাশ্চাত্য সমাজে বিদ্যালয়ের বাহিরেও নানা উপায়ে স্কুল কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব পূরণ করে দেয়। আমাদের দেশে স্কুল কলেজের বাহিরে ছাত্রদের অন্য শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বললেই হয়। তাই নোট নেওয়া মুখস্থ করা বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায় সে পরিমাণ খাদ্য পায় না।

দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাশে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনোই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।

দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চা—সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোনো না কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ ক'রে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। যে-সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ ব'লে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা ক'রে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়। তা ছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যত বড়ো পণ্ডিতই হোক সংসার-ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবত কোনো কোনো অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব কিন্তু সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য হবে না।

দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালো রকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়। এই কারণেই আমি মনে করি পথচারী

বিদ্যালয়ই বিদ্যালয়ের আদর্শ। ইস্কুলের বন্ধ ঘরে শিক্ষা দিলে আমাদের জীবনলীলার অধিকাংশ উদ্যমই সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বাদ পড়ে।...

শিক্ষা, ১৩৪২, পৃঃ ২৫৯-২৬০

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষার পরিবেশ

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১ মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭ পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪. আকাঙ্ক্ষা। ১৫ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৭. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৮. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ১৯. শিক্ষার বিকিরণ। ২০. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২১. আশ্রমের শিক্ষা। ২২. A Poet's School. ২৩. **The School Master.** ২৪. তোতাকাহিনী। ২৫. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং ইত্যাদি।

৫৫। পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা

[প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৩ (১৯২৬), পৃঃ ১৭-১৮]

শান্তিনিকেতনে আমি আমার ছাত্রদের মধ্যে বিশ বছর বাস করছি; সেখানে আমি তাদের সঙ্গের সঙ্গী। আমাদের মধ্যে যে কেবল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তা নয়। সম্মানের যে-দূরত্ব তার উপর দাঁড়িয়ে আমি কাজ করিনি, বয়স্য ভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চেষ্টা করেছি। কেননা আমার বিশ্বাস, অন্তরে তাদের সমবয়সী না হ'তে পারলে তাদের কিছু দিতে পারা যায় না।..

…আমার প্রাচীন বয়স আধুনিককালের সংগে আমার বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। তোমরা যদি আমার কবিতা পাঠ কর তা হ'লে দেখতে পাবে, আমি তারুণ্যের কবি, আমার বাণী এই নবযুগেরই বাণী; জীর্ণকে, অর্ধমৃতকে আঁকড়ে ধ'রে, অতীতের দিকে উজানে পাড়ি দিতে আমি কখনো বলিনে। তোমরা যারা যুবক তাদের মধ্যে যৌবনের সাহস হোক, যৌবনের যা ধর্ম—নতুনের পরীক্ষা দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, দুঃসাহসের ভিতর দিয়ে নিজের বীর্য পরীক্ষা করা, তাই তোমাদের হোক। নির্জীব সংস্কারের জালে নিজের জীবনকে ক্ষুদ্র স্বার্থের সংগে জড়িয়ে রাখা, এ যেন তোমাদের না ঘটে, নব জীবনের চাঞ্চল্য তোমাদের মধ্যে আসুক। প্রাণের ক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষভাবে তোমরা জ্ঞান আহরণ করো, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো। প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, বিদ্যায়তনগুলি সংসারক্ষেত্রের বাইরে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে মানুষকে তার স্বস্থান থেকে উৎপাটিত ক'রে এনে খাঁচার মধ্যে পাখীকে যেমন করে রাখা হয় তেমনি ক'রে রেখে শিক্ষার বাঁধা খোরাক দেওয়া হয়। এই যে বাল্যকাল থেকেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া, এ-দৈন্য আর কিছুতেই কখনো দূর হয় না। নির্জীব শিক্ষা কখনো মন যথার্থভাবে নিতে পারে না। তাতে মনের অনেকটা অংশই নিশ্চেষ্ট থেকে যায়, বাইরে থেকে পুঁথির বাক্য গ্রহণ করে, খবর আহরণ করে, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের খাদ্য পায় না। আমাদের আহার্য দ্রব্য যখন পাকযন্ত্র স্পর্শ করে তখন তারই উত্তেজনায় সেখানে জারক-রসের সঞ্চার হয়, তাতেই খাদ্য জীর্ণ করে। তেমনি শিক্ষার বিষয় যখন মনে ঔৎসুক্য জাগায় তখনই সেই ঔৎসুক্যে জ্ঞানের পরিপাকক্রিয়া চলে। চারিদিকের প্রাণের ক্ষেত্র থেকে বিদ্যার খাঁচায় নির্বাসিত মনের সেই ঔৎসুক্য থাকে না। এইজন্যেই আমাদের ছাত্রদের চিত্তের দৈন্য ঘোচে না। তাদের শিক্ষায় সাহস নেই, চিন্তা করবার সাহস নেই। মুখস্থবিদ্যার নীচে তাদের সব শিক্ষা সমাধিস্থ হ'য়ে যায়। আমাদের শান্তিনিকেতনের চারদিকেই সাঁওতালদের বাস। নিকটের গ্রামে ডোমদের পাড়া আছে, তাদের কোনো কোনো পূজাবিধির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কিছু অবশেষ আছে। এইসব জাতির সমাজতত্ত্ব যদি ছেলেদের পাঠ্য হ'ত তা হ'লে তারা পুঁথি থেকে পাঠ মুখস্থ করে' শরীর ক্ষয় করতে রাজি হতো, কিন্তু যেখানে শিক্ষার বিষয় প্রত্যক্ষ আছে, সেদিকে তারা সহজে যায় …। প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানলাভের অভ্যাস থেকে তারা শিশুকাল থেকেই বঞ্চিত। এমন শিক্ষার মত শিক্ষার অপব্যয় আর কিছু নেই। প্রত্যুত এইরকম জড় শিক্ষায় আমাদের ছাত্রদের মনে বিদ্যার উপরে বিতৃষ্ণা জন্মে। তা ছাড়া মনের নিজের চেষ্টায় সত্য আহরণের স্বাভাবিক ক্ষমতাও ক্লিষ্ট হয়। বাইরে থেকে বিদ্যার চাপ পড়ে' অন্তরের শক্তির অবসাদ ঘটে। প্রায় এক শতাব্দী কাল শিক্ষালাভের পরও আমরা জ্ঞানরাজ্যে কোনো নতুন তত্ত্ব, নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে পারিনি। আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রভৃতি দুই একজনের নাম করে' থাকি, কিন্তু সেই কয়টি নাম দিয়ে আমাদের দৈন্য ঢাকা যায় না। জ্ঞানের জন্যে যে আগ্রহ, যাতে বিষয়-বন্ধন মোচন হয়, সে-আগ্রহ কেন জাগল না আমাদের মধ্যে? সত্যের সন্ধানে একান্ত আত্মনিবেদন করতে কেন পারিনে, যেহেতু জ্ঞানের স্বাদ পাইনি কেবল তার বোঝা পেয়েছি, আমাদের জীবনের সংগে জ্ঞানের

যোগ স্থাপিত হয় নি। যে-আনন্দ লাভ করলে ত্যাগস্বীকার করতে পারব তা আমাদের হ'ল না। আমরা শুধু কোনো রকমে কাজ সেরে নিতে চাই, চাকুরীর জন্যে আমাদের বিদ্যালয় থেকে নির্গমনের ব্যাকুলতা। কিন্তু কেন এত অপব্যয়? জ্ঞান যদি আমাদের চিত্তকে উদ্দীপিত না করে তবে কেন তার জন্যে এত ব্যয়, এত সব বিদ্যালয়? কেন এত স্বাস্থ্যনাশ? কিসের জন্যে এত আশঙ্কা, এত উত্তেজনা? শুধু উপাধির দুটো অক্ষরের জন্যে? কোনো অমৃত কি পাওনি শিক্ষার মধ্যে? সমস্ত বিশ্বের যাঁরা জ্ঞানতপস্বী তাঁরা তোমাদের নিকট তাঁদের বাণী পাঠাচ্ছেন, তাঁদের জীবনের সঞ্চয় তোমাদের দিচ্ছেন, এই বলে' যে, তোমরাও যেন তাঁদের দলে যোগ দিতে পার, যেন তাঁদের তপস্যার ব্রতী হও। তাঁরা তাঁদের জীবনের সাধন-ফল তোমাদের দিচ্ছেন, আর তোমরা তা নীল লাল পেন্সিলের রেখায় দীর্ণ-বিদীর্ণ করে' তার সমস্ত প্রাণ বের করে' নিয়ে শুষ্ক বাক্যগুলো মগজের মধ্যে ঠেসে পরীক্ষা পাস করছ। এরি জন্যে এত সাধনা? এতদিন ধরে' আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-জ্ঞানের ধারা বয়ে এসেছে তা যদি আমাদের ছাত্রেরা যথার্থভাবে প্রাণে সঞ্চয় করতে পারত তা হলেই দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল হ'ত।…

…আমরা কথায় কথায় বলি ভারতবর্ষকে আমরা ভালবাসি। যাকে ভালবাসা যায় তার পরিচয় পেতে হৃদয়ের অসীম ক্ষুধা। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের পূর্ণপরিচয়ের জন্য আমরা কতটুকু চেষ্টা করেছি? নিষ্ঠা নেই, তপস্যা নেই, এমন কি কৌতূহল নেই, তবে কোন্ ফাঁকিতে ভারতবর্ষকে আমরা লাভ করব? একবার মনের ভিতরে ডুবে জিজ্ঞাসা কর দেখি, যে-পরিমাণে ভালবাসলে দেশের সমস্ত তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয় সে ভালবাসা কি আছে?…

… আমরা অন্য দেশের ইতিহাস থেকে সাধারণ ভাবে 'দেশানুরাগ' এই তত্ত্বটি জেনেছি, কিন্তু জ্ঞানের পথ দিয়ে, সাধনার ভিতর দিয়ে তা যথার্থভাবে লাভ করিনি। জড় শিক্ষায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমাদের জ্ঞান। হৃদয়ে আমাদের ঔৎসুক্য নেই কেবল পরীক্ষাপাসের দিকে লক্ষ্য। শিক্ষা যদি বাইরের সংবাদ চাপিয়ে আমাদের মনকে শুধু ভারগ্রস্তই ক'রে দেয়, চিত্তধর্মকে জাগ্রত না করে, তবে সে-শিক্ষায় কোনো লাভ নেই, বরং ক্ষতি।

প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানআহরণের ক্ষেত্র রয়েছে চারদিকে—বাইরের জিনিস, গাছপালা এসব ভাল করে' দেখতে শেখ। আমি কেবলমাত্র সহরবাসী নই, বাংলার পল্লীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আমি অনেক পল্লীবাসীকে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করেছি, ওহে, ওটা কি গাছ? উত্তর পেয়েছি, ওর কোনো নাম নেই মশাই, ওটা বুনো গাছ। ওটা কি পাখী? আজ্ঞে, ওটা জঙ্গুলে পাখী। দেশের নিত্যগোচর জিনিস, কিন্তু তার কোনো নাম নেই, বিবরণ নেই। দেশকে এত উদাসীন ভাবে অর্ধেক চোখ বুজে দেখলে কি ভালবাসা যায়? আজ তোমাদের দিকে চেয়ে আমি সুখী হব কি দুঃখিত হব জানিনে। জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মধ্যে একজন কি এমন সংকল্প করেছ যে. আমি চাকুরী চাইনে, আমি চাই জ্ঞানের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে।

আমরা বলি, ভারতবর্ষের উপর আমাদের অধিকার। অধিকার কি জন্মেছি বলে'ই ? জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বদেশের অধিকার জয় করে নিতে হয় না ?…

…সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞানের যে-আগ্রহ; তা তোমাদের মধ্যে জাগ্রুক—তবেই তোমরা ভারতবর্ষকে জানবে, বিশ্বকে জানবে ; আর সমস্ত বিশ্ব-মানবের মাঝখানে তোমাদের যে স্বজাতি, তাও তোমরা জানবে।

টীকা ঃ

পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা

শিক্ষার ক্ষেত্র—ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রগণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, জাতীয় শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও অনুশীলন

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১ মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮, শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ১নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪. আকাঙ্ক্ষা। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৮. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ১৯ শিক্ষার বিকিরণ। ২০. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২১. আশ্রমের শিক্ষা। ২২. A Poet's School. ২৩. The School Master. ২৪. তোতাকাহিনী। ২৫. সন্তোষ-চন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৬. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২৭. তপোবন। ২৮. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯. ছাত্রশাসনতন্ত্র। ৩০. বিশ্বভারতী ২নং। ৩১ বিশ্বভারতী ৪নং। ৩২ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ৩৩ বিদ্যা-সমবায়। ৩৪. শিক্ষার মিলন। ৩৫. বিশ্বভারতী ৫নং। ৩৬. বিশ্বভারতী ৬নং। ৩৭. বিশ্বভারতী ১০নং। ৩৮. বিশ্বভারতী ১৫নং। ৩৯. My Educational Mission. ৪০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৪১. প্রাক্তনী ৬নং। ৪২. কলা-বিদ্যা। ৪৩ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ৪৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ৪৫. শিক্ষার সার্থকতা। ৪৬. শিক্ষার আদর্শ। ৪৭. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ৪৮. বিশ্বভারতী ১৮নং। ৪৯. ধর্মশিক্ষা ইত্যাদি।

৫৬। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং

[১৯ মে ১৯২৬,

শারদীয়া দেশ, ১৩৫০ পৃঃ ১৩]

শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখছি। যতই লিখছি ততই তোমাদের কাজের কথা মনে পড়ছে। সভ্যতার আরম্ভে মানুষকে নিজের বেশ বাস আহার প্রভৃতি সমস্তই সমস্যার মত সমাধান করতে হয়েছে—প্রকৃতির হাতে এই তার প্রথম শিক্ষার প্রণালী—এই শিক্ষার উপযোগী মনোবৃত্তি তার আছে। সেই বৃত্তি খাটাতে পারলে তার পূর্ণতা ও আনন্দ। দোকান বাজার ও পৈতৃক সম্পত্তির উপর বরাৎ দিয়ে সেই আনন্দের স্ফুরণ থেকে সভ্য মানুষ বঞ্চিত—শুধু আনন্দের সম্পূর্ণতা থেকে নয়, শিক্ষার সম্পূর্ণতা থেকেও। বিশ্বসংসারে শিক্ষা শুরু করতে হলে বর্বরতা থেকে আরম্ভ করতে হবে। ওরা যদি নিজের কুটীর নিজে বেঁধে নিজের কাপড় নিজে বুনে নিজের কাগজ নিজে তৈরি করে নিজের বানানো কালীতে লিখে কাজ চালাতে পারে ত ভাল হয়—সম্পূর্ণ এতটা করে তোলা কঠিন, কিন্তু লক্ষ্যের অভিমুখে দৃষ্টি রাখা উচিত। কোনো একটা অভাব হলেই দোকানের দিকে না ছুটে নিজেরা কোনো উপায়ে প্রয়োজন সারতে পারে কিনা এই চেষ্টা সর্বদাই মনে জাগিয়ে রাখা উচিত। দায়ে ফেললেই মন আপনার শক্তিকে উদ্ভাবিত করে; নইলে কিছুদিন পরে তার ভাণ্ডারের চাবি খুঁজে পায় না।...

টীকা ঃ

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং

Marittima Italiana Genowa থেকে লিখিত পত্র।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষার প্রণালী।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯ লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২ বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. আকাঙ্ক্ষা। ১৬. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৭ পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক **অধ্যাপককে পত্র**। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতাকাহিনী ইত্যাদি।

৫৭। জনৈক অধ্যাপককে পত্র

[২৮ ভাদ্র ১৩৩৫ (১৯২৮),
বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, পৃঃ ৩৩৯-৪০]

…শিক্ষা বলতে কি বোঝায় ? প্রাণকে সম্পূর্ণ জাগানো। প্রাণ বলতেই বোঝায় সত্য আগ্রহের লক্ষ্য ধরে নিরন্তর এগোনো। আমাদের দেশে মানুষ আগ্রহহীন—মানুষের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, জ্ঞানের প্রতিও। … শিশুকাল থেকে ছেলেদের মনে আমরা শিক্ষণীয় বিষয় ভারী করে চালাই, তাতেই শিক্ষার আগ্রহ মারা পড়ে অর্থাৎ চিত্তকে আমরা বইয়ের শেলফের মতো দেখি, প্রাণবান জিনিসের মতো দেখিনে। আমাদের দেশে সবচেয়ে দরকার শিশুকাল থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে আগ্রহ জন্মিয়ে দেওয়া—চারিদিকে যা কিছু আছে সবতাতেই তাদের আগ্রহ জাগানো চাই—বিচিত্র বিষয়ে—কেননা মনের খোরাক দেহের খোরাকের মতোই বিচিত্র। আমাদের শিক্ষকদের নিজেরই মনে চারিদিকের প্রতি ছাত্রদের প্রতি আগ্রহ নেই বলেই তারা কেবল মরামন হয়। সে মন অকর্মক ভাবে বস্তু ধারণ করতেই পারে, কিন্তু রূপ সৃষ্টি করতে পারে না। তারা বীজের বস্তার মত, বীজকে ফলানো তাদের কর্ম নয়—কারণ বীজের প্রতি তাদের প্রাণগত আগ্রহ নেই। যে শিক্ষক যে বিষয়টি সর্বদাই নিজে পড়ে না, অন্যকে পড়ায়, তার শিক্ষকতার অধিকার নেই। যাই হোক আমার পণ এই যে, এখানকার ছাত্রদের শুধু বিদ্বান করা নয় আগ্রহবান করা। জীবনের প্রতি জগতের প্রতি তাদের অন্তহীন ঔৎসুক্য যেন থাকে। তা হলেই তারা বেঁচে আছে বলে জানব। হায়রে, ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি মানুষ তেত্রিশ কোটি দেবতার মতোই—তারা নামে আছে বস্তুত নেই। এই জন্যেই এত সহজেই তারা সকল রকম সার্থকতা থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে। …

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. আকাঙ্ক্ষা।
২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং।
৩ লক্ষ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি।

৫৮। বাংলা শিক্ষার প্রণালী

[অনাথনাথ বসুকে পত্র, ১০ মার্চ, ১৯২৯,
প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃঃ ৬৫৬]

…বাংলা শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনকে জাগাবার রাস্তা যত প্রশস্ত এমন আর কোনো উপায়ে নয়। কবিতাই হোক গদ্যই হোক ওরা যা কিছু পড়বে তার থেকে চিন্তার বিষয় বা কল্পনার বিষয়কে বেছে নিয়ে সেটাকে ওদের মনের মধ্যে খুব করে আলোড়িত করা চাই, শুধু কথার মানে জানতে দেওয়া যথেষ্ট নয়। ভাষার বাহ্যরূপটাও ওদের বেশ ভালো করে জানা উচিত যাতে ওরা ভাষাটাকে যথোচিতরূপে ব্যবহার করতে পারে। ইংরেজি বই থেকে মনের খোরাক পাবার অবস্থায় পৌঁছতে দেরি হবে—কিন্তু বাংলা থেকে প্রতিদিনই যেন ওদের মন খাদ্য পায়। যা ওদের নির্দিষ্ট পাঠ তারই মধ্যে যেন ওরা বদ্ধ না থাকে—বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-ইতিহাসের বিচিত্র বিষয় নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে ওদের মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলো। তার পরে যা তারা গ্রহণ করবে তা যাতে দান করতে পারে সর্বদাই তার চেষ্টা কোরো। সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে ওদের বক্তৃতা সভা আহ্বান কোরো—যে-বিষয়ে বক্তৃতা হবে আগে থাকতে খুব ভালো করে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করে ওদের মনকে প্রস্তুত করে তুলো। বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মননশক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোনো কালে সবল হয় না। তোমরা গয়লার কাজ ছেড়ে দিয়ে রাখালের কাজ কোরো।

টীকা :

অনাথনাথ বসু

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের কাজে সফলতা লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। ১৯২০ সালের প্রথমার্ধে (আনুমানিক) তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার পদে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে তিনি বিলাতযাত্রা করেন। ১৯৫৭ সালে পুনরায় তিনি শান্তিনিকেতনে বিনয়ভবনের অধ্যক্ষের পদে যুক্ত হন।

জন্ম—১৩০৬, মৃত্যু—১৩৬৮।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

মাতৃভাষা

পঠনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ন্যাশনল ফন্ড।
২. শিক্ষার হেরফের।
৩. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)।
৪ শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।
৫. বাংলা শিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)।
৬. ইংরেজি শেখা।
৭. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৮. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।
৯. শিক্ষার বাহন।
১০. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ।
১১. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ।
১২. ছাত্রসম্ভাষণ ইত্যাদি।

৫৯। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র ১নং

[১৭ মার্চ, ১৯২৯,
বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯, পৃঃ ১-৩]

…পাঠভবনে হাতের কাজ, কলের কাজ, ইন্দ্রিয়বোধ চর্চা, সামাজিকতা চর্চা, গৃহসামগ্রীর পারিপাট্য, পরিবেশের সৌষ্ঠবসাধন প্রভৃতি ব্যাপারে যে সব খরচ অত্যাবশ্যক সেইগুলো জোগাবার জন্যেই আমি বিশেষ ভাবে প্রেসিডেন্ট ফন্ড খুলেছিলুম। ঐ কাজগুলো যেন মনোযোগ বা উপকরণ অভাবে বন্ধ না থাকে—এবং যেন ঐচ্ছিকভাবে না হয়ে আবশ্যিকভাবে করানো হয়। মাঝে মাঝে ইংরেজি নাটক অভিনয় ভাষা শিক্ষার পক্ষে উপযোগী এ কথা যেন মনে থাকে—অবশ্য এই সুযোগে উচ্চারণ এবং একসেন্টের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। অভিনয় উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষ্যে শ্রীনিকেতনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের ঘনিষ্ঠযোগ থাকা অবশ্যকর্তব্য—এমন কি, সাঁওতাল পাড়া ও ভুবনডাঙার ছেলেদেরও কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া উচিত। গ্রামের অবস্থা পর্যবেক্ষণ শিক্ষায় কালীমোহন যদি ছেলেদের সাহায্য করে তাহলে ভালো হয়—আমি বারবার বলেছি এই শিক্ষা খুবই দরকারী।

টীকা ঃ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের পুত্র। কৃষিতত্ত্ববিদ, কারুশিল্পী এবং বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। জন্ম—১৮৮৮, মৃত্যু—১৯৬১।

কালীমোহন ঘোষ

পল্লী সংগঠনের কাজে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগী। শ্রীনিকেতনের মুখ্য সংগঠকদের অন্যতম। জন্ম—১৮৮২, মৃত্যু—১৯৪০।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও গঠনমূলক আদর্শ

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ৩নং।
২. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ১নং।
৩ শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি।
৪. আশ্রমের শিক্ষা ইত্যাদি।

৬০। কলাবিদ্যা

[বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৬, (১৯২৯), পৃঃ ৬৫২-৫৩]

…মানুষ আপন অন্তরতম ইচ্ছাকে ভালবাসাকে শুধু কেবল আপন ব্যবহারের দ্রব্যের মধ্যেই প্রকাশ করে তা নয়, তার সংগীত তার চিত্রকলা এই প্রকাশের প্রধান বাহন। এর দ্বারাই দেশ আপন অন্তরের আবেগকে বাহিরে রূপ দান করে এবং তাকে চিরন্তন ক'রে উত্তর কালের হাতে সমর্পণ ক'রে যায়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিস জাতিবিশেষে যার তারতম্য আছে কিন্তু প্রকারভেদ নেই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান; যে সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাদের প্রমাণ করবার প্রণালী সর্বত্র এক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্যবিচার এক নিয়মে হবে আর ইংলণ্ডের অন্য নিয়মে হবে, এ হ'তেই পারে না। বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তার ফল দেশভেদে বিভিন্ন হবে, এও অসম্ভব। অতএব বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিচ্ছে তা সর্বত্র এক হবেই।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকবেই ; আর থাকাই শ্রেয়। এ-কে নষ্ট করা আত্মহত্যা করারই সামিল। এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নেই। স্থান থাকার যে গুরুতর প্রয়োজন আছে সে বোধ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকের মন হতে চ'লে গেছে।

এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশের বিদ্যা অভাবের অনুচর। ইংরেজি শিখলে চাকরী হবে বা রাজসম্মানের সুযোগ ঘটবে, দরিদ্রের এই মনোরথ আমাদের দেশের বিদ্যাকে চালনা করছে। পাছে সেই লক্ষ্যসাধন হ'তে লেশমাত্র বিক্ষেপ হয় এই ভাবনায় আমাদের দেশের লোক ব্যাকুল। এই লক্ষ্যসাধনের কাছে দেশের সমস্ত মহত্তর কল্যাণকে বলিদান করতে আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই।

ইংরেজ ত ভাষা ভুগোল ইতিহাস গণিত বিজ্ঞান সবই শিখছে, আর তার সংগে সংগে সংগীত চিত্রকলা ও অন্যান্য সকল কলাবিদ্যাই শিখছে। এই সকল ললিত কলা শিক্ষা দ্বারা তার পৌরুষ খর্ব হচ্ছে এমন প্রমাণ হয় না। সংগীতনিপুণ ব'লে জার্মানজাতি অস্ত্রচালনায় অলস বা বিজ্ঞানচর্চায় পিছপাও, এ কথা কে বলবে ? বস্তুত আনন্দপ্রকাশ জীবনী-শক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দপ্রকাশের পথগুলিকে মেরে দিলে জাতির জীবনী-শক্তিকেই ক্ষীণ ক'রে দেওয়া হয়। যে লোক কাঠের কারবার নিয়ে আছে সে মনে করতে পারে গাছের পক্ষে ফুল ফল পাতাগুলো সৌখীনতা মাত্র, ওরা শক্তির অপব্যয়, আসল সারবান জিনিস হচ্ছে গাছের কাষ্ঠ অংশ। একথা ভুলে যায় যে, উদ্ভিদরাজ্য হ'তে ফুল যদি বিলুপ্ত হয় তবে কাঠও তার সহমরণে যাবে। তেমনি যে জাতি আনন্দ করতে ভোলে সে জাতি কাজ করতেও ভোলে। জাপানী কাজ করতে নিরলস, প্রাণ দিতে নির্ভীক, কিন্তু চেরি ফুল ফোটার সৌন্দর্য সম্ভোগ নিয়ে দেশের ছেলে-বুড়ো সকলেই উৎসব করে এবং চিত্রকলার পরম মূল্য বোঝে না এমন মূঢ় সে দেশে কেউ নেই। আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর ব'লে জানে। এ কেবলমাত্র আমাদের মজ্জাগত দীনতার লক্ষণ। এতে আমাদের প্রকৃত কর্মশক্তিকেই দুর্বল করছে।

আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে এই যে দারিদ্র্য তার লক্ষণ ও ফল আমাদের শান্তিনিকেতনের বালকদের মধ্যেও দেখতে পাই। এখানকার বিদ্যালয়ে সংগীত ও চিত্রবিদ্যা শেখাবার ভাল ব্যবস্থাই আছে। ছেলেদের অনেকেরই গান গাইবার ছবি আঁকবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে। যতদিন তারা নীচের ক্লাসে পড়ে ততদিন তাদের গান গাওয়া বা ছবি আঁকা শেখানো শক্ত হয় না, এতে তারা আনন্দই বোধ করে। কিন্তু উপরের ক্লাসে উঠবামাত্র আমাদের দেশের শিক্ষার লক্ষ্য তারা বুঝতে পারে, তার অন্তর্নিহিত দীনতা তাদের আক্রমণ করে। তখন হ'তে পরীক্ষার পড়ার বাইরে এই সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে তাদের মন বেঁকে বসে। অন্য বিদ্যার প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা জন্মে। এর কারণ সমস্ত সমাজের মধ্যে যে শিক্ষাগুলির প্রতি

ঔদাসীন্য আছে, একটু বয়স হ'লে ছাত্রদের মনেও সেই সব শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য সঞ্চারিত হয়। এ কেবল আমাদের এই হতভাগ্য দেশের অন্তর বাহিরের দারিদ্র্যেরই লক্ষণ।

বাল্যকাল হ'তেই আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপে কলাবিদ্যার সংস্রব হতে দূরে থাকেন। এতে দেশের যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে তা অনুভব করবার শক্তি পর্যন্ত তাঁরা হারিয়ে ফেলেন।...

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও চারুশিল্প

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. শিক্ষাসংস্কার। ৩. তপোবন। ৪. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৫ জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৬. অসন্তোষের কারণ। ৭. আকাঙ্ক্ষা। ৮. প্রাক্তনী (৬নং)। ৯ বিশ্বভারতী ৪নং। ১০. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১১. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১২. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ১৩ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ১৪. শিক্ষার সার্থকতা। ১৫. শিক্ষার আদর্শ। ১৬. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৭. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১৮. বিশ্বভারতী ১৭নং। ১৯. বিশ্বভারতী ১৮নং। ২০. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ২১. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান ইত্যাদি।

৬১। বিশ্বভারতী ১৪নং

[বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ (১৯৩০)]

...সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না।

আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে; গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্য পরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম ব'লে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগাৎ রূপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন, তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুলমাস্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম; শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য-ভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়ে অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শুরু হল, এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম।...

বিশ্বভারতী, ২।১১।৭৯০

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ১৪নং

উক্ত রচনাটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭) 'কর্মের স্থায়িত্ব' নামে প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

প্রকৃতি

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষাসমস্যা।
২. তপোবন।
৩. জগদানন্দ রায়কে পত্র ১নং।
৪ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং।
৫. বিশ্বভারতী ৪নং।
৬. বিশ্বভারতী ১০নং।
৭. বিশ্বভারতী ১৭নং।
৮. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ।
৯. The School Master.
১০. A Poet's School ইত্যাদি।

৬২। ভক্তি দেবীকে পত্র

[বার্লিন, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ পৃঃ ২২৪]

ভারতবর্ষের যে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাব্যবস্থা আছে তার পঙ্গুতা আমরা সবাই জানি। কিন্তু উপায় নেই। পেটের দায়ে ছেলেরা এই ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য—কিন্তু জীবিকার জন্য শিক্ষা মেয়েদের তেমন অপরিহার্য হয়নি। এইজন্য বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিদ্যাদানের উৎকৃষ্ট প্রণালী মেয়েদের জন্যেই প্রবর্তন করা সম্ভবপর। যদি করে তুলতে পারি তবে এবারকার মতো এইটেই আমার শেষ সার্থকতা হবে।…

টীকা ঃ

ভক্তি দেবী

বারাণসীর দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর কন্যা। আশা আর্যনায়কম এবং লেডি রাণু মুখার্জির ভগিনী।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

স্ত্রীশিক্ষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. স্ত্রীশিক্ষা।
২. য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি থেকে ইত্যাদি।

৬৩। রাশিয়ার চিঠি ১নং

[১ম পত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭]

…আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী

প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম ! শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষাবিস্তার করে চলেছে—সায়ান্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।...

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ১০-১১, বিশ্বভারতী, ১৩৭০

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার বিস্তার।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি।
২. শিক্ষার বাহন।
৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং।
৪. পল্লীসেবা।
৫. শিক্ষার বিকিরণ।
৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৭. মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ইত্যাদি।

৬৪। রাশিয়ার চিঠি ৩নং

[৩য় পত্র প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লিখিত। প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৭]

... পৃথিবীর লোকের কাছে এ কথা প্রচারিত যে, আমরা হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব, ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চলত—গেল কী উপায়ে ? কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

...মানুষের সকল সমস্যা-সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ, কারণ 'ল অ্যান্ড অর্ডার' আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি

কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম—জনসাধারণকে আত্মশক্তিকে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি। ..

তাই যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অংক থেকে প্রভুত পরিমাণে বেড়ে গেছে তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যান্ড অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।...

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী ১৩৭০ পৃঃ ২১-২২

টীকা ঃ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

বিশ্ববিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন।
জন্ম—১৮৯৩, মৃত্যু—১৯৭২।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার অগ্রাধিকার, শিক্ষার বিস্তার

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি।
২. শিক্ষার বাহন।
৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং।
৪. পল্লীসেবা।
৫. শিক্ষার বিকিরণ।
৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৭. মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ইত্যাদি।

৬৫। রাশিয়ার চিঠি ৪নং

[৪র্থ পত্র নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৭]

… যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করবার সাহস; কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না; পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।

বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর-একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেছে আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করেনি তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে—শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভুষো, পুঁথির পাতার পর্দা ভেদ করে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না, তারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এই জন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। …বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, কেরানি-তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিকরাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক্-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্য-লাভই আমাদের সদ্গতি। সেইজন্যে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যা-শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।…

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী ১৩৭০, পৃঃ ২৭

টীকা ঃ

নির্মলকুমারী মহলানবীশ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সহধর্মিণী ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে', 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে', 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থগুলি নির্মলকুমারী রচনা করেন। জন্ম—১৯০০, মৃত্যু—১৯৮১।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে শ্রেণীভেদ, ঔপনিবেশিক শিক্ষার চরিত্র

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি।
২. শিক্ষার বাহন।
৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং।
৪. পল্লীসেবা।
৫. শিক্ষার বিকিরণ।
৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৭. মহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ইত্যাদি।

৬৬। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ্

(অনুষ্ঠান-পত্র)

[২৬শে মাঘ, ১৩৩৭। বিশ্বভারতী পল্লীসেবা বিভাগ হইতে প্রকাশিত।]

…অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্যক্ নৈপুণ্যসাধন; দৃষ্টির ও মননশক্তির সম্যক্ অনুশীলন; তরুলতা, পশুপক্ষী ও বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র ব্যাপার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও অনুরাগের চর্চা; প্রতিদিনের ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ; বাসস্থান সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখার অভ্যাস; বেশভুষা, স্নান-আহার, ব্যায়াম ও বিশ্রাম প্রভৃতি শরীর সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যবস্থা যাহাতে পরিষ্কার, পরিপাটি, সুসংযত, সুশোভন ও শক্তিসাধক হয় সেইরূপ নিয়মের সতর্ক অনুসরণ করা; ছাত্রদের পরস্পরের প্রতি, গুরুজনের প্রতি ব্যবহারে বিনয়-রক্ষা; যাহাতে সামাজিকতা-বৃত্তির বিকাশ হয় সেইরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন; আপৎ-কর্মে অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশীদের সর্বপ্রকার আনুকূল্যে তৎপরতা; স্বদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও তৎপ্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বোধের উদ্রেক; পরজাতির প্রতি প্রীতিবৃত্তি ও তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে ন্যায়পরতার বিকাশ সাধন; সভ্যসমাজে লোকহিতের জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ও যে-সকল নূতন প্রচেষ্টার প্রবর্তন ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ;—এইগুলি আমাদের…শিক্ষার অঙ্গ। সংক্ষেপতঃ, মনে, হৃদয়ে ও ব্যবহারে যাহাতে ছাত্রেরা মনুষ্যত্বের সকল বিভাগেই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। …নিজেদের প্রতিবেশকে সর্বতোভাবে সমর্থ ও আত্মশাসনক্ষম করিয়া তোলাই যে সমস্ত দেশের স্বরাজের ভিত্তিস্থাপন, ছাত্রদিগকে হাতে কলমে তাহাই বুঝাইতে হইবে।

টীকা :

স্কুল-কলেজের বাইরে, দেশের সর্বত্র স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে—বিশেষ করে' যাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার সুযোগ কম তাদের সকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্বতন্ত্র একটি লোকশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প রবীন্দ্রনাথের বহুদিনের। ১৯৩১ সনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ইত্যাদি বিবৃত করে' একটি অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশ করেন। পাঁচ বছর পরে ১৯৩৬ সালের মে মাসে স্বতন্ত্র পাঠক্রম ও পরীক্ষাবিধি নিয়ে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও অনুশীলন

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. শিক্ষাসংস্কার। ৩. তপোবন। ৪. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৫. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৬. অসন্তোষের কারণ। ৭ প্রাক্তনী ৬নং। ৮. আকাঙ্ক্ষা। ৯. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১০. বিশ্বভারতী ৪নং। ১১. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১২. কলাবিদ্যা। ১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১নং। ১৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪নং। ১৫. শিক্ষার সার্থকতা। ১৬. শিক্ষার আদর্শ। ১৭. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৮. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১৯. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২০। বিশ্বভারতী ১৮নং। ২১ ধর্মশিক্ষা। ২২. বিশ্বভারতী ১নং। ২৩. শান্তিকেতন আশ্রমের শিক্ষা-নীতি। ২৪. শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ২৫. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

৬৭। রাশিয়ার চিঠি ৮নং

[৮ম পত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭]

...রাশিয়া-যাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ওখানে জনসাধারণের শিক্ষা-বিস্তারের কাজ কিরকম চলছে আর ওরা তার ফল কিরকম পাচ্ছে সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যতকিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।..

জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, দেশের অর্থ-উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমান তুরস্ক প্রবল বেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। কেননা ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয়নি—যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতে রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।...

৪ অক্টোবর ১৯৩০। রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী ১৩৭০, পৃঃ ৬৩-৬৪।

টীকা ঃ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ। 'প্রবাসী', 'প্রদীপ', 'দাসী', 'ধর্মসিন্ধু', 'মুকুল' ও 'মডার্ণ রিভিয়্যু' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। জন্ম—১৮৬৫, মৃত্যু—১৯৪৩।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষার বিকিরণ

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি।
২. শিক্ষার বাহন।
৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং।
৪. পল্লীসেবা ইত্যাদি।

৬৮। পল্লীসেবা ১নং

[শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত ভাষণ, [redacted] ১৩৩৭, পল্লীপ্রকৃতি।]

যাদের আমরা ভদ্রসাধারণ নাম দিয়ে থাকি তারা যে বিদ্যা লাভ করে, তাদের যা আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা, তারা যে-সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে, সে-সব হল মরা নদীর শুষ্ক গহ্বরের এক পাড়িতে—তার অপর পাড়ির সঙ্গে জ্ঞান-বিশ্বাস আচার-অভ্যাস দৈনিক জীবনযাত্রায় দুস্তর দূরত্ব। গ্রামের লোকের না আছে বিদ্যা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ, না আছে অন্নবস্ত্র। ওদিকে যারা কলেজে পড়ে, ওকালতি করে, ডাক্তারি করে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তারা রয়েছে দ্বীপের মধ্যে—চারিদিকে অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ।...

...দেশ সম্বন্ধে আমাদের যে উদ্যোগ তার থেকে দেশের লোক বাদ পড়ে। এটা আমাদের এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এর বিপুল বিড়ম্বনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই। একটা তার দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমনভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়—সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চার দিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য—অর্থাৎ, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখবার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতোই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোনোমতেই পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে—চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।

জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এত বড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর-কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই—জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে 'আদিম পাপ'। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষা-গত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেছি। ইংরেজি হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না এমন কথা বলাও যা আর ইংরেজি ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক সাধনা হতেই পারবে না এও বলা তাই।

এই উপলক্ষে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানি ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য ক'রে তবে জাপানি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে—ভদ্রলোক ব'লে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝেনি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটোলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল। অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনা অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না, বিশ্বসমাজের তো কথাই নেই।

রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই কিছু বলি-না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে ব'লেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত, তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে

আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশে নয়।…

…আমাদের হতভাগ্য দেশে দেখি মাটির প্রদীপে যে আলো একদিন এখানে জ্বলেছিল তাতেও আজ বাধা পড়ল। আজ আমাদের ডিগ্রীধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্যে অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এইরকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকেরা আমাদের পক্ষে বিদেশী। এমন-কি, তার চেয়েও তারা বেশি পর, তার কারণ এই—আমরা স্কুলে কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই সে বিদ্যা য়ুরোপীয়। সেই বিদ্যার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো আমাদের পক্ষে সহজ। ইংলন্ড ফ্রান্স জার্মানির চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান ; তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয় ; এমন-কি, যে কামনা, যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা-সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু যারা মা ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেসপঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে, তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয় ; কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে ঠিকমত সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।…

রা।১৩।৫১৮-২০

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষায় মাতৃভাষা, শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে বিচ্ছেদ

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. শিক্ষার হেরফের।
২. শিক্ষার বাহন।
৩. শিক্ষার বিকিরণ।
৪. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি—ইত্যাদি।

৬৯। রাশিয়ার চিঠি ৯নং

৯ম পত্র নন্দলাল বসুকে লিখিত। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭]

…দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল; সোভিয়েট শাসনে এইজাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে—অর্থাৎ, আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।…

৫ অক্টোবর, ১৯৩০। রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী, ১৩৭০, পৃঃ ৭১

টীকা :

নন্দলাল বসু

খ্যাতনামা শিল্পী নন্দলাল ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগদান করেন। একাধারে আশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সমগ্রজীবন অতিবাহিত করেন।

জন্ম—১৮৮৩ ; মৃত্যু—১৯৬৬।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষার বিস্তার

তুলনীয় প্রসংগ :

১. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি।
২. শিক্ষার বাহন।
৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং।
৪. পল্লীসেবা।
৫. শিক্ষার বিকিরণ।
৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৭. মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ইত্যাদি।

৭০। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৬নং

[নথিপত্রের সংকলন, অনুবাদ—শুভময় ঘোষ, বিদেশী ভাষা সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, ১৯৬১, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ২৪-২৬]

…আমি এসেছি শিখতে, জানতে, কেমন করে আপনারা নিজেদের মতো করে এক বিরাট সমস্যা, লোকশিক্ষার বিশ্বসমস্যার সমাধান করছেন।…

ব্যক্তিগত ভাবে আমিও আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজের মতো করে কাজ করে চলেছি, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত হল তাকে জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে ; তাকে জীবনের অংশ হতে হবে। যথার্থ শিক্ষা লাভ করা যায় যথার্থ জীবনধারণের ফলেই, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয় যা সভ্য জগতের ইস্কুল কলেজে প্রায়ই ঘটে—সে যেন এক খাঁচা, তার ভিতরে শিশুদের যত কৃত্রিম পথ্য জোগান হয়। যথার্থ জীবনের মধ্যে দিয়েই আমরা প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারি।

এই ধারণাটাকে আমি আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে এসে দেখছি আপনাদের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের খুবই মিল রয়েছে ; দেখছি মানুষ এখানে জীবনের পূর্ণতায় বেঁচে আছে, তার মধ্যে দিয়ে তাদের মন শুধু বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক তালিম বা তথ্য নয় শিক্ষার পূর্ণতাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে উঠছে।

তাদের বুদ্ধিকে আপনারা উদ্বুদ্ধ করছেন সৃষ্টির কাজে, যা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন। এর জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ আমারও স্বপ্ন তাই।…আপনাদের দেশে আপনারা তাকে যথার্থ রূপ দিতে পেরেছেন, প্রয়োজনীয় গতিবেগ ও উৎসাহ দিয়ে তাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। আমার ধারণা, মানবজাতির প্রতি আপনাদের দেশের এটি একটি অক্ষয় উপহার—লোকশিক্ষার এই আদর্শ।…

টীকা :

রুশ সোভিয়েত ফেডারিটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত লেখকদের সংযুক্ত ফেডারেশনের সম্বর্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার স্টেনো রিপোর্ট, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষা ও জীবন, শিক্ষার লক্ষ্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১ শিক্ষার হেরফের। ২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৩. আকাঙ্ক্ষা। ৪. বিশ্বভারতী ৪নং। ৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮নং। ৬. শিক্ষার সার্থকতা। ৭. আবরণ। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ১০. শিক্ষাসংস্কার। ১১. তপোবন। ১২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ১৩. অসন্তোষের কারণ। ১৪. প্রাক্তনী ৬নং। ১৫. বিশ্বভারতী ৪নং। ১৬. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৭ জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৮. কলাবিদ্যা। ১৯ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১৫নং। ২০. শিক্ষার আদর্শ। ২১. বিশ্বভারতী ১৫নং। ২২. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ২৩. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২৪. বিশ্বভারতী ১৮নং ইত্যাদি।

৭১। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮নং

মারিয়া স্টেইনহাউস :…শুনলাম গতকাল আপনি ভারতবর্ষে আপনার শিক্ষামূলক কাজের কথা বলেছেন। আপনার ইস্কুলে জীবনের সঙ্গে পাঠের মিল কী ভাবে ঘটান হয়েছে, পরিপার্শ্বের সবার সঙ্গে কী ভাবে আপনি কাজ করেন তা বললে ভালো হয়।…

রবীন্দ্রনাথ ঃ ··সব খুঁটিনাটির বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ ভাষণের কোন প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে, আমার আদর্শ ছিল এই—শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গ হতে হবে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক নির্বস্তুক কিছুতে পরিণত হওয়া তার উচিত নয়। তাই শিশুদের আমার কাছে এনে তাদের সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ দিলেম। তাদের ইচ্ছামত সবকিছু করারই স্বাধীনতা ছিল। যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা অদের দিয়েছিলেম। সব সময় চেষ্টা করেছি তাদের সব কাজে এমন কিছু তুলে ধরতে যা তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক।

চেষ্টা করেছি তাদের মনে সবকিছু সম্বন্ধেই ঔৎসুক্য জাগাতে—প্রকৃতির সৌন্দর্যে, আশেপাশের গ্রামে, অভিনয়ের মাধ্যমে, সাহিত্যে, সংগীতে। প্রকৃতির রাজ্যের সবকিছু দিয়ে, শুধু ক্লাশের পড়া দিয়ে নয়, পর্যবেক্ষণ ও স্বক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে।

আমি যখন নাটক লিখতেম কতদূর লেখা হল, কী ভাবে নাটকটা এগচ্ছে, সে বিষয়ে গভীর ঔৎসুক্য জাগত তাদের। নাটকের মহড়ার সময় তারা বার বার নাটক পড়ত, তাই তারা ব্যাকরণ পাঠ আর ক্লাশের পড়ার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান পেত। এই ছিল আমার পদ্ধতি। শিশুদের মন আমি জানতেম। তাদের সচেতন মনের চেয়ে অবচেতন মনই বেশি সক্রিয়। তাই সবচেয়ে বড় কথা হল তাদের নানা রকমের কাজকর্মে টেনে আনা যা তাদের মনকে নাড়া দিয়ে ক্রমশ তাদের মনে চারপাশের জগতের প্রতি ঔৎসুক্য জাগাবে।

শুধু গানের ক্লাস নয়, সন্ধ্যায় গানের আসরও বসত। যে ছেলের গানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না, তারাও কৌতূহলবশত ঘরের বাইরে থেকে আমাদের গান শুনত। ক্রমে তারা এসে বসত ঘরের ভেতর, সংগীতে রুচি গড়ে উঠত তাদের। আমাদের দেশের কয়েকজন খুবই বড় শিল্পী আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা কাজ করতেন আর ছেলেরা দেখত তাঁদের কাজ কেমন ভাবে এগচ্ছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা একটা পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই গড়ে তোলাটা পাঠক্রম গড়ে তোলা নয়, এমন একটা কিছু গড়ে তোলা যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে— অর্থাৎ পরিবেশ।...

.. চেষ্টা করলেম এই ইস্কুলে এমন কিছু যেন থাকে যা চলতি ইস্কুলে পাওয়া যাবে না। শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে একই জীবনযাপন করতেন। গড়ে উঠল একটা গোষ্ঠিজীবন, খেলাধূলায় উৎসবে সর্ব ক্ষেত্রেই শিক্ষক ছাত্ররা মিলেমিশে যোগ দিতেন। খাঁচার মতো নয়, যেখানে বাইরে থেকে খাবার যোগান হয় পাখিকে, বরং বলা উচিত একটা নীড়ের মতো। ছাত্ররা নিজেরাও তাকে গড়ে তুলল তাদের জীবনযাত্রা, ভালবাসা, প্রতিদিনের কাজ, তাদের খেলাধূলা প্রভৃতি যা কিছু এই বিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে পারে তা দিয়ে। প্রতিষ্ঠানের এইটেই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।...

...আদর্শটা এখনো আছে যদিও ঘটনাচক্র ও যুগধর্মে জীবনের সঙ্গে তার কিছু বিচ্ছেদ ঘটেছে। তবু আমার ধারণা একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছে আর তা এখনো বজায় রয়েছে। বিদ্যালয় এখন বড় হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে; অবশ্য সেটা যে সবসময় ভাল তা নয়। কিন্তু উপায় নেই।

পরে আর একটা দিক দেখা দিয়েছে, মেয়েদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। আমাদের ওখানে এখন প্রায় ষাটটি মেয়ে আর সত্তরটি ছেলে পড়ে। এই কোএডুকেশনের ব্যবস্থাটিও ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে নতুন ব্যাপার। কিন্তু তা নিখুঁত ভাবেই কাজ করছে। অভিযোগের কোন কারণ আমাদের ঘটেনি। প্রায়ই তারা একসঙ্গে বেড়াতে যায়। ছেলেরা কাঠ কেটে জল তুলে মেয়েদের সাহায্য করে। মেয়েরা ছেলেদের বেঁধেবেড়ে খাওয়ায়। বেশ কয়েকদিন ধরে তারা একসঙ্গে বেড়ায়। এটিই একটি বিরাট শিক্ষা।

আরেকটি জিনিসও আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আমি সব সময় চেষ্টা করি দেশের বাইরে থেকেও—ইউরোপ থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে গিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করার। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও তা করতে পারলে ভাল হত। বিদ্যালয়ের পরিবেশের এটিও একটি অঙ্গ। এই বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের

ব্যবহার খুবই সহজ স্বাভাবিক। আমার আদর্শ হল—মনের সর্বপ্রকার মুক্তি। আমাদের ছেলেবেলাকার শিক্ষার ফলে আমরা স্বদেশ, স্বজাতি, আমাদের মহাপুরুষ আর ইতিহাস আর কুসংস্কারকে এক ধরনের বেড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছি। বড় হয়েও তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়, এমনকি আমাদের ইস্কুল-পাঠ্যবইগুলোতেও তার সোৎসাহ চর্চা চলে, আর সে কাজ করেন এমন সব ব্যক্তি যাঁরা অন্য দেশকে ছোট করে ছেলেদের মনে নিজেদের কীর্তিতে গর্ব জাগাতে চান। এর ফলে আসলে জাতীয়তার নামে কতগুলো কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরা হয়। বিদেশীদের ডেকে এনে আমি আমার ছেলেদের মনে আমাদের অতিথিদের প্রতি প্রীতি জাগাতে চেয়েছি, মনে হয় তাতে সফলও হয়েছি।

অন্যান্য ধরনের কাজও আছে। আমাদের পাশের গ্রামগুলিতে আদিবাসীদের বাস। তারা আমাদের সাহায্যের প্রত্যাশী। আমরা কয়েকটি সান্ধ্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছি, আমাদের ছাত্ররা সেখানে চাষীদের পড়ায়। তারপর আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামসেবারও ব্যবস্থা আছে। ছেলেরা তার ফলে গ্রামজীবনকে জানতে পারে। কৃষি ও স্বাস্থ্যরক্ষার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে গ্রামবাসীদের কী ভাবে সাহায্য করা যায় তা তারা শেখে। আমার মতে প্রকৃত শিক্ষা হল শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, পূর্ণ জীবনযাপন।

আমাদের ছাত্রদের একটি জিনিস কেবল দিতে পারিনি, তা হল গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। তার কারণ বিপুল খরচ, আমাদের দরিদ্র দেশে তার সংস্থান খুবই কঠিন। আমি এখনো তার ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমাদের ছাত্ররা আর আমি এই আশাই পোষণ করি যে, একদিন এ ত্রুটি দূর করা সম্ভব হবে।…গ্রামসেবাই নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ছেলেদের পড়াশুনো ও কাজের সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন, কারণ গ্রামের কোলেই আমাদের জীবনযাত্রা। তার প্রাপ্য যদি তাকে না দিতে পারি, তবে আমরা নিজেদেরই মারব। সভ্যতা সেটাই করছে। গ্রামকে তার প্রাণরস থেকে বঞ্চিত করছে, তার সবকিছু শুষে নিয়ে চালান দিচ্ছে সোহাগের সহরে।

এই বিশ্বাসবশেই আমার ছাত্রদের আমি এই গ্রামের কাজে টেনে এনেছি। এই কাজ শুরু করেছি কারণ আমার ছাত্রদের পক্ষে গ্রামকে ঠিকভাবে সাহায্য করতে শেখাটা প্রয়োজন। আমার ইস্কুলকে আমি যে-আদর্শ মনে রেখে গড়তে চেয়েছি তা সংক্ষেপে এই।…

প্রশ্ন ঃ আপনার ছাত্ররা সমাজে কোন অবস্থা থেকে এসেছে? চাষীমজুর প্রভৃতি ঘরের শিশুরা আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ ঃ আমাদের ওখানে কোন বাধা নেই। পাশের গ্রামগুলোতে যে আদিবাসীরা থাকে তাদের মধ্যে থেকে কিছু ছাত্র নেবার চেষ্টা একবার করেছিলেম। কিন্তু আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে তাদের রাখা খুবই কঠিন।…

কিন্তু পাশের যে গ্রামে আমরা কাজ করছি সেখানে গ্রামবাসীদের জন্য একটি বিশেষ ইস্কুল খোলা হয়েছে। এই তফাৎটা কেন করলেম এ প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের জন্য যে ইস্কুল, গ্রামের ছেলেমেয়েদের কেন সেখানে পড়তে

দিলেম না ? তার কারণ অপেক্ষাকৃত ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকা নির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রী নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন হাতের কাজ এমন কি সংগীত আর শিল্পকলায় তারা সময় নষ্ট করতে চায় না। তারা চায় পড়া মুখস্থ করে কোন রকমে পাশ করে বেরিয়ে যেতে। আমাকে এ ব্যাপার কিছুটা মেনে নিতে হয়েছে, তা না হলে আমার ইস্কুলে একটি ছাত্রও থাকত না। এর একটি কারণ হল, আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, তাই স্বভাবতই ছেলেরা বড় হয়ে জীবিকা অর্জন করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে চাইবে। তাদের পরীক্ষা পাশের সুযোগ দিতেই হবে। সেই কারণেই আমি আরেকটি ইস্কুল খুলি। সেটি গ্রামের যাদের সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই তাদের জন্য। এই অপর ইস্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। অনতিকাল পরেই এই গ্রামের ইস্কুলটিই সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে, অন্যটি তখন পাবে অবহেলা।...

পৃঃ ৩৩-৪১

টীকা :

মস্কোর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের স্টেনো-রিপোর্ট, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষা ও জীবন, শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষাসত্র।

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. শিক্ষার হেরফের। ২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৩. আকাঙ্ক্ষা। ৪. বিশ্বভারতী ৪নং। ৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৬নং। ৬. শিক্ষার সার্থকতা। ৭. আবরণ। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. মেঘনাদবধ কাব্য। ১০. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ১১. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ১২. শিক্ষাসংস্কার। ১৩. শিক্ষাসমস্যা। ১৪. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ১৫. শিক্ষাবিধি। ১৬. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১৭. অসন্তোষের কারণ। ১৮ বিশ্বভারতী ২নং। ১৯. বিদ্যার যাচাই। ২০. বিশ্বভারতী ৬নং। ২১. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ২২. আলোচনা। ২৩. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ২৪. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ২৫. শিক্ষার বিকিরণ। ২৬. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২৭. আশ্রমের শিক্ষা। ২৮. A Poet's School. ২৯. The School Master. ৩০. তোতাকাহিনী। ৩১. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ৩২. শিক্ষার বাহন। ৩৩. রাশিয়ার চিঠি। ৩৪. পল্লীসেবা ১নং। ৩৫. Letter to L. K. Elmhirst. ৩৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৩৭. মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ইত্যাদি।

৭২। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১০নং

রবীন্দ্রনাথ : বন্ধুরা, তোমরা আমায় যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালে তাতে আমি অভিভূত। তোমাদের এই হাসিখুসি, আশায় আনন্দে ভরা কচি মুখ, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় ভরা, আমার মনে গভীর সাড়া জাগিয়েছে।…

তোমাদের আমি ভাল বুঝতে পারি আরো এই কারণে যে আমার জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ছোটদের নিয়ে। বাংলা দেশে আমার একটি ইস্কুল আছে। সেখানে আমি শিশুদের সঙ্গেই থাকি। চেষ্টা করি একটি পূর্ণ জীবনের পরিবেশে তাদের মানুষ করার। আমি চাই সৃজনশীল জীবনের বিকাশের সব রকম সম্ভাব্য সুযোগ তাদের দিতে। এ সম্ভাবনা শ্রেষ্ঠ উপায়ে কাজে লাগানর জন্য তাদের স্বাধীন উদ্যোগে আমি বিশ্বাস করি।

আমি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেই স্বাধীনতা যার মধ্যে পরিপূর্ণতায় প্রকাশ পায়, মানুষের দুটি গভীর প্রেরণা—মানবপ্রেম ও সমাজসেবা। আমার ইস্কুলে শিশুদের আমি এই স্বাধীনতা দিয়েছি।…

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ পৃঃ ৪৭-৪৮

টীকা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আ. এ. কিংগিনার নামাঙ্কিত প্রথম পাইওনিয়র কমিউনের **পাইওনিয়রদের** আলাপ, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

উল্লেখযোগ্য বিষয়/ মন্তব্য :

শিক্ষা ও স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা, মানবপ্রেম ও সমাজসেবা

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. জাতীয় বিদ্যালয়। ৩. প্রান্তনী (৫নং)। ৪. বিশ্বভারতী ১০নং। ৫. ধারাবাহী। ৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান। ৭. The School Master. ৮. A Poet's School. ৯. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং। ১০. আশ্রমের শিক্ষা। ১১. বিশ্বভারতী ১নং। ১২. শিক্ষার সার্থকতা। ১৩. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

৭৩। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১৫নং

রবীন্দ্রনাথ ঃ আমার কৌতূহলের প্রধান বিষয় হল লোকশিক্ষা। আপনারা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়েছেন, এ ঘটনা এখনই তেমন কিছু প্রত্যক্ষ ফল দিতে পারে না। কিন্তু এই প্রথম সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, এককালের শোষিত উৎপীড়িত জনসাধারণের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে কাজে লাগান—এ আপনাদের বিরাট কীর্তি। এ কীর্তি সবচেয়ে ভাল ফল না দিয়ে পারে না, জগৎটাকে আরো নিখুঁত করে তোলার সুযোগ তা দেবেই।

পেত্রভ ঃ সব রকম আর্থনীতিক পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ ফল হল শিক্ষা সংস্কৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঃ আপনি কি মনে করেন লোকশিক্ষার এই প্রসার কেবল আর্থনীতিক পরিবর্তনের ফলেই ঘটেছে?

পেত্রভ ঃ তা বৈকি। তা না হলে আমাদের এই লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে কী ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেত, তা জানি না। বিরাট জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ইস্কুলের পড়া আর ইস্কুল ছাড়া লোকশিক্ষার মধ্যে দিয়ে—আমাদের দেশে তাকে বলে রাজনৈতিক শিক্ষা।...

রবীন্দ্রনাথ ঃ আপনাদের অবস্থায় সাধারণজনের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের আগে যে (অর্থনীতির) প্রচলিত রূপকে ভেঙে দেওয়া দরকার ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু জারের রাশিয়ায় জনশিক্ষা (public education) থেকে জনসাধারণ যত দূরে ছিলেন অন্য অনেক দেশে তেমন হয় নি। ইংলন্ড আর জার্মানীতেও জনসাধারণ জনশিক্ষার ফল পেয়েছেন কিন্তু শোষণ, আর ধনতন্ত্রী উৎপাদনের প্রধান প্রধান ঘাঁটিতে বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সম্পদের স্বাভাবিক সংহতি বরবাদ করা হয়নি। সেখানেও সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রসার সম্ভব, সম্ভব শিক্ষার ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের অন্তরের মুক্তিসাধন। আমার মতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের আমাদের যে সমস্যা—সেটা আভ্যন্তরিক। জনসাধারণ যখন শিক্ষিত হবেন, আত্মশক্তি লাভ করবেন, তখন জনশিক্ষা আর শাসনপদ্ধতির আমূল সংশোধন ঘটাতে পারবেন। বর্তমান অবস্থায় এটি জনশিক্ষা প্রসারে কিছুটা বাধা।

আমি রাশিয়ায় এসেছি শিখতে; আপনাদের লোকশিক্ষা ব্যবস্থা, জনসাধারণের জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়ার কাজ, ব্যক্তিত্বের মুক্তিসাধন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে, কারণ আমি মনে করি স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গটুকুও, ব্যক্তিত্বের মুক্তির সামান্যতম বিকাশও ভাবীকালের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।...

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০, পৃঃ ৬০-৬২

টীকা ঃ

ভক্‌সের সভাপতি ফ. ন. পেত্রভের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের স্টেনো-রিপোর্ট, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

পেত্রভ

অধ্যাপক পেত্রভ রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের একজন প্রধানতম সদস্য। জন্ম—১৮৭৬।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. শিক্ষাসংস্কার। ৩. তপোবন। ৪. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৫. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৬. অসন্তোষের কারণ। ৭. আকাঙ্ক্ষা। ৮. প্রাক্তনী (৬নং)। ৯. বিশ্বভারতী ৪নং। ১০. পূর্ববংগে রক্তৃতা। ১১. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১২. কলাবিদ্যা। ১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৬নং। ১৪. শিক্ষার সার্থকতা। ১৫. শিক্ষার আদর্শ। ১৬. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৭. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১৮. বিশ্বভারতী ১৭নং। ১৯. বিশ্বভারতী ১৮নং ইত্যাদি।

৭৪। শিক্ষার সার্থকতা

[বিশ্বভারতীর কলেজ-বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলিকে লিখিত পত্র। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ পৃঃ-১৭৪]

…বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ষোলো আনা ফল পেয়েছ শুনে পবনবাহন যোগে সাধুবাদ পাঠাচ্ছি। আশা করি হস্তগত হবে। তবু একথাটা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, পরীক্ষার ফল যে খুব বেশী দামী একথা আমি কোনোদিন মনে করিনে, বাল্যকালেই তার পরিচয় দিয়েছি—বৃদ্ধকালেও যে মতের পরিবর্তন হয়েছে তার লক্ষণ দেখিনে।

…আমার মনে শান্তিনিকেতনের যে আদর্শ, এই জায়গায় সেই জিনিসটাকে চোখে দেখে যেমন আনন্দ পেলুম তেমনি দুঃখও লাগল। এখানে দেখলুম সমগ্র জীবনের শিক্ষা—পরীক্ষা পাস তার মধ্যে কালো কালো আঁচড় কাটেনি। এরা প্রাণটাকে পূর্ণভাবে জাগিয়ে তুলছে—নাচে গানে ভ্রমণে ব্যায়ামে ; শিক্ষাটা তারই একটা অংশমাত্র। এদের দলে য়ুরোপের নানা দেশের ছাত্র আছে—বর্ণান্ অনেকান্

—সমস্তটা নিয়ে একটা সৃষ্টি-কার্য চলছে, বীর্য এবং সৌন্দর্য এবং বিদ্যার সাধনা। সরস্বতীকে এরা প্রাণকমলের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে উপাসনা করছে—সে যে পদ্মের পাতা—বর্ণে গন্ধে রূপে রসে সম্পূর্ণ, সে তো পুঁথির পাতা নয়—নীরস প্রাণহীন আনন্দহীন। আমি তো এতদিন ধ'রে এই কথাই বলে এসেছি যে, শিক্ষার যথার্থ সার্থকতা প্রাণের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পরীক্ষা পাস করানো নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথম থেকেই এই বিলাতী বিদ্যাটাকে নিয়ে এতকাল আমরা বণিকবৃত্তি করে আসছি। বোঝা শক্ত হয়েছে যে বিদ্যাকে প্রাণের জিনিস করতে না পারলে তা ব্যর্থ হয়, আর তা করতে হলে প্রাণকে পূর্ণতা দেওয়া চাই। আনন্দ ব্রহ্মের প্রকাশ—প্রাণের প্রকাশও সেই আনন্দ—বিদ্যার প্রকাশও তাই। আনন্দ মানে সুখের বিলাস নয়, আনন্দে তপস্যা থাকা চাই—কিন্তু সেই তপস্যা নোট মুখস্থ করার তপস্যা নয়—জীবনকে সব দিক্ থেকে উদ্বোধিত করার তপস্যা। যে-বিদ্যালয়কে নিজের প্রাণশক্তি দ্বারা ছাত্ররা প্রতিদিন সৃষ্টি না করে সে-বিদ্যালয় বিদ্যার খাঁচা—সেখানে পায়ে শিকল দেওয়া পোষা পাখীরা মুখস্থ বুলি অভ্যাস করে। ...ছাত্রদের প্রতি আমাদের বাণী এই—উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত। জাগরণে পরীক্ষা-তরণে প্রভেদ আছে, এ কথা ভুলো না ভুলো না।

মারবুর্গ, ২৮ জুলাই, ১৯৩০

টীকা :

নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলী

১৯২৮ সালে অক্টোবর মাসে নলিনচন্দ্র শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবন কলেজে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কলেজকে নূতনরূপে গড়তে চেয়েছিলেন। এই সময়ে বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। কলেজবিভাগে দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃত, বাংলা, অর্থনীতি ইত্যাদি পড়াবার ব্যবস্থা হয়। নলিনচন্দ্র ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম ত্যাগ করেন।

মারবুর্গ

জার্মানির শহর।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষা ও জীবন, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. শিক্ষার হেরফের। ২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৩. আকাঙ্ক্ষা। ৪. বিশ্বভারতী ৪নং। ৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৬নং। ৬. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮নং। ৭. আবরণ। ৮. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৯. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ১০. শিক্ষাসংস্কার। ১১. তপোবন। ১২. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ১৩ অসন্তোষের কারণ। ১৪. প্রাক্তনী (৬)। ১৫. বিশ্বভারতী

৪নং। ১৬. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৭. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৮. কলাবিদ্যা। ১৯. শিক্ষার আদর্শ। ২০. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. বিশ্বভারতী ১নং। ২৪. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ২৫. The School Master. ২৬. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১০নং। ২৭. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১৫নং ইত্যাদি।

৭৫। শিক্ষার আদর্শ

[কষ্ঠিপাথর, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃঃ ৮৩২,
মুক্তধারা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮]

আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা তার মূলে সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। বিদেশীর সঙ্গে যে যোগের ব্যবস্থা রয়েছে তারই জন্য ওদের ভাষা শিক্ষা এবং কর্মচারী যোগানোর জন্য শিক্ষার আয়োজন হয়েছিল। এর ভূমিকা বা ভিত্তি এমন কিছুই মহৎ বা বড় ছিল না যা'তে করে সমগ্র দেশকে জাতিকে উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বিদ্যাশিক্ষার যত আয়োজন রয়েছে আমাদের দেশে, তার মুখ্য উদ্দেশ্য বিদেশীর রাজকর্মশালায় কি উপায়ে জায়গা করে দেবে ; এবং এই শিক্ষার জন্যই আমরা চেষ্টা করে থাকি। এই শিক্ষাই আমাদের চিত্তকে সংকীর্ণ করে তুলেছে, দুর্বল করে তুলেছে। জ্ঞানে যে চিত্তকে মুক্তি দান করে, সেখানে এই জ্ঞানহীন শিক্ষা স্বার্থবুদ্ধিকে প্রবল করে তুলেছে। এই শিক্ষার চেষ্টা শুধু পাস করবার, কেরাণী তৈরি করবার, মনুষ্যত্ব উদ্ভাবিত করবার নয়।

আজ কত দেশ কত ভাবে বড় হয়ে উঠেছে, তারা জগৎকে অনেক কিছুই দিচ্ছে। এমন কি নবজাগ্রত জাপান জ্ঞানবিজ্ঞানের অর্ঘ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে কৃতজ্ঞ করছে। কিন্তু আমরা জোগাচ্ছি শুধু কেরাণী আর ডেপুটি আর দারোগা। তার কারণ আমাদের শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যথার্থ বিদ্যার ভিত্তি নেই।

অন্যান্য দেশে বিদ্যার একটা বড় ভূমিকা আছে। সেখানে সমগ্র দেশের সঙ্গে শিক্ষার যোগ। আমাদের দেশে গোড়া থেকেই তার ব্যাঘাত ঘটে এসেছে। আমাদের বিদ্যার সাধনাকে স্বার্থবুদ্ধি ও বিষয়বুদ্ধি ছোট করেছে, সংকীর্ণ করেছে—একে শৃংখলিত করেছে। ছাত্র যে শিক্ষা অর্জন করে তা' স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে করে। কোনো

মহৎ আদর্শকে তারা অনুসরণ করতে শেখেনি। ওরা যে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করে তার মূল্য শুধু হাটে বাজারেই আছে, কিন্তু তার পেছনে মনুষ্যত্ব নেই।

পুরাকালে জ্ঞানের একটা মহৎ সাধনা ছিল। তার আদর্শ ছিল সমগ্র জীবনকে পরিণতি দেওয়া। গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য এগুলি সেই সাধনারই অঙ্গ এবং শিক্ষা তারই অন্তর্গত। এই সাধনার ভিতরে আমরা দেখতে পাই আত্মার আবরণ মোচন এবং এর ভিত্তি হচ্ছে মনুষ্যত্বের উদ্ভাবনা শক্তি। কিন্তু বর্তমানের বিদ্যালয়ে ছাত্ররা এম্-এ; বি-এ পাস করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার অন্তরতম লক্ষ্যকে উপেক্ষা করতে শিখেছে। আমার ইচ্ছা আমাদের এখানকার শিক্ষাসাধনার মূলে থাকবে অন্তরাত্মার আবেদন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের জীবনের ভূমিকা। কিন্তু সমগ্র দেশ লক্ষ্যহীন শিক্ষার দ্বারা নিজের গভীরতম ধর্মকে আঘাত দিয়েছে। পশ্চিম মহাদেশে ধর্ম থেকে মূঢ়তার ভার লাঘব করবার জন্য **প্রাণপণ** চেষ্টা চলে এসেছে; আমরাই শুধু তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছি। এই আশ্রমের আদর্শ হচ্ছে তপোবনের আদর্শ। ছাত্ররা বিশুদ্ধচিত্তে পরস্পরের সঙ্গে স্নেহের ভালবাসার যোগ রেখে যাতে নিজেদের জীবনের প্রতি কর্ম সাধন করে যেতে পারে এবং যা কল্যাণ যা সত্য তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগ্রত হতে পারে, সেইটিই ইচ্ছে করে এই প্রান্তরের প্রান্তে আসন পেতেছিলাম। আমার অন্তরে বাসনা ছিল যে, ছেলেরা আত্মসংযমকে জীবনের প্রধান অঙ্গ করে নেবে, শ্রদ্ধাবান হবে। আমি মনে করি বিজ্ঞান, ভূগোল বা ইতিহাস শিক্ষা এগুলো গৌণ। কিন্তু বিদ্যালয়ের মূল আদর্শের দিকে আমাদের হয়ত দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হয়েছে; এ সম্বন্ধে নানান্ দিক থেকে অনেক রকম বাধাও ঘটেছে। বাইরের আন্দোলনের হাওয়ার মধ্যে থেকে যারা এখানে প্রবেশ করছে তাদের মনের সঙ্গে এখানকার সাধনার সংঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিক। তাতে করে এই আশ্রমটি ক্রমে ক্রমে একটি সাধারণ ইস্কুল কলেজ মাত্র হয়ে ওঠবার আশংকা ঘটে; এর বিশেষ মূলটিকে পূর্ণ করে রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। যারা এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারে না, পাছে তারা আমার এই একমাত্র প্রিয় আশ্রমটিকে বিকৃত করে এই আমার আশংকা এবং এই আশংকাই আমাকে পীড়িত করে।

শাস্ত্র বলেছে—অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান বড়। যে সকল ক্রিয়াকর্ম আমরা অন্ধভাবে করি জ্ঞান তাকে আলোকিত করে। তাতে হয় আত্মশুদ্ধি এবং চিত্তকে সত্যের উপর নিষ্ঠাবান করে তোলে। আবার ধ্যান জ্ঞানের চেয়ে বড়। সমস্ত জ্ঞানকে আপনার করে নেওয়া যায় ধ্যান সাধনার দ্বারা। এই বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঙ্গে ধ্যানের যোগ-সাধন করবার কথা। ধ্যান যদি সফল হয়, তবে আমাদের সব কাজ সব চেষ্টা সফল হবে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও অনুশীলন

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১. জগদীশচন্দ্র বসুকে পত্র। ২. শিক্ষার সার্থকতা। ৩. শিক্ষাসমস্যা। ৪. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৫. ধারাবাহী। ৬ আশ্রমের শিক্ষা। ৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৮. শিক্ষাসংস্কার। ৯ তপোবন। ১০. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১১. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ১২. অসন্তোষের কারণ। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. প্রাক্তনী (৬নং)। ১৫. বিশ্বভারতী ৪নং। ১৬. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৭. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৮. কলাবিদ্যা। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৬নং। ২০. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১৫নং। ২১ ধর্মশিক্ষা। ২২. বিশ্বভারতী ১৫ নং। ২৩. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ২৪ বিশ্বভারতী ১৭ নং। ২৫. বিশ্বভারতী ১৮নং। ২৬. বিশ্বভারতী ১নং। ২৭. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ২৮. শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ২৯. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

৭৬। বিশ্বভারতী ১৫নং

[বিশ্বভারতী নিউজ, জানুয়ারী ১৯৩৩]

আমার মধ্য-বয়সে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি।…এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়, যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।

আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ভুলিনি। আমার বালকমনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অনুরাগ ছিল, তার থেকে নির্বাসিত করে বিদ্যালয়ের নীরস শিক্ষাবিধিতে যখন আমার মনকে যন্ত্রের মতো পেষণ করা হয় তখন কঠিন যন্ত্রণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিষ্ট করলে, এই কঠিনতায় বালকমনকে অভ্যস্ত করলে, তা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদ-বিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায়নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে

তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হয়েছিল, জীবনের কি লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীন কালে গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

বর্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদূর গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিত্তবিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-যে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবায়, এ কোনো বিশেষ কাল বা সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানবচিত্তবৃত্তির মূলে সেই এক কথা আছে—মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের সঙ্গে যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই, যে কালেই, মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণসূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্তসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেই চিত্তসাগরতীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত। ··

আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব ; দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব ; শুধু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য-পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা, কারণ চারিদিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।…

র।১১।৭৯১-৯২

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ১৫নং

১৩৩৯ সালে ৯ই পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদ্-সভায় রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণটি প্রদান করেন, উক্ত রচনাটি তারই প্রবন্ধরূপ। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ (পৌষ-উৎসব সংখ্যা) আচার্যদেবের অভিভাষণ নামে মুদ্রিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

সর্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শ

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ২. শিক্ষাবিধি। ৩. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ৪. বিদ্যাসমবায়। ৫. শিক্ষার মিলন। ৬. বিশ্বভারতী ৪নং। ৭ বিশ্বভারতী ৫নং। ৮. বিশ্বভারতী ৬নং। ৯. বিশ্বভারতী ১০নং। ১০. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ১২. My Educational Mission. ১৩. জাতীয় বিদ্যালয়। ১৪. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ১নং। ১৫. বিশ্বভারতী ১১নং। ১৬. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ১৭. বাঁকুড়ায় ছাত্রদের উদ্দেশে ইত্যাদি।

৭৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত সভায় (ডিসেম্বর ১৯৩২) পঠিত অভিভাষণ পুস্তিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৩৯]

…বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না ; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এ দেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষে তার বিস্তারিত বিচার অসংগত হইবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই ; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বরূপ কিরকম প্রতিভাত হচ্ছে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুল্য, য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভার্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অর্থাৎ য়ুনিভার্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিতসমাজের ব্যবহার সেটা সমূলে ও শাখা-প্রশাখায় বিলিতি।

আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ, এ দেশের সঙ্গে সংগত নয়; এ দেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।

অথচ এই য়ুনিভর্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশীলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কাল-নির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভর্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্রপরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা, তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো-এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থির-প্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্মীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজ-নীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বারবার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর কিন্তু ইতিহাস-বিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেকপ্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হত তা হলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন

ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত ক'রে কী-একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেছে; এই আর্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কিরকম সে নিরন্তর সক্রিয়।

জ্ঞানের একটা দিক আছে, তা বৈষয়িক। সে রয়েছে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার ক'রে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের অভিমুখে কোনো মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই-যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল; তার কারণ, ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্‌বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদ্‌গতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত ক'রে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত ক'রে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কিরকম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখনীচিত্রে দেখতে পাই এর অলংকরণরেখায়িত শুক্তি-রক্ত স্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্যশিখর, ধূপসুগন্ধি মন্দির, ছায়ানিবিড় আম্রবন, নীলপদ্মে-প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল; তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি নয়তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সঙ্ঘের বিস্তারসাধন করেছেন; চারি দিকে উন্নত চৈত্য উঠেছে, সেই চৈত্যগুলির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভাগৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারি দিকে বেদী ও মন্দির; স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্মাণে কিরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন, আধুনিক কালে যে রকমের ইঁট ও গাঁথুনি প্রচলিত এখানকার গৃহনির্মাণের **উপকরণ** ও যোজনাপদ্ধতি তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইৎসিঙ বলেন, এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন-নির্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা

হয়েছে ; বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁদের যশ বহুদূরব্যাপী ; তাঁদের চরিত্র পবিত্র, অনিন্দনীয়। তাঁরা সদ্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের 'পরে সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত ; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল ক'রে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে—কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহুশ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছে। আচার্যেরা জানতেন, দূর দূর দেশকে জ্ঞানবিতরণের মহৎ ভার তাঁদের 'পরে ; সমুদ্র পর্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকার ক'রে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার 'পরে সর্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, ঘোষণা করেছে ; ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেছে।...

আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের যে উদার শ্রদ্ধা প্রভূতত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস।

এ-কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই-সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কিরকম অতিবৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তি বহ্নিশিখা কিরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্‌স্‌ট্‌ বুক্‌ থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ দূর দূরান্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষ্মবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান্‌, সুযোগ্য ; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েছে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত-আট জন বর্জিত হত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরূক। লোকের মনে উদ্‌বেগ ছিল, পাছে অযথা প্রশ্রয়ের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায় সমবেত হত ; তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকাব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতখানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরো নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল ; কিন্তু, জ্ঞানের তপস্যা-উপলক্ষে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায় নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ,

চিত্তসম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশবিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ ক'রে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরো-একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য, নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সংঘে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সংঘ ছিল নানা স্থানে। সেই-সকল সংঘে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশিলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের 'পরিষদ্'এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ-কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

য়ুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেছে। সেখানে খৃস্টধর্মের আরম্ভকালে পুরাতন ধর্মের সঙ্গে নূতন ধর্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নবদীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হল তখন স্বভাবতই পূজার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হল। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্র রূপ ও বিকৃত রূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন ক'রে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে : কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় য়ুরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সংঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্বাচনের দরকার হল। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয়, কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্মসংঘ, তারই সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন; সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্কশাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন, ডায়েলেক্‌টিক সকল বিজ্ঞানের মূল-বিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেইসকল আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদিত অর্থে পেঁছতে গেলে শাব্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কিরকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজ-রক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা। তখনকার য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার য়ুনিভার্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এইসঙ্গে আর-একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে ভাষা নিয়ে। একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পেঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষা-স্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না ক'রে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে য়ুনিভার্সিটি যেমন উদারভাবে সকল দেশের তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ, মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তা হলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ

করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এশিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্র-জাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

য়ুনিভর্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে, বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি যে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করেছে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়; তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্‌বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই। সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর-আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠছে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে য়ুনিভর্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে, এ দেশের দরিদ্রপাড়ায় তারই একটা ছোটো শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা ব'লে কোনো-একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভর্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদ্ঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমত ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিক কালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে আবর্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রবহমান চিত্তের লীলাচাঞ্চল্য। পাশ্চাত্য

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য যেমন জলে স্থলে উভয়তই সক্রিয়। ···

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সম্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতে পাই নে। যে-সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য ব'লে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্‌-স্‌ট্‌-বুক-সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধ'রে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজনদরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ ব'লে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। ···এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনো কখনো এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যার স্বভাবসিদ্ধ।···

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এইরকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে; শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকে সৃষ্টিকার্য চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো-বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে, কিন্তু ভক্তি নেই।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক য়ুরোপ আজ যে বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত তখন জাপান প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার বেগে আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই য়ুরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানবসমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই

তার একান্ত স্পর্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো ক'রে নিজেকে বঞ্চনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মনিবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এইজন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেছে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য ক'রে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের ক'রে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্ত-প্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে, তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র!

এ কথা মানতে হবে, জাপান স্বাধীন দেশ; সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেছে সে মূল্য পুরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করে নি। আর, হতভাগা আমরা পুলিস ও ফৌজ-বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকণা খুঁটে তারই দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখছি ফাঁকা মাল-মসলায়।...

...স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে, অধ্যাপক। এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়ীনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেছি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গি তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজিভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাৎড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে মাস-তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি হেন্‌রি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। শেক্‌স্‌পিয়রের কোরায়োলেনস, টমাস ব্রাউনের রেলিজিও মেডিচি নয় — বেরিয়ল আর্‌ন্‌ এবং মিল্‌টনের প্যারাডাইস রিগেন্‌ড্‌ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থ গ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোট্‌-বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে,

আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর, সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন সাহিত্যশিক্ষার আর-একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্ট-শিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রসস্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন ; তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফবিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।…

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ১৯৯-২১৩

টীকা ঃ

টমাস ব্রাউন (Edward Thomas Brown).

ব্রিটিশ কবি। জন্ম—১৮৫৮, মৃত্যু—১৮৯৩

হেনরি মর্লি (Henry Morley).

ইংরেজ সাহিত্যিক ও অধ্যাপক। জন্ম—১৮২২, মৃত্যু—১৮৯৪

জন মিলটন্ (John Milton)

ইংরেজ কবি। জন্ম—১৬০৮, মৃত্যু—১৬৭৪

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

মাতৃভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিধি

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ন্যাশনল ফণ্ড। ২. শিক্ষার হেরফের। ৩. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৪. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি। ৫ বাংলাশিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)। ৬. ইংরেজি শেখা। ৭ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৮. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৯. শিক্ষার বাহন। ১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। ১১. ছাত্রসম্ভাষণ। ১২. বাংলা শিক্ষার প্রণালী। ১৩. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ।

৭৮। শিক্ষার বিকিরণ

[ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক
আহূত সভায় অভিভাষণ। পুস্তিকা, কলিকাতা ১৯৩৩]

ভোজ্য জিনিসে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কতজনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি ক'রে মনে মনে খুশি থাকি সেটাতে ভাঁড়ার-ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধু ধু করছে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত-পট-জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই **লক্ষ্য** করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখি নে। মিলিয়ে দেখি য়ুনিভর্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতিরূপ দুটো-একটা দেখা দিচ্ছে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এক কালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিসের সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট-পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে ; রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুণ্ঠ আমলা-সেরেস্তায় জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে হয় নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

যেখানে খবরের কাগজের পত্রমর্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষিরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার

অভ্যর্থনা উপলক্ষে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলার কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরুশিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা—দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব।…রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক, এমন একটা-কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেছে দেশে; বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর যাই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিতসমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো-বা করুণকণ্ঠে কখনো-বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রূপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হল ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখা-

শীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা, কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালি-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু, তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলেছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সংগে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছি নে এর মারমূর্তি।

মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে যে-সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এক কালে সে-সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি; গবাক্ষলুণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিতসমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকটসংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধু ধু করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা

বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজল-মিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না; **ওলাউঠা** দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর-এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষিরা ফিরেছে ঘরে। এক দিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারই সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোনো-একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত, এখানেও চিত্তজলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়! তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে-নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে; আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজুটের মধ্যে বিশেষভাবে; তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, ব'হে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্তজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে

বিদ্যা পাই নে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন ; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট্‌বইয়ের শাসন. আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস ; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে ; শ্বশুরবাড়ি নদীর ও পারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায় ?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে এ কালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ও পার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্ঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলাসাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে মন, যে মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব-যুগান্তরে ; আর যে মন রসসম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেশন, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত মিলে ; তার কর্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্য যখন কোনো অসংযম কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্‌ণ বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের ; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেইসঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।…

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল-কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে ;

দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দুর্লভ হল। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন ক'রে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরে মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সেইরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখি নে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থরচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলাসাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় 'শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে ক'মে। বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেস্টিজ্-হানি হত। শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে. শাড়ি-পড়া বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো

ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলাভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এণ্ড. ও. কোম্পানির ডিনারকামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা ; আছে সবই, অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলছি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্ব-সাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী ?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি : তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালি-চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ২১৪-২৩

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষার বিস্তার, মাতৃভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১ মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২ বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪. আকাঙ্ক্ষা। ১৫. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৬. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৭. আলোচনা। ১৮. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৯. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ২০. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮নং। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২ আশ্রমের শিক্ষা। ২৩ A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫. তোতা-কাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. শিক্ষার বাহন। ২৮. রাশিয়ার চিঠি ২নং। ২৯. পল্লীসেবা ১নং। ৩০. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৩১. মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ইত্যাদি।

৭৯। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ

[সিংহলে ১৩৪১) রোটারী ক্লাবে ইংরেজি বক্তৃতার (Ideals of an Indian University) অনুবাদ]

…বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্দেশ্য হওয়া কখনও উচিত নয় যে, কতকগুলো যান্ত্রিক চাকার কল-কব্জা হবে সে জ্ঞান সঞ্চয়ের, আর সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের কাছে শুধু সেই জ্ঞানটুকু বিস্তার করে দেবে, যাতে তারা বেশ এক-রকম সুখ-স্বচ্ছন্দে খেয়ে-মেখে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের ভিতর থেকে অনুশীলনের বীজ বপন করা, আর তা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া। এই বিশাল ভারতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এতবড়ো দেশের ভিতর এমন একটিও বিশ্ববিদ্যালয় আজকার দিনে নেই, যেখানে কোনো ভারতীয় বা বিদেশী ছাত্র, ভারত-অনুশীলনের যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তারা দান বা তার স্বরূপকে অনুভূতিতে গ্রহণ করতে পারে কিম্বা তাকে সে বিষয়ে সজাগ করে দেয়। ভারতবর্ষীয় অনুশীলন-জাত যে মন, তার পূর্ণতা নিয়ে যে ফল, তা কোনো ছাত্রই দেখাতে পারে না। যা আমাদের অভাব, যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তা অর্জন করতে হলে আমাদের যেতে হয় মহাসমুদ্র পার হয়ে ইংলণ্ড ফ্রান্স কিংবা জার্মানীর দরজায় কড়া-নেড়ে ভিক্ষা করতে। যা আমরা করি, তাতে জ্ঞানের যে একটা আত্ম-সম্মান ও মর্য্যাদা আছে, তাকে পরের কাছে একেবারে হীন করে দিই।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু কতকগুলো ঢাক পিটনো শব্দের ডিগ্রী দেয়, যা শুধু ধার-করা ময়ূর পুচ্ছের মতোই দেখায়। আসল কথা হচ্ছে, মানুষের যে জ্ঞান, তার স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠাই দরকার, আর সেই হোলো তার এই অনুশীলনের গৌরব।…

সব চেয়ে দরকারী কথা, সব চেয়ে বড়ো সত্য যা, তা সকল সময়েই ভুলে-যাওয়ার অভ্যাস করে নিয়েছে। সেটা এই যে, শিক্ষক যদি নিজে বিদ্যাবান্ না হয়, তবে সে অন্যকে বিদ্যা দান করে কী করে'। —এক দীপ থেকে অন্য দীপের জ্বলন্—একটা দীপ অন্য একটা প্রদীপকে জ্বালাতে পারে না, যদি না সে নিজে জ্বলে, নিজে না আলো দেয়। যে শিক্ষক শুধু কেতাবের বুলিই আউড়ে চলে, সে কিছুই শেখাতে পারে না, কোনো প্রেরণা সে কখনই জাগাতে পারে না। আর যেখানে সে অনুপ্রেরণা নেই সেখানে চিন্তা তার নিজের গড়ে ওঠবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, আর বেশির ভাগ সময়ই স্কুলে অপচয় হয়, কারণ, তাদের কাছে যা শেখানো হয়, তার বেশির ভাগ হোলো প্রাণহীন বস্তু-কথা। শিক্ষা-আয়তনের সকল সময়ই এই জিনিষটি মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্যে হোলো সত্য-জিজ্ঞাসার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পথ করে দেওয়া, আর জীবন্ত প্রাণবস্তু যে মন, তাকে যে ভাবে নকল-বিদ্যা দিয়ে তৈরী করা হয় তা নয়। …বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা দাবী করব সেই জিনিস গড়ে তোলবার, যা লেবেল-আঁটা ছাপ নয় বা ক্ষমতা-প্রাপ্ত এজেণ্ট নয়। আমরা দাবী করব সেই শিক্ষার যা সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য অনুসন্ধিৎসা এনে দেবে, মানসে এমন একটা মননশক্তি জাগিয়ে তুলবে, যে শক্তি সারাটা দেশ জুড়ে তার খেলা খেলবে।

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইটাই হোলো সবচেয়ে বড়ো কাজ, যা একটা জীবন্ত প্রাণবন্ত জীবের রসসঞ্চালনের পথ হবে, আর যা দেশের লোকের ও জাতির জ্ঞানের একনিষ্ঠার ধারাকে স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করবে।...

শিক্ষার ভিতরে যে জ্ঞানের দিক্, এতক্ষণ আমি তারই কথার আলোচনা করলাম, কারণ প্রকাশভঙ্গির যে পূর্ণতা, তাই জীবনেরও পূর্ণতা। শুধু ভাষার মধ্যেই জীবনের সমস্ত প্রকাশ, পূর্ণ বিকাশ হয় না। সেইজন্য আমরা আমাদের ভাষায় প্রকাশ ছাড়া অন্য দিক দিয়েও জীবন ও অনুশীলনের প্রকাশ-ভঙ্গি চাই। আমাদের মানুষের মন ও চরিত্রকেও ভালো ক'রে জানতে হবে, কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শুধু জ্ঞান-সম্ভারের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে আমাদের সমৃদ্ধ ক'রে তোলা নয়, মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার বাঁধন রাখতে হবে, সৌখ্য আনতে হবে। আর সে জন্য মানুষকে বোঝা ও মানুষের চরিত্রকেও নিখুঁতভাবে জানা অতি প্রয়োজন। আমাদের বুঝে নিতে হবে অপরের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—সেই ব্যক্তিত্বই মানুষের হৃদয়ের আসল ভাষা। আমাদের সৃষ্টিপ্রকৃতির দিকে বেশি ক'রে নজর দিতে হবে, যাতে আমরা মনুষ্যত্বের মধ্যে সেই ভাব, সেই মানবতার যে প্রাণস্পর্শ তা থেকে না বঞ্চিত হই, যে প্রাণ যে সহানুভূতি যে ভাবসম্বেগ মানুষের ইতিহাসের আদি থেকে আজও চলে আসছে, আর যা মানুষের চিরন্তন সম্পদ।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৩৪২ পৃঃ ২৬৪-২৭০

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও অনুশীলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. শিক্ষাসংস্কার। ৩. তপোবন। ৪. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৫. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৬. অসন্তোষের কারণ। ৭. আকাঙ্ক্ষা। ৮. প্রাক্তনী (৬নং)। ৯. বিশ্বভারতী ৪নং। ১০. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১১. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১২. কলাবিদ্যা। ১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৬নং। ১৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১৫নং। ১৫. শিক্ষার সার্থকতা। ১৬. শিক্ষার আদর্শ। ১৭. বিশ্বভারতী ১৫ নং। ১৮. বিশ্বভারতী ১৭ নং। ১৯. বিশ্বভারতী ১৮নং। ২০. ধর্মশিক্ষা। ২১. বিশ্বভারতী ১নং। ২২. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ২৩. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ২৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। ২৫. শিক্ষার বাহন ইত্যাদি।

৮০। ধারাবাহী

[(১) আশ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধি মণ্ডলীর নিকট কথিত এবং (২) ৮ পৌষ, ১৩৪১ বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে আচার্যের অভিভাষণ। প্রবাসী, ১৩৪১ ফাল্গুন, পৃঃ ৬০৯-১২]

(১) [আশ্রমিক-সঙ্ঘে]

…আমাদের এই বিদ্যালয় নানারকম যোগাযোগে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সর্বদাই এর মধ্যে একটা মূলতত্ত্ব কাজ করছে। আমি যদি বলি সে তত্ত্ব আমার, কঠিন ছাঁচে ঢালাই ক'রে তাকে রক্ষা করতে হবে—তা হবার নয়; আমি বলব না যে এমন একটা কাঠামো তৈরি করতে হবে যা চিরকাল থাকবে। এর ভিতরকার সে মূল কথাটি এই যে একটি বৃহত্তর জীবনের ভূমিকায় আমরা অনেকে একসঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছি—নানা বিচিত্রতা বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে একটি **প্রাণবান্** অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সে নিজেও জানে না কোন্ পথে যাবে, তার কোনো বাঁধা পথ নেই।…

…এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ বিদ্যালয় প্রাণবান্, এর মধ্যে অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু এর অন্তরে প্রাণ সঞ্চারিত।…

…যখন আমি থাকব না তখন এর মধ্যে প্রাণকে জাগিয়ে রাখতে পারে এমন একটা শক্তি থাকা দরকার—তোমরা যদি অগ্রসর হয়ে একে গড়ে নাও তবে সেই অভাব মোচন হতে পারে।

(২) [বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে]

…প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্য ছিল, সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনায় তার উপকরণ-বিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিঞ্চনতা অত্যন্ত বেশি ছিল।…ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল—অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন, পরস্পরের সুহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক' আছে—সেটি হচ্ছে জীবিকার আদর্শকে স্বীকার ক'রে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অনতিবৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়।… আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারাযন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড় ব'লে জানি, শ্রেষ্ঠ ব'লে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হ'তে থাকবে তাই হবে সহজ

সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য ক'রে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

অনেকদিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র ক'রে দেখতে পাচ্ছি ; দেখছি, আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সঙ্গত হ'ল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হ'ল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়—আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে; অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না—তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে একথা আমি আশা করি—সে-কথা এই যে এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে।...

...আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যারা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন—অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড় যা সত্য। আমার বিশ্বাস সেই দৃষ্টিবান অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হ'ত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হ'তেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিষ্ক্রিয় মমতা দ্বারা নয় এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বর্তী হয়ে যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের কঠিনতা বড় হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু পেয়েছেন কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে।...

টীকা :

শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, আশ্রমের ভবিষ্যৎ

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. জগদীশচন্দ্র বসুকে পত্র। ২. শিক্ষাসমস্যা। ৩. ধর্মশিক্ষা। ৪. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ৫. শিক্ষার আদর্শ। ৬. আশ্রমের শিক্ষা। ৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৮. জাতীয় বিদ্যালয়। ৯. প্রাক্তনী (৫নং)। ১০. বিশ্বভারতী ১০নং। ১১. The School Master. ১২. A Poet's School. ১৩. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং। ১৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১০নং ইত্যাদি।

৮১ : রথীন্দ্রনাথকে পত্র ২নং

[৪ জন, ১৯৩৫]

...শুনলুম, ধীরেন ইচ্ছা প্রকাশ করেছে শান্তিনিকেতনে লন্ডন মাট্রিক তরানোর একটা খেয়া ঘাট বসাবে। শুনে একটুও ভাল লাগছে না—শান্তিনিকেতনের আদর্শ যে ক্রমশই বিগড়ে চলেছে এ তারি একটা নিদর্শন—ষোলো আনা ইঙ্গবঙ্গ Snobbish ভাবে যে স্বর্গলোক কামনা করে আমাদের মধ্যে সেই নেশা যদি প্রবেশ করে তাহলে কোথায় গিয়ে উত্তীর্ণ হব। কলেজ ব্যাপারটা ক্রমশই শান্তিনিকেতনের মধ্যে বিজাতীয়তার পথ প্রশস্ত করতে বসেছে। ব্যারিস্টার মহলের ছেলেদের সাহেবি দীক্ষা দেবার ভার আমাদের নিতে হবে না কি? যে শিক্ষার শেষ লক্ষ্য বিলাতের দিকে শান্তিনিকেতনে তারি বড় রাস্তা বানাতে হবে? ভবিষ্যতের হাওয়া যদি এই দুরাশার দিকেই বয় আমি কোনো কথা বলব না কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলেই মনে জানব।......

চিঠি পত্র ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৪৯, পৃঃ ১১০-১১

টীকা :

ধীরেন

ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন। শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবন ও পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। পরে পঃ বঃ সরকারের শিক্ষাসচিব। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য।

চিঠিপত্র-গ্রন্থে (২নং) এই নামের স্থানে ফুটকি দেওয়া আছে। নামটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল চিঠি থেকে নেওয়া হল। জন্ম—১৯০১।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিলাতী-শিক্ষার প্রস্তাব প্রসঙ্গ।

৮২। শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি

[To The Students ভাষণের বাংলা রূপ (Visva-Bhararti News, April 1935), ১১।৩।১৯৪৭ এ পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত।]

আশ্রমে জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য ও সম্পূর্ণতা সাধন করিয়া তাহাকেই ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্র করিয়া তুলিতে হইবে। তাহারা যাহা কিছু শিখিবে, এইখানেই যথাসম্ভব তাহার প্রকাশ ও প্রয়োগের সুযোগ করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্যক্ নৈপুণ্য-সাধন ; দৃষ্টি ও মননশক্তির সম্যক্ অনুশীলন ; তরুলতা পশুপক্ষী ও বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র ব্যাপার-সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও অনুরাগের চর্চা ; প্রতিদিনের ব্যবহার্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ; বাসস্থান সুন্দর সুশৃংখল ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখার অভ্যাস ; বেশভূষা, স্নান, আহার ব্যায়াম ও বিশ্রাম প্রভৃতি শরীর সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যবস্থা যাহাতে পরিষ্কার, পরিপাটি, সুসংযত, সুশোভন ও শক্তিসাধক হয় সেইরূপ নিয়মের সতর্ক অনুসরণ করা ; ছাত্রদের পরস্পরের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, অতিথিদের প্রতি ও কর্মচারী ও ভৃত্যদের প্রতি ব্যবহারে বিনয় রক্ষা ; যাহাতে সামাজিকতাবৃত্তির বিকাশ হয় সেইরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন ; আপদ্ধর্মে অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশীদের সর্বপ্রকার আনুকুল্যে তৎপরতা ; স্বদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও তৎপ্রতি কর্তব্য-সম্বন্ধে বোধের উদ্রেক ; পরজাতির প্রতি প্রীতিবৃত্তি ও তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে ন্যায়পরতার বিকাশ-সাধন ; সভ্যসমাজে লোকহিতের জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ও যে-সকল নূতন প্রচেষ্টার প্রবর্তন ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ; এইগুলি আমাদের আশ্রমে শিক্ষার অঙ্গ। সংক্ষেপত, মনে, হৃদয়ে ও ব্যবহারে যাহাতে ছাত্রেরা মনুষ্যত্বের সকল বিভাগেই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে, ইহাই এখানকার শিক্ষার উদ্দেশ্য।

১। সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধনে প্রথম হইতেই ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। আত্মনির্ভরক্ষম হইবার চর্চায় ইহাই প্রথম পর্ব। দ্রব্যের পরিজ্ঞান ও পরিমাণ সম্বন্ধে যাথাতথ্য সংসার যাত্রায় সকলের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি অশিক্ষিত তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। শিক্ষাতালিকার মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ-চর্চার বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করা চাই।

এই সঙ্গে নানাপ্রকার কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, শস্য, তন্তু ও খনিজ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পার্থক্যের পরিচয় সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

রক্ত, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বর্ণবৈচিত্র ও সা রে গা মা প্রভৃতি স্বর-বৈচিত্র্যবোধে যাহাতে তাহাদের নৈপুণ্য জন্মে শিশুকাল হইতে তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, এই শিক্ষাগুলি ঐচ্ছিক নহে, ইহারা আবশ্যিক।

২। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে গ্রামগুলিতে যাহাতে ছাত্রেরা পর্যবেক্ষণ শক্তির নিত্যব্যবহার ও ফল লিপিবদ্ধ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে গাছপালা পশুপাখী সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করা চাই।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলির জীবনযাত্রার পরিচয় সম্পূর্ণ হওয়া চাই। কৃষি, তাঁতের কাজ, কামারের, কুমারের, তেলির কাজ প্রভৃতি গ্রামের সকল প্রকার জীবিকা-সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র অজ্ঞতা যেন না থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে গ্রামে যে-সকল পাল-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা জানা চাই।

হিন্দুগ্রাম, মুসলমানগ্রাম, সাঁওতালগ্রাম—এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে সকল গ্রামে বাস করে, তাহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার পার্থক্য জানিতে হইবে।

ধর্মানুষ্ঠান, ভূতপ্রেতের বিশ্বাস, চিকিৎসা, জন্মমৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও লিখন আবশ্যক।

গ্রামের যে সকল দুঃখ দুরবস্থা আছে প্রত্যক্ষ সন্ধানের দ্বারা তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদিগকে ভ্রমণে লইয়া যাওয়া চাই। সেই উপলক্ষ্যে তাহারা কর্মক্ষম ও ক্লেশসহিষ্ণু হইতে পারিবে ও দূর গ্রামের লোকযাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিবে, এবং মুাজিয়মে রক্ষাযোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিবে।

অর্থাভাব বশত আমাদের বিদ্যালয়ে ফিজিক্স কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও পরীক্ষার যথোচিত সুযোগ সাধন করিতে পারি নাই। কিন্তু এখানে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও আবহবিদ্যার (meteorology) অনুশীলন সহজেই হইতে পারে। এই সঙ্গে আমাদের ডাক্তারের সাহায্যে শারীরবিদ্যা ও যন্ত্রাধ্যক্ষের সাহায্যে যন্ত্রবিদ্যার চর্চাও হইবে।

এখানে সর্বদাই ঘরতৈরী ও ঘর মেরামত চলিতেছে। এই কাজে যথোচিত পরিমাণে যোগ দিবার জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করা আবশ্যক।

ছুতারের কাজ, তাঁতের কাজ ও বাগানের কাজের ব্যবস্থা এখানে আছে, এই সকল কাজে ছাত্রেরা যাহাতে নিয়মিত শিক্ষা পায় তাহা দেখা চাই।

সাবান, কালি, কাগজ প্রভৃতি ব্যবহার্য বস্তু প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সপ্তাহে সপ্তাহে এ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞ রাসায়নিককে কলিকাতা হইতে আনাইয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না।

৩। প্রত্যেক ছাত্রাবাসের পরিধি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার চারিদিকের কিছু পরিমাণ জমি তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই জমি ও ঘরের শোভা, নির্মলতা ও পারিপাট্যসাধনের জন্য ছাত্রাবাসিকদের দায়িত্ব থাকিবে। সেই ভূমির অন্তর্গত্ত গাছপালার প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাহাদের কর্তব্য।

কেবল ঘর পরিষ্কার নয়, নিজেদের বেশভূষা, শয্যা, আসন ও দেহ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। না রাখা যে লজ্জার বিষয়, তাহা ভদ্রোচিত নহে, ছাত্রদের ইহা

বিশেষভাবে জানা চাই। ছাত্রাবাসের আসবাবের বিশৃংখলতা বা তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার না ঘটে সে সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বই, কাপড় প্রভৃতি ছেলেদের নিজের যাহা কিছু আছে, তাহার স্বতন্ত্র তালিকা রাখিতে হইবে। তাহার অপচয় বা লোকসান ঘটিলে তখনি কর্তৃপক্ষের জানা আবশ্যক।

পরস্পর দ্রব্য ব্যবহার-সম্বন্ধে ছাত্রদের সৌজন্য রক্ষা করা চাই। পরস্পরের বিনানুমতিতে যথেচ্ছাচার যে অভদ্রতা তাহা মনে রাখিতে হইবে।

প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া পরস্পরকে নমস্কার ও গৃহস্থিত শিক্ষককে প্রণাম করিতে হইবে।

ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত কাপ্তেনকে ছাত্ররা যদি সর্বতোভাবে মান্য না করে তবে তাহাতে তাহাদের নিজেরই অপমান একথা তাহাদের বোঝা চাই। ছাত্রবিচারকের বিচার উপেক্ষা করিবার অধিকার কোনো ছাত্রের নাই।

ঘরে গুরুজন উপস্থিত হইলে ছাত্ররা আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। অতিথি কেহ প্রবেশ করিলে তাঁহাকে তাহার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিয়া যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিবে।

দুর্বিনীতভাবে আশ্রমের ভৃত্যদের অবমাননা কোনোমতেই ক্ষমা করা হইবে না।

বিশেষ কোনো একদিন ছাত্ররা পরিবেষণ করিয়া ভৃত্যদিগকে খাওয়াইবে এরূপ ব্যবস্থা রাখা চাই। আশ্রমের আমোদ-উৎসবে ভৃত্যদিগকে আমন্ত্রণ করা কর্তব্য।

মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রাবাসিকেরা আপন আপন ছাত্রাবাসে অন্যান্য ছাত্রাবাসিকদের নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ করিয়া ঘর সাজানো ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য হইবে।

নিজেদের পরিচালনার জন্য ছাত্ররা বিধিব্যবস্থা নিজেরা প্রণয়ন করিবে ও তাহা পালন করিবার মত দায়িত্ববোধ তাহাদের মধ্যে জাগরিত করা চাই। প্রত্যেক ঘরে তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে নেতা নির্বাচিত করিবে। সেই ঘরের সকল ছাত্রদের নিয়ম রক্ষা ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাহারই বিশেষ দায়িত্ব।

প্রত্যেক অধ্যাপকের কর্তব্য, অধ্যাপনা ছাড়াও আশ্রমের সর্ববিধ অনুষ্ঠান ও সামাজিকতা সম্বন্ধে যোগরক্ষা করা। তাঁহাদের ঔৎসুক্যের অভাব ঘটিলে ছাত্রদের মনে ঔৎসুক্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।

ছাত্রদিগকে লইয়া ব্রতীবালক ও ব্রতীবালিকার দল গঠন করিয়া তাহার কৃত্য অভ্যাস করানো আবশ্যক।

এই ব্রতীবালকেরা মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়া ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ প্রভৃতি কর্তব্যে যোগ দিবে।

নিজেদের প্রতিবেশকে সর্বতোভাবে সমর্থ ও আত্মশাসনক্ষম করিয়া তোলাই যে সমস্ত দেশের স্বরাজের ভিত্তিস্থাপন, ছাত্রদিগকে হাতেকলমে তাহাই বুঝাইতে হইবে।

সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে স্বদেশের উন্নতির যে সকল বাধা আছে তাহার অনুশীলন আবশ্যক।

অন্যদেশে বর্তমান ইতিহাসের গতি কিরূপ ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানের কিরূপ পরীক্ষা চলিতেছে, ছাত্রদিগকে যথাসম্ভব সে সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

অন্যদেশের আচার ব্যবহার ও লোকযাত্রা সম্বন্ধে ছাত্রদের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষবুদ্ধি যাহাতে দূর হয় সে সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া চাই।

সাধারণভাবে আশ্রমের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা উপরে লিখিলাম।

অধ্যাপকদের মধ্য হইতে কোনো একজনের প্রতি বিশেষ ভার থাকিবে, তিনি দেখিবেন সমস্ত নিয়ম পালিত হইতেছে, শিক্ষাব্যবস্থাতেও ত্রুটি ঘটিতেছে না এবং আশ্রমের উৎসব ও পার্বণগুলি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। বৎসরের প্রত্যেক পর্বে তাঁহার বিস্তারিত প্রতিবেদন সর্বাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করিবেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

বিজ্ঞানচর্চা, শিক্ষা ও অনুশীলন, শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শ, শিক্ষা ও গঠনমূলক আদর্শ, শিক্ষা ও চারুশিল্প

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. প্রসঙ্গ কথা ২। ২. শিক্ষার মিলন। ৩. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি। ৪ ছাত্রসম্ভাষণ। ৫. ধর্মশিক্ষা। ৬. বিশ্বভারতী ১নং। ৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ৮. শিক্ষার আদর্শ। ৯. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১০. শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ১১. বিশ্বভারতী ১৮নং। ১২. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ১৩ জাতীয় বিদ্যালয়। ১৪. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ১নং। ১৫ বিশ্বভারতী ১১ নং। ১৬. বিশ্বভারতী ১৫ নং। ১৭. বাঁকুড়ায় ছাত্রদের উদ্দেশে। ১৮. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ৩নং। ১৯. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ১নং। ২০. আশ্রমের শিক্ষা। ২১. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র ১নং। ২২. কলাবিদ্যা। ২৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান ইত্যাদি।

৮৩। শিক্ষা ও সংস্কৃতি

[ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে লিখিত পত্র, ১৫ই জুলাই ১৯৩৫। বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৪২]

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে···আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো-একটি আমেরিকান কাগজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম ; পড়ে খুশি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমত ব্যক্ত হয়েছে।···

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না ; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায়, এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিক্‌ল্‌ চড়ে। ভাবে নি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্‌ল্‌ পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল, বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনা মূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিক্‌লের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনী-শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল ক'রে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী ক রে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরিবিয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্‌ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন ক'রে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা 'আমি সব পারি'। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, 'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্তৃক প্রবঞ্চিত।

'আমরা সব-কিছু পারব' এই কথা সত্য ক'রে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক ; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চির-পঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী ক'রে ? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয় ; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে ?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয় ; সংস্কৃতিবান্ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষমা করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ ক'রেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে।

সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই।…

একদিন দেখেছিলেম শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল ; আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না ; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অংগ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম ; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি, তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয় ; অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ২২৪-২৮

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও অনুশীলন, শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাস, শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের আদর্শ

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১. ধর্মশিক্ষা।
২. বিশ্বভারতী ১নং।
৩. পূর্ববংগে বক্তৃতা।
৪. শিক্ষার আদর্শ।
৫. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ।
৬ শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি।
৭. বিশ্বভারতী ১৮নং।
৮. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

৮৪। অবিভক্ত বাংলাদেশের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব মুহম্মদ আজিজুল হককে নূতন শিক্ষাবিধি প্রণয়ন সম্পর্কে লিখিত পত্র (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)

[বিশ্বভারতী বুলেটিন ২০ নং, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬, অংশবিশেষ 'শিক্ষার স্বাংগীকরণে'র 'পুনশ্চ' রূপে প্রকাশিত]

…আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষা-বিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানাকারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক সহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে ব'সে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিত ভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে ক'রে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দারিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তা ছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রার কর্ণধার।

টীকা ঃ

মুহম্মদ আজিজুল হক

অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন (১৯৩৪—৩৭)। ১৯৩৮-৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। **'Man Behind The Plough'** এবং **'History And Problems of Muslim Education in Bengal'** ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। জন্ম—১৮৯২, মৃত্যু—১৯৪৭।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষার বিস্তার, লোকশিক্ষা, শিক্ষা ও জীবিকা

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১. শিক্ষার হেরফের।
২. শিক্ষার বাহন।
৩. শিক্ষার বিকিরণ।
৪. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৫. শিক্ষার আদর্শ।
৬. কলাবিদ্যা ইত্যাদি।

৮৫। ছাত্রদের প্রতি

[বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভায় সভাপতির অভিভাষণ. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২ (১৯৩৫), পৃঃ ১৬৯-৭০]

...তোমরা যে-সব লেখা পড়লে, সেগুলো নানা বিচিত্র ধরণের রচনা। তার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করলেম—তোমরা গল্প, কবিতা এবং বর্ণনাচ্ছলে যা-কিছু লিখেছ তার প্রায় সবগুলোই রসসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

তোমাদের রচনাতে একটা জিনিসের অভাব—সে চিন্তার উপাদানের। আজ পৃথিবীতে নানা সমস্যা দুর্বার হয়ে উঠেছে, চারিদিকে প্রলয় তাণ্ডবের গর্জন—এ অবস্থায় মন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। মানুষের ভাগ্য যখন ঘটনাসংঘাতে প্রবল-ভাবে নাড়া খেয়ে ওঠে তখন ভাবী পরিণামচিন্তায় মন স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণত এ সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব দেখতে পাই। মনে হয় তার একটা কারণ আমরা অদৃষ্টবাদী—সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব দৈবের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অভ্যাস। চারিদিকে দৃষ্টিকে সজাগ রেখে কান পেতে থাকার উদ্যম আমাদের ক্ষীণ। কিন্তু মানব-ইতিহাসের ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে উদাসীনভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখা আর শোভা পায় না।...

জীবনের সার্থকতার জন্যে আমি রসের প্রয়োজনকে খুবই মানি কিন্তু রসের প্লাবনকে মানি নে। তার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন সত্যকে মানতে হবে চিন্তাশক্তির সহযোগে। তোমাদের রচনায় এবং কাজে আমি এই দেখতে চাই যে, নির্মল আনন্দের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা বিশ্বের অন্তরঙ্গ মন নিয়ে সৌন্দর্য সম্ভোগ করো তেমনি মানবসমাজের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি ঔৎসুক্য নিয়ে তোমরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করো, অন্বেষণ করো, বিচার করো এবং আপন জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করো।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষায় চিন্তাশক্তি ও বিচারের স্থান, শিক্ষায় ঔৎসুক্য ও অন্বেষণের স্থান

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষার বিকিরণ।
২. আশ্রমের শিক্ষা ইত্যাদি।

৮৬। বিশ্বভারতী ১৭নং

…এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ ; শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়—সে দিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করিনি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনায় এই রূপ দেখতে পেতাম। যখন জানলুম, এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল ; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি…। তার পরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে ; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।…

ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর-একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ।…

বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃঃ ১৪১-৪৬

টীকা ঃ

বিশ্বভারতী ১৭নং

১৩৪২ সালে ৮পৌষ (১৯৩৫) বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন, উক্ত রচনাটি তারই প্রবন্ধরূপ। এই বক্তৃতারই অন্য একটি অনুলিপি 'বিশ্বভারতী বিদ্যায়তন' নামে বিশ্বভারতী পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩৪৯) প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, সর্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব

(জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪. আকাঙ্ক্ষা। ১৫. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৬. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৭. আলোচনা। ১৮. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৯. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ২০. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮নং। ২১. শিক্ষার বিকিরণ। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. A Poet's School. ২৪. The School Master. ২৫। তোতা-কাহিনী। ২৬. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৭. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ২৮ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ২৯. বিদ্যাসমবায়। ৩০. শিক্ষার মিলন। ৩১. বিশ্বভারতী ৪নং। ৩২. বিশ্বভারতী ৫নং। ৩৩. বিশ্বভারতী ১০নং। ৩৪. বিশ্বভারতী ১৫নং। ৩৫। My Educational Mission. ৩৬। তপোবন। ৩৭. জগদানন্দ রায়কে পত্র ১নং। ৩৮. বিশ্বভারতী ১৪নং। ৩৯. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

৮৭। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান

[প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃঃ ৭১২-১৩]

দেশের সংস্কৃতিতে সংগীতের প্রাধান্য ছিল, আমাদের বিদায়োন্মুখ পূর্বযুগের দিকে তাকিয়ে সেই কথাটি জানিয়েছি। তার পরে বয়স যতই বাড়তে লাগল ততই অন্য এক যুগের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলুম যে-যুগে ছেলেরা প্রথম বয়স থেকে কলেজের উচ্চ ডিগ্রীর দিকে মাথা উঁচু ক'রে নোট মুখস্থ করতে লেগেছে। তখন গানটাকে সম্মানীয় বিদ্যা বলে গণ্য করবার ধারণা লুপ্ত হয়ে এল ; যে-সব বড়ো ঘরে গাইয়েরা আদর ও আশ্রয় পেয়ে এসেছে সেখানে সংগীতের ভাঙা-বাসায় পড়ামুখস্থর গুঞ্জনধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠল, তখনকার যুবকদের এমন একটি শুচিবায়ুতে পেয়ে বসল যাতে দুর্গতিগ্রস্ত গানব্যবসায়ীর চরিত্রের সঙ্গে জড়িত করে' গান বিদ্যাটিরই পবিত্ররূপকে বীভৎস ব'লে কল্পনা করতে লাগল। বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগে সংগীতকে স্বীকার করতে পারে নি। তাই সংগীতে রুচি, অধিকার ও অভিজ্ঞতা না থাকাটাকে অশিক্ষার পরিচয় ব'লে কোনো লজ্জা বোধ করার কারণ তখনকার শিক্ষিতমণ্ডলীর মনে রইল না। বরঞ্চ সে দিন যে-সব ছেলে হিতৈষীদের ভয়ে চাপা গলায় গান গেয়েছে তাদের চরিত্রে হয়েছে সন্দেহ।...

দৈবক্রমে যে সুযোগ আমি পেয়েছিলুম সে কথা মনে পড়ছে।...আমাদের

পরিবারে পরীক্ষাপাসের সাধনা সেদিন গৌরব পায় নি।… ডিগ্রিলাঞ্ছিত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার আর কোনো পরিচয় গ্রাহ্য নয়, এই অন্ধ সংস্কারটা আমাদের ঘরে থাকতেই পারে নি। আমার ভাইরা দিনরাত নিজের ভাষায় তত্ত্বালোচনা করেছেন, কাব্যরস আস্বাদনে ও উদ্ভাবনে তাঁরা ছিলেন নিবিষ্ট, চিত্রকলাও ইতস্তত অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তার উপরে নাট্যাভিনয়ে কারো কোনো সঙ্কোচমাত্র ছিল না। আর সমস্ত ছাড়িয়ে উঠেছিল সঙ্গীত।…

আমাদের দেশের শিক্ষা-বিভাগ কলাবিদ্যার সম্মানকে শিক্ষিত মনে স্বাভাবিক ক'রে দেবেন এই নিবেদন উপস্থিত করবার অভিপ্রায়ে এই ভূমিকামাত্র আজ প্রস্তুত ক'রে এনেছি। আর যা-কিছু আমার করবার আছে সে নানা অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমার বিদ্যালয়ে আমি প্রবর্তিত করেছি।…

টীকা :

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবিভক্ত বাংলার তখনকার শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক এবং অন্য অনেকের উদ্যোগে কলকাতায় শিক্ষাসপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। এই সঙ্গেই নবশিক্ষাসংঘের (New Education Fellowship) ভারতীয় শাখার সম্মেলনও আহূত হয়। নবশিক্ষাসংঘ শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাপ্রচার বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ তার ভারতীয় শাখার সভাপতি ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিউই এবং ভারতে রবীন্দ্রনাথ এই দুজনকেই নবশিক্ষাবিধি প্রবর্তনের আন্দোলনের গুরুস্থানীয় বলে ধরা যায়।

নবশিক্ষাসংঘের কলকাতার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তিনটি ভাষণ দেন। একটি 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' (৮।২।৩৬); একটি ইংরেজি ভাষণ 'The Ideal of Visva-Bharati' এবং শেষ ভাষণটি হল বিখ্যাত 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য :

শিক্ষা ও স্বাধীনতা, শিক্ষা ও চারুশিল্প

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. ছাত্রদের প্রতি **সম্ভাষণ**।
২ জাতীয় বিদ্যালয়।
৩. প্রাক্তনী (৫নং)।
৪. বিশ্বভারতী (১০নং)।
৫. ধারাবাহী।
৬ The School Master.
৭. A Poet's School.
৮. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং।
৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১০নং।
১০. কলাবিদ্যা।
১১. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি ইত্যাদি।

৮৮। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

[নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের ভাষণ-রূপে পঠিত (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬), বিশ্বভারতী বুলেটিন, মাঘ ১৩৪২]

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা। এই অকিঞ্চিৎকরতার মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে—তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করেছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে; আইন আদালত, সকল প্রকার সরকারি কার্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহুকোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ, দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধান-বশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি 'এহ বাহ্য'। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ল্যাবরেটরীতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছায়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ, শিক্ষায় পরধর্ম।...

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তার চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মাল-মসলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের; ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুত; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল, সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবে নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে যেখানে এক-তলার লোকের নিত্যবাস এক-তলাতেই আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে ঊর্ধ্বপথযাত্রায় এক-তলার প্রয়োজন ছিল; এই ছিল তার উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে ওঠে নি। নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে: তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে নি; দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।

আমার পূর্বকার লেখায় এ দেশের সিঁড়িহারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিলুম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো-যে উদ্‌বেগ ঘটেছে তার

প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ, অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত; তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর-নীচে সম্বন্ধস্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি। সেইজন্যেই ইতিপূর্বে আমার আলোচ্য বিষয়টা হয়তো সেলাম পেয়ে থাকবে, কিন্তু আসন পায় নি। তবু আর-একবার চেষ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না করে তা বলা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে। ইন্‌ক্যুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় ব'লেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত; কিন্তু মুর্গির জীবনধর্মানুগত ডিম-পাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জোর আছে সে সমাজ টিঁকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে, অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-প'রে পরিপুষ্ট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম-মহাদেশে আজ সর্বব্যাপী অর্থসংকটের সঙ্গে সঙ্গে অন্নসংকট প্রবল হয়েছে। এই অভাব-নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্মেন্ট যেরকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন সেরকম উদ্‌বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সংকোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দু বেলা দুমুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো-আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশি দেরি করে না। এর থেকে যে নির্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত হতে পারে না। নিরুৎসাহ অবসাদ অকর্মণ্যতা রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত তা হলে দেখতে পেতুম এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু; সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানা দিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্ধেকের

চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ; সেই বিচ্ছেদ আলোক-অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্যের অভিমুখে, অন্য পিঠ সূর্যবিমুখ। তেমনি করে যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল। একই নদীর একই পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে ; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্তিতাই এদের দূরত্বকে আরও প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

শিক্ষার ঐক্য-যোগে চিত্তের ঐক্য-রক্ষাকে সভ্য সমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য ব'লে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এশিয়ায় নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে, এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে ; তার প্রথম ভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

শিক্ষার ঐক্য-সাধন ন্যাশনল ঐক্য-সাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট ক'রে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার।...

আমার কথার জবাবে এমন তর্ক হয়তো উঠবে, আমাদের দেশে সমাজ পূর্বেও তো সজীব ছিল, আজও একেবারে মরে নি—তখনও কি আমাদের দেশ শিক্ষায় অশিক্ষায় যেন জলে স্থলে বিভক্ত ছিল না? তখনকার টোলে চতুষ্পাঠীতে তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রের যে প্যাঁচ-কষাকষি চলত সে তো ছিল পণ্ডিত পালোয়ানদের ওস্তাদি-আখড়াতেই বদ্ধ ; তার বাইরে যে বৃহৎ দেশটা ছিল সেও কি সর্বত্র ঐরকম পালোয়ানি কায়দায় তাল ঠুকে পাঁয়তারা করে বেড়াত? যা ছিল বিদ্যানামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া সেই দিগ্‌গজ পাণ্ডিতি তো তার শুঁড় আস্ফালন করে নি দেশের ঘরে ঘরে। কথাটা মেনে নিলুম। বিদ্যার যে আড়ম্বর, নিরবচ্ছিন্ন পাণ্ডিত্য, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী। পাশ্চাত্য দেশেও স্থূলপদবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেডাণ্ট্রি। আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হত সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্টমেনটের কারখানা-ঘর বানাতে হয় নি ; দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা-উপশিরা-যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনি ক'রেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজদেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক

প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে—নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা-বা স্থূল, কোনোটা বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক কলেবর-ভুক্ত নাড়ী এবং রক্তও একই প্রাণ-ভরা রক্ত।

অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ডালে যে ফল সে ফলায় নীচের মাটিতে তার আয়োজন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হ'য়ে ওঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজাতীয় মরু। যেখানে মাটিতে সেই উদ্ভিদসার পরিব্যাপ্ত নয় সেখানে গাছপালা বিরল হয়ে জন্মায়, উপবাসে বেঁকে-চুরে শীর্ণ হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বনভূমিতে একদিন উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নীচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হত। আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য ; ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকা সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পরবিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের মস্ত মস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ; সেই ভোজে অর্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয়, উদ্‌বৃত্ত-উপভোগে।

কিন্তু সায়েন্সে-গড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি ; জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, তাই পাশ্চাত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপন-করা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রি-ধারী পণ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্‌সের জমিনটা তল্‌তলে ; তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়ান্‌সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়েন্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উলটো দিকে—নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই।...

...প্রাচ্য দেশে মূল্য বিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করি নে। বিদ্যা জিনিসটি অমৃত, ইঁটকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্য রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হলেও চলে। অন্তত এতকাল সেইরকম আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুত, আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত ক'রে চোখে পড়ে না। এ দেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারত, না আছে অতিজটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাপ্রণালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা।

বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে – কেননা, সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্য দেশের কারিগররা যেরকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি ক'রে থাকে পাশ্চাত্য বুদ্ধি তা কল্পনা করতে পারে না। যে নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিস তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থূল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিসটি চাপা পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চাত্যের চেয়েও কম বুঝি। গরিব যখন ধনীকে মনে মনে ঈর্ষা করে তখন এইরকমই বুদ্ধিবিকার ঘটে। কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি তখন ইঁট-কাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ও অন্যকে ভুলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিসের কার্পণ্যে এইটেরই দরকার হয় বেশি। আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতই যায় বাহুল্যের দিকে। প্রত্যহই দেখতে পাই, পূর্বদেশে জীবনসমস্যার আমরা যে সহজ সমাধান করেছিলুম তার থেকে কেবলই আমরা স্খলিত হচ্ছি। তার ফলে হল এই যে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল পূর্ববৎ, এমন-কি, তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রী নীচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেষ আড়াআড়ি নেই।

মনে করে দেখো-না—এ দেশে বহুরোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্য-বিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতিবিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে-সব অভাবে দেশ অন্তরে-বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্ছে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসন-ব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমন-কি, বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা-পরিবেশনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া ক'রে তোলবার খাতিরে ফল ফলাবার রস-জোগানে টানাটানি চলেছে। তা হোক, এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব।

…বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে হুন্‌ডি-কাটা ধারের টাকাটাকে মূলধনহারা ব্যবসায়ে মুনফা ব'লে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানবসমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষীমহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ-প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার-মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল, দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অত্যন্ত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে।...

...বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলাভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যাসমাধান দুরূহ ব'লে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবী কালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা না ক'রে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন ক'রে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে; বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয়, একটা ঘরে বছর-দুয়েক ধ'রে ছেলেটার কেবল পা'খানা তয়ের হচ্ছে, আর-একটা ঘরে এগিয়েছে হাতের কনুইটা পর্যন্ত। এতদূর অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই, সে মূর্তি কারখানাঘরে-তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালকবিদ্যালয় হয়ে। তার বালক-মূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।

বিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন, এক দল ছাত্র স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষায় অনধিকার সত্ত্বেও যদি তারা কোনোমতে ম্যাট্রিকের দেউড়িটা পেরিয়ে বায় উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলায় বসে পড়ে, আর ঠেলে তোলা যায় না।

এই দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কসরত। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব ক'জন ছেলের কাছে আশা করা যায়?

শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে **আন্দামানে** চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলন্ডে একদিন চুরির দণ্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না ব'লেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখস্থ ক'রে পাস করা কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।…

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্বত নড়েন না, কাজেই সচল মানুষকেই প্রয়োজনের গরজে পর্বতের দিকে নড়তে হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁত হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্তাদের কাছে আমাদের সমাদর।…

বাবু-ইংলিশ নামে নিরতিশয় অবজ্ঞা-সূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে; কিন্তু ইংরেজি-বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হলেও ওটাকে অনিবার্য ব'লে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারিনে। আমাদের কারও ইংরেজিতে ত্রুটি হলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা যায়। তা হোক, অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চলতেই হবে ততদিন ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগা-গোড়াই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো ক'রে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো ক'রে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না।…

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয়, কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বয়ত্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজি য়ুনিভর্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটেছুঁটে কুর্তি বানাচ্ছি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে

কোদালে কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত ক'রে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা করছি ; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারি দিকে, না পৌঁচচ্ছে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারম্বার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনও যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভর্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জৃম্ভিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 'he is up তিনি হন উপরে', যারা ইংরেজি ! সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I, by myself !', তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সম্গতি ছিল 'নর্মাল স্কুল' নামধারী মাথা-হেঁট-করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা-বিদ্যালয়ে স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা-পণ্ডিতি ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।

এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয় নি, শেখার সংগে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা-ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হতে হয় নি। এমন-কি, সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে মেঘনাদবধ পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমাদের বাঁ গালে একটা বড়ো চড় খেয়েছিলুম, এইটেই একমাত্র অবিস্মরণীয় অপঘাত ; যতদূর মনে পড়ে মহাকাব্যের শেষ সর্গ পর্যন্তই আমার কানের উপরেও শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ঘটে নি, অথবা সেটা অত্যন্তই বিরল ছিল।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরও আছে। মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অংগ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি ; তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায়

অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাৎলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারি নে ব'লে, তুলনা করতে পারি নে।

যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, তাই কচি বয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক ক'রে তুলতে হয় নি; চলা এবং রাস্তা খোঁড়া ছিল না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই ক'রে ক'রে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানো অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরানী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাখে নি। আমার ইংরেজি-শিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা-কিছু ছেঁড়া-ফাটা, যা-কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।...

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ২২৯-৪৪

টীকা ঃ

শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

শিক্ষা সপ্তাহে, নবশিক্ষা সংঘের (নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের) বাংলা বিভাগের সভাপতির ভাষণ, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ (ইংরেজি নাম Education Naturalised), সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ Making Education Our Own নামে প্রকাশিত।

রামমোহন রায়

সমগ্র ভারতের আধুনিক চিন্তাধারার অগ্রদূত। ব্রাহ্মধর্মের-প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা গদ্যের অন্যতম পথিকৃৎ। জন্ম—১৭৭২, মৃত্যু—১৮৩৩।

গোখ্‌লে গোপালকৃষ্ণ

অধ্যাপক। একসময়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিক নেতা। জন্ম ১৮৬৬, মৃত্যু ১৯১৫।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

মাতৃভাষা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ন্যাশনল ফণ্ড।
২. শিক্ষার হেরফের।
৩. প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)।
৪. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।
৫. বাংলাশিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)।
৬. ইংরেজি শেখা।
৭. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৮. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।
৯. শিক্ষার বাহন।
১০. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ।
১১. ছাত্র সম্ভাষণ।
১২. বাংলা শিক্ষার প্রণালী ইত্যাদি।

৮৯। আশ্রমের শিক্ষা

[প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৩ (১৯৩৬)]

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ— নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে ; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান।' তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।

…মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ্য বলে জেনেছি।

আরও একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।…সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র ; প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠছে 'চুপ চুপ' ; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে ; চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।

আর একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বয়স্কদের শাসনে অভ্যাসের দ্বারা যে-পর্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছটফট করে। আরণ্য ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি 'বের্গ্‌সঁ' এর বচন ! এ মহান্ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা : তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মতো।

শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ-আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা; যজ্ঞবেদীরচনা আশ্রমবালক-বালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্য-বিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতি ক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।

মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী ও মলিন। স্বভাবের বর্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণপ্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন ক'রে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণ-লাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প-কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই-সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।

আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বচর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধা-জনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে ক'রে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে ক'রে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আব্দার বেড়ে ওঠে, এমন-কি, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে; তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ ক'রে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন এক দল বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘরময় নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললেম, 'তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ

আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পার না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই স্থির করে রেখেছ যে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের, আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্মসম্মান থাকে না।'

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো ; অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে ক'রে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত ক'রে তুলি। শরীরমনের শক্তির সম্যক্ চর্চা সেখানেই ভালো ক'রে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিষ্ট নমুনা-মত রূপ নেবার জন্যে কর্দমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই **উপলক্ষ্যে** আর-একটা কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক, আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো ক'রে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আল্গা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরোৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব-কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না। প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চার দিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক-লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে ; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে ; যাঁরা চক্ষুষ্মান্, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

সব-শেষে বলব যেটাকে সব-চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব-চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান্। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর

বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল পরজাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়—মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ২৪৫-৪৯

টীকা ঃ

বের্গসঁ—Henry Bergson

ফরাসী গতিবাদী দার্শনিক, ক্রিয়েটিভ এভল্যুশন তত্ত্বের প্রবক্তা। জন্ম—১৮৩৫ মৃত্যু ১৯১১।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষা ও গঠনমূলক আদর্শ

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. আকাঙ্ক্ষা। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা ' ১৮. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. A Poet's School. ২৩. The School Master. ২৪. তোতাকাহিনী। ২৫. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৬. জগদীশচন্দ্র বসুকে পত্র। ২৭. তপোবন। ২৮. জগদানন্দ রায়কে পত্র ২নং। ২৯. শিক্ষার আদর্শ। ৩০. ধারাবাহী। ৩১. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ৩নং। ৩২. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ১নং। ৩৩. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ৩৪. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র ১নং ইত্যাদি।

৯০। ছাত্রসম্ভাষণ

[১৯৩৭ ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, ৫ ফাল্গুন ১৩৪৩]

...দুর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এ দেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল, স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা, যে বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ-সুযোগ-প্রাপ্ত সংকীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলংকারপ্রসাধনের সামগ্রী ব'লেই আদরণীয় হয় নি; নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে, শ্রী দেবে ব'লেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এইজন্যই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার ক'রে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে, সেই শিক্ষার প্রসারসাধনচেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশমাত্র কৃপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা, ফসলের বড়োমাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি; জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেশনকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারামরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচ-বশত চিত্তশাসন এক হতে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

প্রাণীবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাত্রে তাদের বাধা ঘটে না, কিন্তু

নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই জাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয়, কিন্তু তার পূর্ণতা হওয়া অসাধ্য। আত্মশক্তিব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে সে কথা সে আপনি অনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, কেননা ঋণ করে তার দিন চলে যায়। গৌরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব ক'রে। মহাজন-মহলে সে দাসখত লিখিয়ে দিয়েছে। যারা এই শিক্ষায় পার হল তারা যা ভোগ করে তা উৎপন্ন করে না। পরের ভাষায় পরের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্রয় পেয়ে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী ব'লে গণ্য হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী ক'রে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া ?

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান্। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, এ'কে অঙ্গীকার ক'রে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীবযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, অপরিচিত ব'লে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারগম্য ; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহজাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণ্যেই দাতা ধন্য ও গ্রহণ করবার শক্তি দ্বারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই অর্থভাণ্ডারের দ্বারে কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডারে সর্বমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গলবিহীন। লক্ষ্মী কৃপণ ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যা-গণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ ; কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলাদেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করে নি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে, এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের

প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণের দুর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান ব'লে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালী লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পরভাষার মদগর্বে আত্মবিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নূতন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিত্যসৃষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক লাটিন আয়ত্ত ক'রে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরসভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজিভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু, এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে কাব্যে স্খলিতগতি প্রথমপদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসি বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল্‌টন-হোমার-প্রতিভার অতিথিসৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

এই যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথ-মুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার অকৃতার্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। কিন্তু যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল। যেমন দূর গিরিশিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত হয় জন-স্থানের মধ্য দিয়ে তখন দুইতীরবর্তী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান্‌ ক'রে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি-উদ্ভিন্ন ফলশস্যে, তেমনি নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান ক'রে তুলেছেন নিজেরই ভাষাপ্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে-পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরস-ভোগের ও সত্য-সন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্যে হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্প-শিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যেই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে

সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।...

বর্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত এ কথা মানতেই হবে। এই যুগ একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে। মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানগত বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম নব নব আকার নিচ্ছে এই ভূমিকার 'পরেই। বুদ্ধিপরিশীলনার বিশেষ গতি ও বিস্তৃতি সভ্য পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা ঐক্যলাভে প্রবৃত্ত হয়েছে। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই এবং চিন্তা করবার পদ্ধতি, সন্ধান করবার প্রণালী, সত্য যাচাই করবার আদর্শ, য়ুরোপীয় চিত্তের ভূমিকার উপরে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হচ্ছে। এটা সম্ভবপর হতই না, যদি এর উপযোগিতা সর্বত্র নিয়ত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত না হত, যদি-না এই চিত্ত জয়যুক্ত হত তার সর্বপ্রকার অধ্যবসায়ে। সংসারযাত্রার কৃতার্থতালাভের জন্য আজ পৃথিবীতে সকল নবজাগ্রত দেশই য়ুরোপের এই চিত্তস্রোতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত ক'রে দেবার চেষ্টায় অবিরাম প্রবৃত্ত। সর্বত্রই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রজাদের মনঃক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নববিদ্যা-সেচনের প্রণালী। এমন দেশও প্রত্যক্ষ দেখেছি নবযুগের প্রভাবে যে আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দীর উপেক্ষা-সঞ্চিত স্তূপাকার নিরক্ষরতার বাধা অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে; সেখানে যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত আকারে আত্ম-প্রকাশহীন অকৃতিত্বে লুপ্তপ্রায় সে আজ অবারিত শক্তি নিয়ে মানবসমাজের পুরোভাগে সসম্মানে অগ্রসর। এ দিকে যথোচিত অর্থ-অভাবে শ্রদ্ধা-অভাবে উৎসাহ-অভাবে দীনসম্বল আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনগুলি স্বল্পপরিমিত ছাত্রদেরকে স্বল্পমাত্র বিদ্যায় পরীক্ষা পার করবার স্বল্পায়তন খেয়ানৌকোর কাজ করে চলেছে। দেশের আত্মচেতনাহারা বিরাট মনকে স্পর্শ করছে তার প্রান্ততম সীমায়; সে স্পর্শও ক্ষীণ, যেহেতু তা প্রাণবান নয়, যেহেতু সে স্পর্শ আসছে বহিঃস্থিত আবরণের বাধার ভিতর দিয়ে। এই কারণে প্রাচ্যমহাদেশের যে-যে অংশে নবদিনের উদ্‌বোধন দেখা দিয়েছে, জ্ঞানজ্যোতির্বিকীর্ণ আত্মপরিচয়ের সম্মান-লাভে তাদের সকলের থেকে বহুদূর পশ্চাতে আছে ভারতবর্ষ।...

আমি জানি, য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি-আবিষ্কারে অদ্ভুত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যত্বের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য

উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, লুব্ধতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যেরকম প্রচণ্ড মূর্তি ধ'রে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মমভাবে দলন করতে উদ্যত হয়েছে ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয়নি। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষাকে এমন বৃহৎ আয়তনে, এমন প্রভূত পরিমাণে, এমন সর্ববাধাজয়ী নৈপুণ্যের সঙ্গে জয়যুক্ত করতে কোনো দিন মানুষ সক্ষম হয় নি। আজ তা হতে পেরেছে বিশ্বপরাভবকারী বিজ্ঞানের জোরে। উনিশ শতকের আরম্ভে ও মাঝামাঝি কালে যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন ভক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভূত; নিশ্চিত স্থির করেছিলুম যে, সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োবুদ্ধি এর চরিত্রগত লক্ষণ; ভেবেছিলুম মানুষকে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ব্রত এই সভ্যতা গ্রহণ করেছে। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই তার ন্যায়বুদ্ধি, তার মানবমৈত্রী এমনি ক্ষুণ্ণ হল, ক্ষীণ হল যে, বলদর্পিতের পেষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারসভায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের যে-সকল বিশ্ববিশ্রুত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন তারা পরস্পরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষসাধনে সমস্ত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপরিসীম ভীতি, এমন দৃঢ়বদ্ধমূল অবিশ্বাস অন্য কোনো যুগেই দেখা যায় নি।···

কিন্তু একদিন মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখেছি এই পাশ্চাত্যের সাহিত্যে ও ইতিহাসে। নিজেকে নিজেই সে আজ ব্যঙ্গ করলেও তার চিত্তের সেই উদার অভ্যুদয়কে মরীচিকা ব'লে অস্বীকার করতে পারি নে। তার উজ্জ্বল সত্তাই মিথ্যা এবং তার ম্লান বিকৃতিই সত্য, এ কথা বলব না।

···আজও এই সাংঘাতিক অধঃপতনের দিনে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ যাঁরা নিঃসন্দেহেই ন্যায়ের পক্ষে, দুর্বলের পক্ষে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়ে তাঁরা বলদৃপ্তের শাস্তিকে স্বীকার করছেন, দুঃখীর দুঃখকে আপন করে নিচ্ছেন। বারে বারে অকৃতার্থ হলেও তাঁরাই আশু পরাভবের মধ্য দিয়েও এই সভ্যতার প্রতিভূ। যে প্রেরণায় চারি দিকের কঠোর অত্যাচার ও চরিত্রবিকৃতির মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যকে অবিচলিত রেখেছে সে প্রেরণাই এই সভ্যতার মর্মগত সত্য, তার থেকেই পৃথিবী শিক্ষা গ্রহণ করবে, পাশ্চাত্য জাতির লজ্জাজনক অমানুষিক আত্মাবমাননা থেকে নয়।··

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাত্র সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণদশা তার বুকে খর নখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দুঃখদারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণজর্জর ক'রে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে—অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ ক'রে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হতেও হয় তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়; যেন নির্বোধের

মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।…

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে ; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে। . আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের।…

শিক্ষা. বিশ্বভারতী ১৯৭৩, পৃঃ ২৫০-৫৯

টীকা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র- বিখ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা. ঔপন্যাসিক, বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। জন্ম—১৮৩৮, মৃত্যু—১৮৯৪।

হোমার (Homer)—প্রাচীন গ্রীক কবি। জন্ম ও মৃত্যু—আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১২০০ থেকে ৮০ -এর মধ্যে নানারকম অনুমান করা হয়।

মধুসূদন দত্ত—কবি ও নাট্যকার। জন্ম—১৮২৪, মৃত্যু—১৮৭৩।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

মাতৃভাষা বিজ্ঞান চর্চা

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ন্যাশনল ফন্ড।
২ শিক্ষার হেরফের।
৩. প্রসঙ্গ কথা ১ (তিনখানি পত্র)।
৪. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।
৫. বাংলাশিক্ষার অবসান।
৬. ইংরেজি শেখা।
৭. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৮. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।
৯. শিক্ষার বাহন।
১০. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ।
১১. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ।
১২. বাংলা শিক্ষার প্রণালী।
১৩. প্রসঙ্গ কথা (২)।
১৪. শিক্ষার মিলন।
১৫. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি ইত্যাদি।

৯১। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি

[আশ্বিন ১৩৪৪ (১৯৩৭)]

আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। ...দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব, জ্ঞানের সেই পরিবেষণ-কার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ।...

টীকা:

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় যে শিক্ষাসপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়, রবীন্দ্রনাথ সেখানে লোকশিক্ষার কথা—সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কথা বলেন। তাঁর ভাষণের 'পুনশ্চ' অংশে বাংলাদেশে লোকশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সরকারকে অনুরোধও জানানো হয়। বলা বাহুল্য, সরকারী নীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই থেকে যায়। এর পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী ১৯৩৬ সালের মে মাসে বিশ্বভারতীর 'লোকশিক্ষা সংসদ' গঠিত হয়। সেই সঙ্গে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়। এই গ্রন্থমালার প্রথম বই রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়', দ্বিতীয় বই প্রমথ চৌধুরীর 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' এবং তৃতীয় বই প্রমথনাথ সেনগুপ্তের 'পৃথ্বীপরিচয়'। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থমালার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা করেন। সংকলিত রচনা তারই অংশবিশেষ।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য:

মাতৃভাষা, বিজ্ঞানচর্চা, শিক্ষার বিস্তার

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. ন্যাশনল ফণ্ড। ২. শিক্ষার হেরফের। ৩. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৪. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি। ৫. বাংলাশিক্ষার অবসান (জীবনস্মৃতি)। ৬. ইংরেজি শেখা। ৭. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৮. শিক্ষার বাহন। ৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। ১০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। ১১. ছাত্রসম্ভাষণ। ১২. বাংলাশিক্ষার প্রণালী। ১৩. প্রসঙ্গকথা ২। ১৪. শিক্ষার মিলন। ১৫. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ১৬. মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র। ১৭. শিক্ষার বিকিরণ—ইত্যাদি।

৯২। বিশ্বভারতী ১৮নং

[শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের (রবীন্দ্রনাথ) অভিভাষণ, ৮ পৌষ ১৩৪৫, ইংরেজী ১৯৩৮। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৫]

য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞান সাধনার প্রতিষ্ঠান—ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়—সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এইসকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানাপ্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মানুষের প্রকৃতিতে ঊর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে—আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি।

প্রাচীন কালে ছিল তপোবন ; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এইসকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র ; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা ; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল ; তেমনি যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।···

বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃঃ ১৪৭-৪৯

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষা ও অনুশীলন

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ২. শিক্ষাসংস্কার। ৩. তপোবন। ৪ লক্ষ্য ও শিক্ষা। ৫. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৩নং। ৬. অসন্তোষের কারণ। ৭. আকাঙ্ক্ষা। ৮. প্রাক্তনী (৬নং)। ৯. বিশ্বভারতী ৪নং। ১০. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১১. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১২. কলাবিদ্যা। ১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৬নং। ১৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১৫নং। ১৫. শিক্ষার সার্থকতা। ১৬. শিক্ষার আদর্শ। ১৭. বিশ্বভারতী ১৫নং। ১৮. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। ১৯. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২০. ধর্মশিক্ষা। ২১. বিশ্বভারতী ১নং। ২২. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি। ২৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ২৪. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

৯৩। পল্লীসেবা ২নং

[শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে কথিত, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৬, পৃঃ ৬৬২-৬৩]

…য়ুরোপে নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই য়ুরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এই জন্যই গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হয়ে চলছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, শহর ও গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই ; যে-কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থানলাভ করতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

একদিন আমাদের দেশে যা-কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে—শিক্ষার জন্য, আরোগ্যের জন্য, শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল।…সংস্কৃতি-সম্পদ্ যা ছিল তা সমস্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা করেছে - পল্লী ও শহরের মাঝখানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার খেয়াপার করবার জন্য বড়ো বড়ো জাহাজ প্রয়োজন। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হল। ইংরেজের কাজ-কারবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হতে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হতে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।…

শিক্ষিতদের দান পল্লীবাসী গ্রহণ করবে কোন্ আধারে। তাদের চিত্তভূমিকাই যে প্রস্তুত হয় নি। যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গল-চেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয়নি, পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন করে গড়ে তুলছেন তাঁরা জ্ঞানের এমন পঙ্‌ক্তিভেদ কোথাও করেননি, পরিবেষণের পাতা একই। আমাদের দেশে একই ভাবে-যে সমস্ত দেশকে অনুপ্রাণিত করা যাবে এমন উপায় নেই। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো ক'রে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থাই করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই-যে প্রকাণ্ড বিভেদ এ'কে দূর করে জ্ঞানবিজ্ঞান, কী পল্লী কী নগর, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে—সর্বসাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভুত-প্রেত-ওঝা, তাদের অশিক্ষা

অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনোরকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে।

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হতে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য।...

পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃঃ ১১০-১১৩,

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষার বিস্তার শিক্ষার সাম্য

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি।
২. শিক্ষার বাহন।
৩. রাশিয়ার চিঠি (প্রত্যেকটি)।
৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ২নং।
৫. শিক্ষার বিকিরণ।
৬. লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তি।
৭. মুহম্মদ আজিজুল হককে পত্র ইত্যাদি।

৯৪। বাঁকুড়ায় ছাত্রদের উদ্দেশে

[বাঁকুড়ায় ছাত্রদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, ১৯ ফাল্গুন ১৩৪৬, ইংরেজী ১৯৪০। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃঃ ৯৪]

…তোমাদের মুখে এই সংস্কৃত উচ্চারণের বিকৃতিতে আমার কানে কঠোর আঘাত দিয়েছে।

.. কেবল উচ্চারণের নয়, আচরণের উচ্ছৃঙ্খলতা সেও কম অপরাধ নয়। তাতে সমাজকে শ্রীভ্রষ্ট ক'রে দেয়। আজকাল তরুণদের মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত ভাবে এই সামাজিক অবৈধতা উত্তরোত্তর উদ্দাম হয়ে উঠেছে, এ যে সকল সভ্যদেশের ভদ্রবিধির বিরুদ্ধে। যে-সকল বিধিবিধান কর্মের মধ্যে কেবল শোভনতা নয় সার্থকতা আনে যখন-তখন তাকে অন্যায়রূপে অমান্য করার স্পর্ধা কুশ্রীভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। যে-সীমার মধ্যে মানুষ বাল্যকাল থেকে আত্মসংযম করতে শিক্ষালাভ করে সেই সীমাকে ধূলিসাৎ ক'রে ছাত্রেরা নিজের চরিত্রে ভ্রষ্টতা আনছে। যে-বিরোধের মধ্যে নৈতিক বলিষ্ঠতা আছে, এ তা নয় ; এতে দুর্বলতারই পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, একে বলে আবদার, নারীজাতির হাতে লালিত প্রশ্রয়প্রাপ্ত চিত্তবৃত্তির এ স্বৈরাচার। কোনো সংগত নিয়মের মর্যাদা মানব না এ-কথা যারা ছেলেবেলা থেকে বলতে অভ্যস্ত হ'ল তারা ভবিষ্যতে দেশকে চালনা করবার দায়িত্বশক্তি হারাচ্ছে। যে-সব ছেলেরা সকলের চেয়ে দুর্বল প্রকৃতির, সকলের চেয়ে অসংগত আদুরেগিরি তাদেরই। এ-কথা তারা ভুলে যায় যে, যারা অকুণ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায় তারা নিয়ম গড়তে কোনোদিন পারে না। এই ভাঙন-ধরানো মন সাংঘাতিক ভাবে বিস্তার লাভ করছে, এদের হাতে কীর্তি গঠিত হচ্ছে না, কীর্তি ভাঙছে। দলাদলিতে ক্রমাগতই ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে দেশের আশ্রয়-সৌধকে। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা এই সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিপ্রীতির মূলে আঘাত করেছেন তাঁরা এটা করেছেন স্বাজাত্য-কর্তব্যের দোহাই দিয়ে। সভা-ভাঙা দল-ভাঙা ইস্কুল-ভাঙা মাথা-ভাঙা সমস্ত এর অন্তর্ভুক্ত ক'রে মরণ-তাণ্ডবের পিছনে দাঁড়িয়ে বাহবা দিয়েছেন। …এই বিনাশবুদ্ধি বয়স্ক পলিটিশানরা চর্চা করুন আমরা অগত্যা সহ্য করব, কিন্তু বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল মত্ততার আবর্তের মধ্যে আকর্ষণ করার মতো স্বদেশের পক্ষে আত্মঘাতকতা আর কিছু হতে পারে না। ..

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শ

তুলনীয় প্রসংগ ঃ

১. জাতীয় বিদ্যালয়।
২. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ১নং।
৩. বিশ্বভারতী ১১ নং।
৪. বিশ্বভারতী ১৫ নং।
৫. শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি ইত্যাদি।

৯৫। তপোবন ২নং

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে 'তপোবন' প্রবন্ধ অধ্যাপনাকালে কথিত। 'কষ্ঠি-পাথর', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃঃ-৬৫৭-৫৯]

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ঐতিহাসিক তপোবনের কথা আমি জানিনে। কেউ জানে ব'লে আমি বিশ্বাস করিনে। তপোবনের কথার উল্লেখ আছে পুরাণে, কিন্তু এত অসম্ভব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সংগে সে-জড়িত যে তাকে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করিনে। সেখানে যে-সব ঋষি-তপস্বীদের বাস তাঁরা সমুদ্র-পর্বতকে অভিশাপের জোরে কম্পমান ক'রে জোড়হস্তে দ্বারস্থ করতে পারতেন। আবার তাঁদের তপস্যাও অযুত-নিযুত বৎসরের তাপে এমন সর্বনেশে হয়ে যেতে পারত যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাবার জো হ'ত, শেষকালে দেবতাদের কেঁদে এসে পড়তে হ'ত তাঁদের তেজ ঠাণ্ডা করতে। এমন সব কথা বিশ্বাস করবার শক্তি যাঁদের আছে, তাঁদের পড়াশোনা করবার দরকার নেই।

বৈদিককালে তপোবন নাম দিয়ে কোনো আশ্রম ছিল এ যদি সত্য হয় তবে কালক্রমে তার লোকস্মৃতি এমন অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়ে উঠতে নিশ্চয়ই দীর্ঘ সময় নিয়েছিল। অর্থাৎ তপোবনের জনশ্রুতি যখন কাব্যে পুরাণে দেখা দিয়েছিল তখন তার অস্তিত্ব এক কল্পনা ছাড়া আর কোথাও ছিল না।

পুরাণের আরও উত্তরকালে তপস্যার বিশেষ কেন্দ্ররূপে তপোবনের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে তার নামও পাইনে কোথাও। আরণ্যক নাম পাওয়া যায়। বোঝা যায় আর্যাবর্তে এক সময় নাগরিক সভ্যতা এসে অরণ্যের উচ্ছেদ ঘটায়নি।...

একদিন ভারতের আর্যাবর্তের বনে যে আর্যরা নিয়েছিলেন আশ্রয়, তাঁদের মনের শক্তি মূঢ় হয়ে যায় নি। তাঁরা গদগদভাষী ছিলেন না। তাঁদের ভাষা এতদূর সংস্কৃত ছিল যে, তাতে নৈর্ব্যক্তিক ভাবের তত্ত্বকথা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল।

...সেই আরণ্যকে ঋষিদের সকলের চেয়ে মহৎ লক্ষ্য ছিল অন্ততঃ স্বরূপকে আত্মার মধ্যে পাওয়া। মানুষের ইতিহাসে এমন সাধনা আর তো কোনো বনবাসীর মধ্যে কল্পনা করা যায় না। ভারতে প্রথমাগত আর্য ঔপনিবেশিকদের মধ্যে তপোবন নামক কোনো বিশেষ সংজ্ঞাধারী আশ্রমের সন্ধান পাই বা না পাই, আরণ্যক সাধকদের এই যে আশ্চর্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাই, আমার কাছে তপোবন নামটি এরই প্রতীক।...

শিক্ষা-গ্রন্থের 'তপোবন' প্রবন্ধ বা বর্তমান সংকলনে উক্ত প্রবন্ধের গৃহীত অংশ দ্রষ্টব্য।]

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

তপোবনের আদর্শ, শিক্ষার লক্ষ্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষাসমস্যা।
২. জাতীয় বিদ্যালয়।
৩. তপোবন।
৪. লক্ষ্য ও শিক্ষা।

৯৬। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

[পুস্তিকারূপে প্রকাশিত, আষাঢ় ১৩৪৮, ইংরেজী ১৯৪১। সংক্ষিপ্ত পূর্বরূপ ঃ আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০]

…শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে।…

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্যপ্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে।…

যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত।… কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও।… একদিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর-এক দিকে গুরুগৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি—এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে নিয়মে

শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম, আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে। আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি—সেই মানুষই বিচিত্র ফলশস্যশালিনী নীলনদীতীরবর্তী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার প্রকৃতি অন্যরকম হত না। যে প্রকৃতি সজীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জীব পাথরে-বাঁধানো, চিত্তগঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

র। ১১। ৭৩৪-৩৭

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

প্রকৃতি, শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও আনন্দ, বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির দান।

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. শিক্ষাসমস্যা।
২. তপোবন।
৩. জগদানন্দ রায়কে পত্র ১ নং।
৪. বিশ্বভারতী ৪নং।
৫. The School Master.
৬. A Poet's School.
৭. আশ্রমের শিক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

৯৭। The School Master

জাপানে প্রদত্ত-ভাষণ, জুন ১৯২৪, The Modern Review, October, 1924 P. 369—73]

...Our system of education refuses to admit that children are children. Children are punished because they fail to behave like grown-up people and have the impertinence to be noisily childish. Their educators do not know, or they refuse to acknowledge that this childishness is Nature's own provision and that the child through its restless mind and movements should always come into touch with new facts and stumble upon new information. Thus the child becomes the battle-ground for a fight between the school master and Mother Nature herself.

The school master is of opinion that the best means of educating a child is by concentration of mind, but Mother Nature knows that the best way is by dispersion of mind. When we were children, we come to gather facts by such scattering of mental energy, through unexpected surprises. The surprise gave us that shock which was needed to make us intensely conscious of the facts of life, of the world. Facts must come fresh to children to startle their minds into full activity....

It is the utter want of purpose in child life which is important. In adult age, having made our life a bundle of a few definite purposes, we exclude all facts outside their boundaries. Our purpose wants to occupy all the mind's attention for itself, obstructing the full view of most of the things around us ; it cuts a narrow bed for our deliberate mind which seeks its end through a restricted passage. The child, because it has no conscious object of life beyond living, can see all things around it, can hear every sound with a perfect freedom of attention, not having to exercise choice in the collection of information. It gives full rein to its restlessness which leads its mind into knocking against knowledge...

But the school master, as I have said, has his own purpose. He wants to mould the child's mind according to his ready-made doctrines and therefore wants to rid the child's world of everything

that he thinks will go against his purpose. He excludes the whole world of colour; of movement, of life, from his education scheme, and snatching the helpless creature from the mother heart of Nature, shuts it in his prison-house, feeling sure that imprisonment is the surest method of improving the child mind....He does not understand that the adult mind in many respects not only differs from, but is contrary to the child mind.

It is like forcing upon the flower the mission of the fruit. The flower has to wait for its chances. It has to keep its heart open to the sunlight and to the breeze; to wait its opportunity for some insect to come seeking honey. The flower lives in a world of surprises, but the fruit must close its heart in oder to ripen its seed. It must take a different course altogether. For the flower the chance coming of an insect is a great event, but for the fruit its intrusion means an injury. The adult mind is a fruit mind and it has no sympathy for the flower mind. It thinks that by closing up the child mind from outside, from the heart of Nature and from the world of surprise it can enable it to attain true maturity....

...We are saved from trouble when the children, who have their restless wings given them by Nature are at last put into this cage. But we kill that spirit of liberty in their mind, the spirit of adventure, which we all bring with us into the world, the spirit that every day seeks for new experiences. This freedom is absolutely necessary for the intelligent growth of the mind, as well as for the moral nature of children...

Freedom is not merely in unrestricted space and movement. There is such a thing as unrestricted human relationship which is also necessary for the children. They have this freedom of relationship with their mother, though she is much older in age,—in fact through her human love, she feels no obstruction in their communion of hearts, and the mother almost becomes a comrade to her children This gift of love which Nature has given the mother is absolutely necessrry for children....

I have a deep-rooted conviction that only through freedom can man attain his fulness of growth, and when we restrict that freedom

it means that we have some purpose of our own which w impose on the children, and we have not in mind Nature's own purpose of giving the child its fulness of growth....

If we have some purpose expressed through our educational institutions—that children should be producing patriots, practical men, soldiers, bankers, then it may be necessary that we have to put them through the mechanical drill of obedience and discipline ! But that is not the fulness of life, not the fulness of humanity. He who knows that Nature's own purpose is to make the boy a full man when he grows up—full in all directions, mentally and mainly spiritually—he who realises this, brings up the child in the atmosphere of freedom...

That to create our own world has been the purpose of God, we see when we find that, even as children we had our one and only pleasure in that play where, with trifling materials, we gave expression to our imagination. That is more valuable to us as children than gold or banknotes or anything else. The same thing is true with regard to every human individual. We forget this value of the individual creative power because our minds become obsessed with the artificial value which is made prevalent in society by other peoples' valuation of a particular manner of living, a particular style of respectability. We force ourselves to accept that imposition and we kill the most precious gift that God has given us, the gift of creation, which comes from His own Nature.

God is creator, and as His children we, men and women also have to be creators. But that goes against the purposes of the tyrant, of the schoolmaster, of the educational administration, of most of the governments, each of whom want the children to grow up according to the pattern which they have set for themselves.

টীকা :

The School Master

১৯২৪ সালে মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে গিয়েছিলেন। চীন থেকে ফেরার পথে জাপানে কিছুদিন (মে—জুন, ১৯২৪) অবস্থান করেন। সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ জাপানে উক্ত ভাষণ দেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য :

শিক্ষাপ্রণালী, প্রকৃতি, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা

তুলনীয় প্রসঙ্গ :

১. মেঘনাদবধ কাব্য। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩ পূর্ব-প্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯ লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৫নং। ১১ অসন্তোষের কারণ। ১২। বিশ্বভারতী ২নং। ৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪ বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮ জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৯. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১ বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২ আশ্রমের শিক্ষা। ২৩ A Poet's School. ২৪ তোতাকাহিনী। ২৫ সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৬. তপোবন। ২৭ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ২৮. বিশ্বভারতী ৪নং। ২৯. বিশ্ব-ভারতী ১০নং। ৩০. বিশ্বভারতী ১৪নং। ৩১ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ৩২ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৩৩. জাতীয় বিদ্যালয়। ৩৪. প্রাক্তনী (৫নং)। ৩৫ ধারাবাহী। ৩৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান। ৩৭. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং। ৩৮. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১০নং ইত্যাদি।

৯৮। A Poet's School

[Visva-Bharati quarterly, Oct. 1926, P. 197-212. Reprinted, Visva-Bharati Bulletin, No. 9, Dec. 1928]

From questions that have often been put to me, I have come to feel that the public claims an apology from the poet for having founded a school, as I in my rashness have done.…

I suppose this individual poet's answer would be, that when he brought together a few boys, one sunny day in winter, among the warm shadows of the *sal* trees, strong, straight, and tall, with

branches of a dignified moderation, he started to write a poem in a medium not of words.

In these self-conscious days of psycho-analysis clever minds have discovered the secret spring of poetry in some obscure stratum of repressed freedom, in some constant fretfulness of thwarted self-realisation. Evidently in this case they were right. The phantom of my long-ago boyhood *did* come to haunt the ruined opportunities of its early beginning ; it sought to live in the lives of other boys, to build up its missing paradise...

This brings to my mind the name of another poet of ancient India, Kalidasa···

The poet in the royal court lived in banishment—banishment from the immediate presence of the eternal.... What was the form in which his desire for perfection persistently appeared in his drama and poems ? It was in that of the *topavana*, the forest dwelling of the patriarchal community of ancient India....

It was not a deliberate copy, but a natural coincidence, that a poet of modern India also had a similar vision when he felt within him the misery of a spiritual banishment....But to-day the idea of the *tapovana* has lost any definite outline of reality, and has retreated into the far-away phantom land of legend, therefore, in a modern poem, it would merely be poetical, its meaning judged by a literary standard or appraisement. Then again, the spirit of the *tapovana* in the purity of its original shape would be a fantastic anachronism in the present age. Therefore, in order to be real, it must find its reincarnation under modern conditions of life, and be the same in truth, not merely identical in fact. It was this which made the modern poet's heart crave to compose his poem in a tangible language.

But I must give the history in some detail.

Civilised man has come far away from the orbit of his normal life. He has gradually formed and intensified some habits, that are like those of the bees, for adapting himself to his hive-world. We so often see modern men suffering from *ennui*, from world-weariness, from a spirit of rebellion against their environment for no reasonable cause whatever. Social revolutions are constantly

ushered in with a suicidal violence that has its origin in our dissatisfaction with our hive-wall arrangement—the too exclusive enclosure that deprives us of the perspective, which is so much needed to give us the proper proportion in our art of living. All this is an indication that man has not really been moulded in the model of the bee, and therefore he becomes recklessly antisocial when his freedom to be more than social is ignored.

Under our highly complex modern condition, mechanical forces are organised with such efficiency that the materials produced grow far in advance of man's selective and assimilative capacity to simplify them into harmony with his nature and needs. Such an intemperate overgrowth of things, like the rank vegetation of the tropics, creates confinement for man. The nest is simple, it has an easy relationship with the sky; the cage is complex and costly, it is too much itself, excommunicating whatever lies outside. And modern man is busy building his cage, fast developing his parasitism on the monster, *thing*, which he allows to envelop him on all sides. He is always occupied in adapting himself to its dead angularities, limits himself to its limitations, and merely becomes a part of it.

...I cannot help believing that my Indian ancestry had left deep in my being the legacy of its philosophy, the philosophy which speaks of fulfilment through a harmony with all things. For good or for evil such a harmony has the effect of arousing a great desire in us to seek our freedom, not in the man-made world but in the depth of the universe, and makes us offer our reverence to the divinity inherent in fire, water and trees, in everything moving and growing. The founding of my school had its origin in the memory of that longing for freedom, the memory which seems to go back beyond the sky-line of my birth.

Freedom in the mere sense of independence has no content, and therefore no meaning. Perfect freedom lies in the perfect harmony of relationship which we realise in this world—not through our response to it in *knowing* but in *being*. Objects of knowledge maintain an infinite distance from us who are the knowers. For knowledge is not union. Therefore the further world of freedom awaits us

where we reach truth, not through feeling it by our senses, or knowing it by reason, but through the union of perfect sympathy....

I wish I could say that we have fully realised my dream in our school. We have only made the first introduction towards it and have given an opportunity to the children to find their freedom in Nature by being able to love it. For love is freedom : it gives us that fullness of existence which saves us from paying with our soul for objects that are immensely cheap. Love lights up this world with its meaning and makes life feel that it has everywhere that *enough* which truly is its feast. I know men who preach the cult of simple life by glorifying the spiritual merit of poverty. I refuse to imagine any special value in poverty when it is a mere negation....

I tried my best to develop in the children of my school the freshness of their feeling for Nature, a sensitiveness of soul in their relationship with their human surroundings, with the help of literature, festive ceremonials and also the religious teaching which enjoins us to come to the nearer presence of the world through the soul....

But as I have already hinted this was not sufficient, and I waited for men and the means to be able to introduce into our school an active vigour of work, the joyous exercise of our inventive and constructive energies that help to build up character and by their constant movements naturally sweep away all accumulations of dirt, decay and death....

For me the obstacles were numerous. The tradition of the community which calls itself educated, the parents' expectations, the up-bringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official University, were all overwhelmingly arrayed against the idea I had cherished. In addition to this, our funds which had all but failed to attract contribution from my countrymen were hardly adequate to support an institution in which the number of boys must necessarily be small....

Before I stop I must say a few more words about a most important item of educational endeavour.

Children have their active sub-conscious mind which, like the

tree, has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them the atmosphere is a great deal more important than rules and methods, building appliances, class teachings and text books. The earth has her mass of substance in her land and water. But, if I may be allowed figurative language, she finds her inspiration of freedom, the stimulation of her life, from her atmosphere. It is, as it were, the envelopment of her perpetual education. It brings from her depth responses in colours and perfume, music and movement, her incessant self-revelation, continual wonders of the unexpected. In his society man has the diffuse atmosphere of culture always about himself. It has the effect of keeping his mind sensitive to his racial inheritance, to the current of influences that come from tradition ; it makes it easy for him unconsciously to imbibe the concentrated wisdom of ages. But in our educational organisations we behave like miners, digging only for things substantial, through a laborious process of mechanical toil : and not like a tiller of the soil, whose work is in a perfect collaboration with Nature, in a passive relationship of sympathy with the atmosphere...

The minds of children of to-day are almost deliberately made incapable of understanding other people with different languages and customs. This causes us, when our growing souls demand it, to grope after each other in darkness, to hurt each other in ignorance, to suffer from the wrost form of the blindness of this age. The Christian missionaries themselves have contributed to this cultivation of insensitiveness and contempt for alien races and civilisation. In the name of brotherhood and in the blindness of sectarian pride they create misunderstanding. This they make permanent in their text books and thereby poison the susceptible minds of the young. I have tried to save our children from such a mutilation of natural human love with the help of friends from the West, who, with their sympathetic understanding, have done us the greatest service.

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষাপ্রণালী, প্রকৃতি, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ঐক্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. মেঘনাদবধকাব্য,। ২. প্রসঙ্গকথা ১ (তিনখানি পত্র)। ৩. পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি। ৪. শিক্ষাসংস্কার। ৫. শিক্ষাসমস্যা। ৬. আবরণ। ৭. পিতৃদেব (জীবনস্মৃতি)। ৮. শিক্ষাবিধি। ৯. লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১০. জগদানন্দ রায়কে পত্র (৫নং)। ১১. অসন্তোষের কারণ। ১২. বিশ্বভারতী ২নং। ১৩. বিদ্যার যাচাই। ১৪. বিশ্বভারতী ৬নং। ১৫. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ১৬. আলোচনা। ১৭। পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা। ১৮. জনৈক অধ্যাপককে পত্র। ১৯ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮নং। ২০. শিক্ষার বিকিরণ। ২১. বিশ্বভারতী ১৭নং। ২২. আশ্রমের শিক্ষা। ২৩. The School Master. ২৪. তোতাকাহিনী। ২৫. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পত্র ২নং। ২৬ তপোবন। ২৭. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং। ২৮. বিশ্বভারতী ৪নং। ২৯. বিশ্বভারতী ১০নং। ৩০. বিশ্বভারতী ১৪নং। ৩১. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ৩২. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। ৩৩. জাতীয় বিদ্যালয়। ৩৪ প্রাক্তনী (৫নং)। ৩৫. ধারাবাহী। ৩৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান। ৩৭. জগদানন্দ রায়কে পত্র ৪নং। ৩৮. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ১০নং ইত্যাদি।

৯৯। My Educational Mission

[The Modern Review, June 1931, P. 621-23]

…Remembering the experience of my young days, of the school masters and the class-rooms and also knowing something of the natural school which Nature herself supplies to all her creatures, I established my institution in a beautiful spot far away from the town, where the children had the greatest freedom possible under the shade of ancient trees and the field around open to the verge of horizon.

From the beginning I tried to create an atmosphere which I considered to be more important than the class teaching. The atmosphere of nature's own beauty was there waiting for us from

a time immemorial with her varied gifts of colours and dance, flowers and fruits, with the joy of her mornings and the peace of her starry nights.…

I invited renowned artists from the city to live at the school, leaving them free to produce their own work which the boys and girls watch if they feel inclined…

From the commencement of our work we have encouraged our children to be of service to our neighbours from which has grown up a village reconstruction work in our neighbourhood, unique in the whole of India. Round our educational work the villages have grouped themselves in which the sympathy for nature and service for man have become one. In such extension of sympathy and service our mind realises its true freedom.

Along with this has grown an aspiration for even a higher freedom, a freedom from all racial and national prejudice. Children's sympathy is often deliberately made narrow and distorted making them incapable of understanding alien peoples with different languages and cultures. This causes us, when our growing souls demand it, to grope after each other in ignorance, to suffer from the blindness of this age. The wrost fetters come when children lose their freedom of heart in love.

We are building up our institution upon the ideal of the spiritual unity of all races. I hope it is going to be a great meeting place for individuals from all countries who believe in the divine humanity, and who wish to make atonement for the cruel disloyalty displayed against her by men.…

…I represent in my institution an ideal of brotherhood, where men of different countries and different languages can come together. I believe in the spiritual unity of man and therefore I ask the world to accept this task from me.…

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য ঃ

সর্বজনীন শিক্ষা, প্রকৃতি, শিক্ষা ও মানবসভ্যতার ঐক্য

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।
২. শিক্ষাবিধি।
৩. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পত্র ২নং
৪. বিদ্যাসমবায়।
৫. শিক্ষার মিলন।
৬. বিশ্বভারতী ৪নং।
৭. বিশ্বভারতী ৫নং।
৮. বিশ্বভারতী ৬নং।
৯. বিশ্বভারতী ১০নং।
১০. পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা।
১১. বিশ্বভারতী ১৫নং।
১২. বিশ্বভারতী ১৭নং ইত্যাদি।

১০০। **Letter to L. K. Elmhirst**

[19th December, 1937]

You know how for a long time I have been cherishing my hope of establishing an ideal centre of education at Sriniketan—an ideal which is not curtailed to the strictest measure of a narrow village environment, which is not specially set apart to be doled out as famine ration carefully calculated to be just good enough for an emaciated life and dwarfed mentality. It is well known that the education, which is prevalent in our country is extremely meagre in the spread of its area and barren in its quality. Unfortunately this is all that is available for us, and the artificial standard set up is proudly considered as respectable. Outside the bhadralogue class, pathetic in their struggle for fixing a university label on their name, their is a vast, obscure multitude who cannot even dream of such a costly ambition. With them we have our best opportunity if we know how to use it. There, and there only, can we be free to offer to our country the best kind of all-round culture, not mutilated by official dictators. I have generally noticed

that when the charitably-minded, city-bred politicians talk of education for the village folk, they mean a little left-over in the bottom of their cup, after diluting it copiously. They are callously unmindful of the fact, that the kind and the amount of the food, that is needful for mental nourishment, must not be apportioned differently according to the social status of those that receive it.

I am therefore all the more keen that Siksha-Satra should justify the ideal I have entrusted to it, and should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment of manhood complete in all its various aspects. Our people need more than anything else a real scientific training, that can inspire in them the courage of experiment and the initiative of mind which we lack as a nation. Sriniketan should be able to provide for its pupils an atmosphere of rational thinking and behaviour, which alone can save them from stupid bigotry and moral cowardliness. I myself attach much more significance to the educational possibilities of Siksha-Satra than to the school and college at Santiniketan, which are every day becoming more and more like so many schools and colleges elsewhere in this country, borrowed cages that treat the students' minds as captive birds, whose sole human value is judged according to the mechanical repetition of lessons, prescribed by an educational dispensation foreign to the soil.…

টীকা ঃ

L. K. Elmhirst

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর। ১৯২০ সালে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯২২ সাল থেকে শ্রীনিকেতনে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। পরে বিলেতে কিছুটা শ্রীনিকেতনের আদর্শে ডার্টিংটন হল প্রতিষ্ঠিত করেন।

জন্ম—১৮৯৬, মৃত্যু ১৯৭৪।

উল্লেখযোগ্য বিষয় / মন্তব্য ঃ

শিক্ষাসত্র (শ্রীনিকেতন)

তুলনীয় প্রসঙ্গ ঃ

১. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৮ ইত্যাদি।

১০১। মুসলমান ছাত্রের বাঙগলা শিক্ষা

ভারতী, কার্তিক-১৩০৭ (১৯০০)

গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষ্যে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ্ নবাবআলি চৌধুরী মহাশয় বাঙগলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহারই ইংরাজী অনুবাদ সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

বাঙগলা স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশেষরূপে হিন্দুছাত্রদের পাঠোপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে অথচ বাঙগলার অনেক প্রদেশেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান প্রজাসংখ্যা অধিক,—ইহা লইয়া সৈয়দ্ সাহেব আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়টি আলোচ্য তাহার সন্দেহ নাই এবং বক্তা মহাশয়ের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ, এতদিন বিদ্যালয়ে হিন্দুছাত্র সংখ্যাই অধিক ছিল এবং মুসলমান লেখকগণ বিশুদ্ধ বাঙগলা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন নাই।

কিন্তু ক্রমশই মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং ভাল বাঙগালা লিখিতে পারেন এমন মুসলমান লেখকেরও অভাব নাই। অতএব মুসলমান ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় আসিয়াছে।

স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয়ের সাধুদৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধুদৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্যধার্য্য অঙগ হওয়া উচিত।

বাঙগলা দেশে হিন্দুমুসলমান যখন ঘনিষ্ট প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখদুঃখ নানাসূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙগালী হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস, এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভাল করিয়া পালন করিতে পারিবে না।

অতএব সৈয়দ্ সাহেব বাঙগালী মুসলমান বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে কথা বলিয়াছেন, আমরা বাঙগালী হিন্দুবালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঠিক সেই কথাই বলি—অর্থাৎ বাঙগালা বিদ্যালয়ে হিন্দুছেলের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোন কথা না থাকা অন্যায় এবং অসঙগত।

ইংরাজী শিক্ষার যেরূপ প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, আচার বিচার আমাদের কাছে লেশমাত্র অগোচর থাকে না; অথচ তাহারা বহুদূরদেশী এবং মুসলমানরা আমাদের স্বদেশীয়, এবং মুসলমানদের সহিত বহুদিন হইতে আমাদের রীতিনীতি পরিচ্ছদ ভাষা ও শিল্পের আদানপ্রদান চলিয়া আসিয়াছে। অদ্য নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইয়া গেলে পরম দুঃখের কারণ হইবে। বাঙগালী মুসলমানের সহিত বাঙগালী হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমরা যেন কখন না ভুলি।

বাঙগলায় একটা প্রবাদ আছে "ঝিকে মারিয়া বৌকে শেখান।" ঝি আপনার বলিয়া তাহাকে দুঘা মারিলে সয়, বৌয়ের গায়ে হাত তোলা সকল সময় নিরাপদ নহে। সৈয়দ্ সাহেব সেই নীতি অবলম্বন করিয়া বাঙগালা পাঠ্যপুস্তককে তর্জ্জন করিয়াছেন, বোধ্ করি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল। মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাসের বিকৃত বিবরণ বাঙগলা বই কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছে? অস্ত্র হস্তে ধর্মপ্রচার মুসলমান শাস্ত্রের অনুশাসন, এ কথা যদি সত্য না হয় তবে সে অসত্য আমরা শিশুকাল হইতে শিখিলাম কাহার কাছে? হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মনীতি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইংরাজ লেখক যাহাই লিখিতেছে হিন্দুমুসলমান ছাত্রগণ কি তাহাই নির্ব্বিচারে কণ্ঠস্থ করিতেছে না? এবং বাঙগালা পাঠ্যপুস্তক কি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র নহে?

সম্প্রদায়গত পক্ষপাতের হাত একেবারে এড়ান কঠিন। য়ুরোপীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রচিত্র প্রটেষ্টাণ্ট লেখকের হাতে একভাবে এবং রোমান্ ক্যাথলিক লেখকের হাতে তাহার বিপরীত ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। য়ুরোপে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের বিদ্যালয় অনেকস্হলে স্বতন্ত্র, সুতরাং ছাত্রদিগকে স্বসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ কথা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজ লেখকের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কার আমরা শিরোধার্য করিয়া লইতে বাধ্য, এবং সেই সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন বাঙগলা বই রচিত হইলে তাহা কোন বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইংরাজ লেখকেরই মত বাঙগলা বিদ্যালয়ের আদর্শ মত—সেই মত অনুসারে পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা পরীক্ষার নম্বরেই দেখা যাইবে সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

অনেক আধুনিক বাঙগালী ঐতিহাসিক মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাসকে ইংরাজ তুলিকার কালিমা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অক্ষয় বাবু তাঁহার সিরাজচরিতে অন্ধকূপহত্যাকে প্রায় অপ্রমাণ করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন কিন্তু প্রমাণ যতই অমূলক বা তুচ্ছ হউক পরীক্ষাতিতীর্ষু বালক মাত্রই অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারকে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

অতএব বক্তামহাশয়ের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য পাঠ্যপুস্তকের মতামত সম্বন্ধে আমরা কঠিন শৃঙখলে আবদ্ধ। যতদিন না স্বাধীনগবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা আমরা ইংরাজ সাহিত্যসমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক কুসংস্কারগুলিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারি ততদিন আমাদের নালিশ গ্রাহ্য হইবে না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে ইতিহাস সংস্কারব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করি। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় দুই একজন হিন্দুলেখক এই দুরূহ সাধনায় রত আছেন, কিন্তু ইতিহাসের উপকরণমালা প্রায়ই পারসী উর্দুভাষায় আবদ্ধ অতএব মুসলমান লেখকগণের সহায়তা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

সৈয়দ্ সাহেব বাঙগালা সাহিত্য হইতে মুসলমান-বিদ্বেষের যে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সে গুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসঙগত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মত লেখকের গ্রন্থে মুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। থ্যাকারের গ্রন্থে ফরাসীবিদ্বেষ পদে পদে দেখা যায় কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যপ্রিয় ফরাসীপাঠক

থ্যাকারের গ্রন্থকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন না। আইরিশদের প্রতি ইংরাজের বিরাগ অনেক ইংরাজ সুলেখকের গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ সমস্ত তর্কবিতর্ক ও সমালোচনার বিষয়। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দার্হ তাহা সমালোচক কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোন সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গসাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দুপাঠকদিগকে কোনরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।

টীকা:

মুসলমান ছাত্রের বাঙলা শিক্ষা

১৩০৬ সালে অনুষ্ঠিত মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে জমিদার নবাব আলী চৌধুরী একটি উর্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এই রকম যে, বঙ্গদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের লেখকেরা হিন্দু, এবং সেইসব হিন্দুরচিত পাঠ্যপুস্তক মুসলমান ছাত্রের উপযোগী করে লেখা নয়। তার মধ্যে দিয়ে মুসলমান শাস্ত্রের এবং সাধুদৃষ্টান্তের সঙ্গে মুসলমান ছাত্রের পরিচয় হয় না। এই প্রবন্ধের একটি ইংরেজি অনুবাদ (Vernacular Education in Bengal, by Syed Nawab Ali Chowdhury) ভারতী পত্রিকায় সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়। সংকলিত রচনাটি উক্ত ইংরেজিতে অনুদিত প্রবন্ধের সমালোচনা।

অধ্যাপক প্রশান্ত পাল এই রচনাটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অক্ষয়বাবু (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)

বঙ্গদেশের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার জন্য বিখ্যাত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ। অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধের রচয়িতা। পালরাজাদের তাম্রশাসন ও শিলালিপির বাংলা অনুবাদসহ 'গৌড়লেখমালা' (প্রথম স্তবক ১৯১২) প্রকাশ করেন। এঁর 'সিরাজউদ্দৌল্লা', 'মীরকাশিম', 'ফিরিঙ্গি বণিক' প্রভৃতি গ্রন্থ সুপরিচিত।

জন্ম—১৮৬১ মৃত্যু—১৯৩০

সিরাজচরিত

অক্ষয়কুমার রচিত 'সিরাজউদ্দৌল্লা' গ্রন্থ (১৮৯৮)। সিরাজউদ্দৌল্লা সম্পর্কে প্রচলিত অনেক কলঙ্ক কাহিনী—বিশেষত হল্‌ওয়েল-প্রচারিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী—এই গ্রন্থে যুক্তিপ্রমাণসহ অসত্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়।

থ্যাকারে (William Makepeace Thackeray)

উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক। জন্ম কলকাতায়। 'ভ্যানিটি ফেয়ার', 'এস্‌মন্ড' প্রভৃতি উপন্যাস ইংরেজি সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

জন্ম—১৮১১ মৃত্যু—১৮৬৩

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই নামের কোনো খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিকের কথা আমাদের জানা নাই। সন্দেহ হয়, নামটি রবীন্দ্রনাথ ভুল করেও থাকতে পারেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়/মন্তব্য:

হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রেরই হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র এবং উভয় সম্প্রদায়ের সাধুদৃষ্টান্তের সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন, শুধু স্বধর্ম ও স্বসম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তই নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্যই এই পারস্পরিক পরিচয় অত্যাবশ্যক। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সেই যোগাযোগ ছিন্ন বা শিথিল হলে তা উভয়ের পক্ষেই অপূরণীয় ক্ষতি। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই এই আত্মবিচ্ছেদের শিকড় নিহিত।

ভারতীয় ছাত্রেরা যে-ইতিহাস পড়ে, তা ভারতীয়ের রচিত হলেও তা ইংরেজ-রচিত ইতিহাসেরই প্রতিধ্বনি। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী-দৃষ্টিভঙ্গীতে-রচিত বিকৃত ইতিহাসই ভারতবর্ষে ছাত্রপাঠ্য ভারত-ইতিহাস। উপনিবেশের ইতিহাসরচনার এই যে সাম্রাজ্যবাদী ধারা, ভারতীয় লেখকেরাও এই ধারারই অনুসরণ করে এসেছেন। এতে ভারতীয় ছাত্রের স্বদেশ সম্পর্কে ধারণা বিকৃত হয়, অনুরাগ বাধিত হয়, এবং ইংরেজের সম্পর্কে শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত হয়। এই হল ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিড়ম্বনা।

মন্তব্য হিসেবে এইখানে যোগ করা যায় যে, এই সাম্রাজ্যবাদী ধারার ইতিহাস-রচনার প্রতিক্রিয়ায় এবং খানিকটা স্বদেশী-ভাবনার প্রভাবে পরবর্তীকালে এদেশে একটি জাতীয়তাবাদী ইতিহাসরচনার ধারারও প্রবর্তন হয়। তার মধ্যে উল্টো দিকের বিকার—কিছু কিছু জাতীয় অহমিকার প্রকাশ ঘটে থাকতে পারে। তা খুবই স্বাভাবিক, স্থায়ি কোনো বিপদ নয়।

সম্পূরণ

ভ্রম-সংশোধন

অনিবার্য কারণে কিছু ভ্রম-প্রমাদ থেকে গিয়েছে। কেবল সেইগুলিই এখানে সংশোধিত হল যা অর্থবোধের ক্ষেত্রে বা অন্য কোনোভাবে পাঠকের অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

১. 'বিশ্বভারতী ৫নং' (ক্রমিক সংখ্যা ৫০) এবং 'বিশ্বভারতী ৬নং' (ক্রমিক সংখ্যা ৪৯ ভ্রমক্রমে পরস্পরের সঙ্গে স্থান-পরিবর্তন করেছে। পরের রচনা আগে স্থান পাওয়ার ফলে কালানুক্রম ভঙ্গ হয়েছে।

২. 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ'—এই রচনা চারটির সংখ্যা যথাক্রমে ৬নং, ৮নং, ১০নং ও ১৫নং (বইয়ের নির্দেশিত সংখ্যা) ; দু-একটি ক্ষেত্রে বইয়ের এই সংখ্যার বদলে যথাক্রমে ১নং, ২নং, ৩নং ও ৪নং, অর্থাৎ ৬নং স্থানে ১নং এই ক্রমে মুদ্রিত হয়েছে।

৩. 'লোকশিক্ষা সংসদ : অনুষ্ঠানপত্র)' রচনাটির মূল নাম 'লোকশিক্ষা সংসদের অনুষ্ঠানপত্র'।

৪ প্রথম দিকের কয়েকটি তুলনীয় প্রসঙ্গে 'জনৈক অধ্যাপককে পত্র' স্থলে 'জনৈক অধ্যাপকের চিঠি' হয়েছে।

৫ ৭ পৃষ্ঠার ৩নং পঙ্‌ক্তিতে 'দেখতে' স্থলে 'দেখলে' এবং ১৯নং পঙ্‌ক্তিতে 'প্রতিষ্টা' স্থলে 'প্রতিষ্ঠা' হবে।

৬. ২৯ পৃষ্ঠার ১৬নং পঙ্‌ক্তিতে 'কামরাখানার' স্থলে 'কারখানার' হবে।

৭. ৩৭ পৃষ্ঠার ২৩নং পঙ্‌ক্তিতে 'স্বার্থকতা' স্থলে 'সার্থকতা' হবে।

৮. ৪৩ পৃষ্ঠার ১৬নং পঙ্‌ক্তিতে 'কালানিক্রান্ত' স্থলে 'কালাতিক্রান্ত' এবং ৩৪নং পঙ্‌ক্তিতে 'সাঙ্গীকরণ' স্থলে 'স্বাঙ্গীকরণ' হবে।

৯. ১৯৪ পৃষ্ঠায় 'প্রাক্তনী ২নং' (রচনার ক্রমিক সংখ্যা ৪৫, শিরোনাম) স্থলে 'প্রাক্তনী ৬নং' হবে।

৮. ২২৩ পৃষ্ঠায় 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র' (রচনার ক্রমিক সংখ্যা ৫৯) স্থলে 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র ১নং' হবে।

নির্দেশিকা—ক

সংকলিত রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচি

নির্দেশিকা—খ

নাম ও অন্যান্য সূচি (নির্দেশিকা ক-য়ের অতিরিক্ত)